শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি।

চিরকুমার-পরিব্রাজক

শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয়

প্রণীত।

বারাণসী

ধর্ম্মামৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৮১৩।

উৎসর্গ পত্র।

অন্নপূর্ণে নমস্তুভ্যং নমস্তে জগদম্বিকে।
স্বচ্ছাগং চরণে ভক্তিং দেহি দীন-দয়াময়ি ॥

মা!

শ্রীকৃষ্ণ

ঐ পদ বিনা
কিছু নাহি চায়। পুষ্পা-
ঞ্জলি রাঙ্গা পায়
বড় শোভা
পায় ॥

তাই মা!
দীনাতিদীন
সেবক তোমার। "পুষ্পাঞ্জলি"
দিয়া পূজা করিল এবার ॥

ও

নমো নারায়ণায়।

অবতরণিকা।

মহারোলে উত্তাল তরঙ্গ রাশি চিরদিনই মহাসমুদ্রের মহিমা ঘোষণা করিয়া আসিতেছে। তরঙ্গ তুফানে পোতারোহী বর্গ বিষম বিপত্তিতে পড়িলেও—দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর হইলেও উহা কিন্তু সাগরের স্বাভাবিক শোভা ও মহিমা। ধর্ম্মের আধার ভূমি—সদ্ধর্ম্মের অভ্যুদয় ও বিকাশ ক্ষেত্র—জ্ঞানের আকর মহাসাগর সদৃশ সনাতন ধর্ম্মের লীলায়তন ভারত বর্ষে বিপ্লবের উপর বিপ্লব আসিয়া সদাচারী সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীগণকে অনেক বার বিত্রস্ত ও বিপদ গ্রস্ত করিয়াছে। বৌদ্ধ বর্গের বিপুল বিতাড়নে, মুশলমান গণের নিতান্ত নির্যাতনে খৃষ্টীয় গণের কুহক-ময় কৌশল জাল প্রসারণে, ব্রাহ্ম মণ্ডলীর অদূরদর্শীতা দূষিত সমাজ সংস্কার কারণে ও নব্য উন্মার্গী বর্গের বিবিধ বিরুদ্ধাচরণে সনাতন ধর্ম্মাচার-চালিত সমাজ বরাবর উপদ্রূত হইয়া আসিতেছে—কিন্তু ভগবদ্বচনামৃত পানে অমর—ধর্ম্ম সমাজ কখনও সমূলে নষ্ট হয় নাই, হইবেও না। ঘন ঘোর মেঘে আকাশ ঘেরিয়া লইলেও কাল সহকারে আবার নীলাকাশ নির্ম্মল দেখা যায়। বর্ত্তমান ধর্ম্ম বিপ্লব কালে মাদৃশ দীন হীন অযোগ্য

জনের ক্ষুদ্র সেবা ভারত গ্রহণ করিলেন, ভগবৎ কৃপায় এ ক্ষুদ্র জীবনও কৃতার্থ হইল। গত অষ্টাদশ বর্ষের সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিপুল আন্দোলনে চারি দিকেই একটু বাতাস ফিরিয়াছে। স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম গৌরব বুদ্ধি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত অনেকের হৃদয়েই উদয় হইয়াছে। সভা সমিতিও প্রায় ৪০০ চারিশত প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতের সকল প্রান্তে ধর্ম্মের বিজয় ভেরী বাজাইতেছে। পণ্ডিতগণ—আচার্য্যগণ চারিদিকে ভিন্ন ২ ভাষায় সর্ব্ব সাধারণকে অধিকার ভেদে ধর্ম্ম-তত্ত্বকথা বুঝাইতেছেন, শুশ্রূষুগণও আগ্রহ ও অনুরাগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতেছেন—বহুল সংবাদ পত্রে সনাতন ধর্ম্মের জয় জয় ধ্বনি বিঘোষিত হইতেছে। এমন কি নাট্য শালা সমূহেও ধর্ম্মভাবের অভিনয় হইতেছে। এই সুসময়ে "ধর্ম্ম প্রচারক" আদিতে প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধরাশি একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ জন্য বহুল ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হওয়ায় এই "শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি" প্রকাশিত হইল। ইহাতে সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক প্রয়োজনীয় কথার গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এই গুলি চিন্তাশীল সুজন মাত্রেরই সেবায় লাগিলে কৃতার্থ হইব।

কাশী—যোগাশ্রম। দীনাতিদীন

২রা মাঘ, শঃ ১৮১৩। শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ।

সূচিপত্র।

শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি।

বিধাতার শিল্পচাতুরী।

এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ক্ষণ জন্য প্রণিধান করিয়া দেখিলে পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য কার্য্যকৌশল-দর্শনে মন চমৎকৃত ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়। তিনি অসীম ক্ষমতা-শালী শিল্পচতুর পুরুষ। তাঁহার একটী সামান্য কার্য্যেও এত অপূর্ব্বতা এবং আশ্চর্য্য গুণের পরিচয় পাওয়া যায় যে বোধ করি আমরা চিরদিন চিন্তা করিলেও তাঁহার সৃষ্টি-কৌশলের কিঞ্চিন্মাত্রও বিদিত হইতে পারি না। তিনি অতি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও অতি বৃহৎ হইতেও

বৃহত্তর সর্ব্বাবয়বেই সমান শিল্পচাতুরী ও মাধুরীর পরিচয় দিয়াছেন। তিনি এক দিকে শত সহস্র যোজন পরিধি বিশিষ্ট অঙ্গুরীয়ক নির্ম্মাণ করিয়া শনৈশ্চর-সদৃশ একটী মহাগ্রহের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করাইতেছেন, অকূল মহাসাগরপ্লাবনে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া দিতে-ছেন, অনন্ত আকাশে অনন্ত সৃষ্টির সজ্জা করিতেছেন, অপরদিকে একটী মক্ষিকার পক্ষ চিক্কণ ও একটী ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষের অবয়ব গঠন করিতে-ছেন, একটী পিপীলিকার হস্ত পদাদির বল দিতেছেন, একটী অনুবীক্ষণদৃশ্য কীটানুকীটের অঙ্গুলির নখ প্রস্তুতে ব্যস্ত রহিয়াছেন। তিনি যাহা অতি সূক্ষ্ম কার্য্যও করেন, তাহাও অত্যন্ত চাকৃচিক্যশালী, মার্জ্জিত, ও সম্পূর্ণ ভাবে গঠিত হয়। কিন্তু মানবহস্তবিনির্ম্মিত একটী সূচীও যদি অনুবীক্ষণ দ্বারা দেখা যায় তবে তাহাতেও বন্ধুরতা, অপরিপাটীত্তাদি দোষ লক্ষিত হয়। যে দীপ্তিশালী গ্রহনক্ষত্রাদি আমাদের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণচ্ছলে নৃত্য করিয়া

বেড়াইতেছে, তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলে হৃদয়ভেদী উপদেশ দ্বারা তাহারা আমাদিগকে তাহাদের নিত্য নিয়মিত গতি ব্যবস্থাপকের পরিচয় দিবে। ঐ যে পর্ব্বত সকল উচ্চশিরে অভ্রভেদ করিয়া তুষার মাখিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ইঁহার শিল্পনৈপুণ্যের প্রমাণ প্রাপ্ত হইবে। ঐ যে তরঙ্গরাশির আঘাত প্রতিঘাত জনিত কল্লোল ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া মহাসাগর বিশাল কলেবরে বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে, উহাকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহার শিল্প কার্য্যের পরিচয় পাইবে। ঐ শৈলসুতা স্রোতস্বতীকে জিজ্ঞাসা কর, ও প্রবাহ বেগে প্রতি তরঙ্গে তাঁহারই শিল্পচাতুরী ও আশ্চর্য্য নিয়ন্তৃত্বের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে অনিবার্য্য বেগে সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। বায়ুকে হউক অগ্নিকে হউক অথবা যাহাকেই কেন জিজ্ঞাসা কর না, সে নিজস্বরে সেই শিল্পীর মহিমা কীর্ত্তন করিবেই করিবে। বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ,

মানব, দানব, দেব যাহাকে হউক জিজ্ঞাসা কর, সে তাঁহারই আশ্চর্য্য শিল্প কার্য্যের প্রমাণ না দিয়া নিজ সত্তা মাত্রের পরিচয় দিতে পারিবে না। তাঁহার শিল্প-যন্ত্রে কত কত জীব কত কত বৃক্ষ কত কত মনুষ্য ও কত কত দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তাঁহার কার্য্যে একটীর সহিত অপরটি ঠিক মিলিবে না, কোন না কোন অবয়বে তাহার বিভিন্নতা ও বিচিত্রতা হইয়াছে। মনুষ্য-সমাজে কত কত মানব জন্মিয়াছিল ও জন্মিতেছে কিন্তু কোনটির আকৃতি ও প্রকৃতি ঠিক অপর কোনটির সদৃশ নহে। ধন্য তাঁহার মহিমা! ধন্য তাঁহার অপার ভাব ও আশ্চর্য্য তাঁহার শিল্প-চাতুরী! হে মনুষ্য! তুমি কি সামান্য দেহাভিমানে উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছ? তুমি তো তাঁহার শিল্পশালার একটী অতি ক্ষুদ্র বস্তু মাত্র। অর্থকরী বিদ্যাদি শিক্ষা করিয়াই নিবৃত্ত হইও না, তাঁহার শিল্পশাস্ত্র পাঠ কর। শিল্পশাস্ত্রের ভাব, রস,

লালিত্য, মাধুর্য্য অবগত হইলে বিমোহিত হইয়া যাইবে। তাঁহার অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড-শাস্ত্রের সর্ব্বত্র সুন্দর ছন্দোরাশি বিরচিত। একবার সেই শিল্পসুনিপুণ বিশ্ব-রচয়িতার শিল্প শাস্ত্র অধ্যয়ন কর এবং তাঁহার অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় শিল্প-চাতুর্য্য দর্শন করিয়া তাঁহাকে বার বার নমস্কার কর!

মানব-গ্রন্থ।

তুমি বিদ্যাবান্ হইবার জন্য কত পুস্তক পাঠ করিলে. এবং তুমি বিদ্যাবান্, ইহা লোক সমাজে জানাইবার জন্য তুমি কত পুস্তক রচনা করিলে. কিন্তু যে পুস্তক পাঠ করিলে তুমি প্রকৃত পণ্ডিত হইতে পারিতে, সে পুস্তক পড়িলে না এবং যে পুস্তক রচনা করিলে প্রকৃত বিদ্যাবানের সঙ্গতি লাভ করিতে পারিতে সে পুস্তকের এক পংক্তিও লিখিলেনা। তুমি লোকের ভাষা, লোকের প্রকৃতি লোকের জীবনবৃত্ত পাঠ করিলে ও লিখিলে,

কিন্তু নিজের এই সকল বিষয় দেখিলেও না, পড়িলেও না ও রচনাও করিলেনা। মনুষ্যমাত্রেই নিজে নিজে এক এক খানি গ্রন্থ বিশেষ। আপনি আপনাকে পাঠ করিলে জীবনের সকল বিষয় জানিবার সামর্থ্য জন্মে। আপনার শরীরের চর্ম্ম, অস্থি, মাংস, মজ্জা, মেদ, স্বেদ, ক্লেদ, স্নায়ু, শিরা, রস, রক্ত আদির গঠন পরিণাম, গতি বিধি যদি ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে পার, তবে দেখিতে পাইবে আদি কবি ব্রহ্মা তোমার শরীরকে কেমন ছন্দোবন্ধে রচনা করিয়াছেন, কেমন স্বরে তালে সম্মিলিত হইয়া শরীরের প্রত্যেক ক্রিয়াগুলি স্পন্দিত হইতেছে, কেমন পঞ্চতত্ত্বে পঞ্চতন্মাত্রা পা ঢাকিয়া নৃত্য করিতেছে, কেমন ইন্দ্রিয় গুলি যথানিয়মে ক্রীড়া করিতেছে, কেমন একটী বৃত্তির স্পন্দনের একবার পদস্খলন হইয়া গেলে শরীরে কি প্রলয় ব্যাপারই হইয়া যায়। আজ একটী ক্ষুদ্র স্নায়ু কোথায় একটু বিকল হইল, অমনি তুমি নানা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলে। শরীর-

স্পন্দনের কেমন ঘাত প্রতিঘাতে কত সুখ স্বচ্ছন্দতা ও দুঃখ দুর্ব্বিপত্তির তরঙ্গ-লীলা হইতেছে, এতাবৎ তুমি একবারও ভাল করিয়া পাঠ করিলেনা। মনস্তত্ত্ব ও অধ্যাত্ম জগতের মধ্যে তো তোমার প্রবেশ করিবার ইচ্ছাই দেখিতেছিনা। যদি এই অলৌকিক ব্রহ্মাণ্ডের নিগূঢ় সন্ধান লইতে পারিতে, তাহা হইলে তোমার পলকে প্রলয় করিবার সামর্থ্য হইত, ও তুমি প্রকৃতির অনন্ত সুখের অধিকারী হইতে। যদি মা অনাদ্যা শক্তি মহামায়ার সূক্ষ্মাঞ্চল ধারণ করিয়া তাঁহারই সঙ্গে তাঁহারই নিয়মে চলিতে শিখিতে, তাহা হইলে মায়ের ছেলে হইয়া মায়ের অনন্ত শক্তি সামর্থ্য লাভ করিতে পারিতে। প্রথমে পুস্তক অধ্যয়ন করিলেনা, তবে পুস্তক রচনা করিবে কিরূপে? তবে আচার্য্যের সাহায্যে যদি জীবন-গ্রন্থ ভাল করিয়া রচনা করিতে পার, তাহা হইলে তোমার ও লোকের পরম উপকার হইবে।

এক একটী মনুষ্য এক এক খানি পুস্তক বিশেষ।

গর্ভবাস এই পুস্তকের মলাট, জন্ম জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ইহার সূচীপত্র, দীক্ষাগ্রহণ ইহার উৎসর্গ পত্র, শৈশব, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্যাদি ইহার এক একটী পরিচ্ছেদ, জীবনের ভাল মন্দ কার্য্য ইহার পাঠ্য বিষয়। যাহারা দরিদ্র, সামান্য বস্ত্রাদি পরিয়া থাকে, তাহারা যেন সাদা মলাট মোড়া সামান্য পুস্তক, যাহারা ধনাঢ্য রাজা বা মহারাজা, তাহারা যেন ভাল বাঁধাই করা সোণার জলের কাজ করা মলাটে মোড়া এক এক খানি বৃহৎ গ্রন্থ। যাহারা অল্প দিন জীবিত থাকিয়া বিশেষ কোন কার্য্য না করিয়াই তনুত্যাগ করে, তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক। যাঁহারা অল্প দিন জীবিত থাকিয়াও লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যাইতে পারেন, তাঁহারা ক্ষুদ্র পুস্তক হইয়াও সারগর্ভ ও মূল্যবান্। যাঁহারা দীর্ঘজীবী হইয়া সুমহৎ কার্য্য রাশি অনুষ্ঠান করিয়া যান, তাঁহারাই সুবৃহৎ গ্রন্থ, এবং জগতের সকলেরই পাঠ্য। যাঁহারা অন্যের জীবন গঠন করিবার

উপদেশ দিয়া থাকেন অথচ নিজ জীবনে কোন বিশেষ কার্য্য করেন না, তাঁহারা " ব্যাকরণ "। যাঁহারা রাজা মহারাজা আদি বড় বড় লোকের গল্প করিয়া সভা ও সমাজ গরম করিয়া রাখেন, তাঁহারা ইতিহাস। যাঁহারা জগতের লৌকিক হানি লাভ বিচার করিতে করিতে দিন কাটাইয়া থাকেন, তাঁহারা গণিত গ্রন্থ। যাঁহারা জড় জগতের চেষ্টা চরিত্র চিন্তা করাই পুরুষার্থ মনে করেন, তাঁহারা ভূগোল। যাঁহারা কেবল রঙ্গ, রস, আমোদ, প্রমোদ, বিলাসই জীবনের সার করিয়াছেন, তাহারা নাটক। যাঁহারা পরোপকার, সত্য, দয়া, নিষ্ঠা আদির দ্বারা অলঙ্কৃত, তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র। যাঁহারা বৈষয়িক ব্যাপার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া ভক্তি সহ ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যোগ শাস্ত্র। এইরূপ মনুষ্য মাত্রেই প্রত্যেকেই এক এক খানি গ্রন্থ বিশেষ। যাহাতে আপনার জীবন-গ্রন্থ পরিপাটী রূপে লিখিত হয়, যাহাতে তুমি বিদ্যাবান্ লোকের পাঠ্য হও,

যাহাতে তোমার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে সারগর্ভ বিষয় লিপিবদ্ধ থাকে, যাহাতে তোমার মূল্য অধিক হয়, তোমার মৃত্যু হইলেও তোমার জীবনচরিত অন্য জীবনে পুনর্মুদ্রিত হইতে পারে, যাহাতে তোমার মূল গ্রন্থের সহস্র সহস্র সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তুমি সেইরূপে আপনার জীবনগ্রন্থ রচনা কর । লিপিদোষ বা ভাব-দোষ, সাধু সজ্জন বা শাস্ত্রীয় আজ্ঞার দ্বারা সংশোধন করিয়া লও। মনুষ্যজীবনে যে পাপাদি দেখিতে পাও তাহা মুদ্রাঙ্কণের দোষ জানিবে, উহা পশ্চাত্তাপ বা প্রায়শ্চিত্তরূপ সংস্কার পত্রে সংশোধিত করিয়া লইবে। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যেমন পুস্তকই রচিত হউক না কেন, সকল পুস্তকের শেষেই "সমাপ্তোঽয়ং" (মৃত্যু) লিখিত আছে, এই কথাটী স্মরণ রাখিয়া চলিও। যেন আলস্য ঔদাস্য বা উপেক্ষা করিয়া পুস্তক অর্দ্ধ সমাপ্ত রাখিয়া যাইও না। মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া যত টুকু পবিত্র শক্তি সামর্থ্য লাভ করিয়াছ, যত্ন সহকারে

তাহার কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া যাও। বৃথা সময় নষ্ট করিও না।

ভারত! তুমি স্বাধীনতা চাও?

তুমি কি বিজাতীয় রাজ্য-শাসন-ভার সহ্য করিতে পারিতেছ না? তুমি কি বিশাল সাম্রাজ্য দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে স্বয়ং শাসন করিতে পারিবে এরূপ বিশ্বাস কর? তোমার বাহুবল, পরাক্রম, তেজ ও মনোবৃত্তি কি এত উত্তেজিত হইয়াছে যে তুমি অপরের করে নিজ রাজদণ্ড দর্শন ক্লেশকর ও নিতান্ত দৃষ্টিশূল মনে করিতেছ? ধন্য তোমার দুঃসাহস! তোমার শরীরের বল, মনের বল, স্বদেশীয় প্রকৃতির বল কি আর্য্য-রাজ্য-শাসন কালের ন্যায় তেজস্বী ও বিদ্যমান আছে? তোমার সে শুভ দিন প্রাকৃতিক নিয়মে তিরোহিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার আস্ফালন প্রেতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় বলিতে হইবে। তুমি কি স্থির করিয়াছ, যে অনেক

সৈন্য সামন্ত সমবেত হইয়া বিপ্লব করিলেই রাজ্য তোমার অধিকারায়ত্ত হইবে? তুমি রাজ্যধিকার, কেবল বাহু বলের আয়ত্ত মনে কর, তাহা নহে। শরীরের বল অপেক্ষা উহাতে মনের অধিক বল আবশ্যক। তোমার যেরূপ দুর্ব্বল মন, তোমার মনে যেরূপ কলুষ-রাশি পরিপূর্ণ, তোমার ধীরতা, ধারণা, প্রশস্ততা, উচ্চ-চিন্তাশীলতা, বিজ্ঞান-বুদ্ধি, সূক্ষ্ম দর্শিতা, মৈত্রী আদি এত অল্প, যে তুমি আপাততঃ যে মনুষ্যশ্রেণীতে স্থান পাইতেছ, ইহাই আশ্চর্য্য! বোধ করি তোমার কুল-মর্য্যাদা (আর্য্য কুলোদ্ভব) জন্য অন্য দেশীয় বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ তোমার সহিত সদালাপ করেন, নতুবা তুমি হয় ত এত দিন এসুখে বঞ্চিত হইতে।

ভারত! তুমি স্বাধীনতা চাও বলিয়া কি আমি তোমাকে তিরস্কার করিলাম? না, তজ্জন্য নহে। তুমি স্বাধীনতা চাও কিন্তু স্বাধীনতা কি, তাহা জান না। কি রূপে স্বাধীনতা লাভ করিতে হয় তাহা বুঝ না, এই জন্য

ভৎর্সনা করিলাম। তোমার কল্যাণের জন্য, ভারত! আজ একটি কথা বলি, ধীর মস্তিষ্কে ধারণা কর।

বিজাতীয় জাতির হস্ত হইতে স্বদেশকে মুক্ত করাই যথার্থ স্বাধীনতা নহে; তাহাতে তোমার বীরত্ব কি? কেবল প্রচুর সৈন্য সামন্তের, ঐশ্বর্য্যের, বুদ্ধির ও একতার বল প্রকাশ পায় মাত্র। যদি যুদ্ধ করিয়া ও নরশোণিতে সমরাঙ্গন কর্দ্দমিত করিয়া স্বদেশ সমুদ্ধার ও বিদেশীয় রাজগণের অধিকারাপহরণ করিলেই বস্তুতঃ স্বাধীনতা হইত, তাহা হইলে আলেক্জাণ্ডার, নেপোলিয়ান বোনাপার্টী, সীজর, সিকিও, এফিকেনস, হানিবল, আদি প্রধান প্রধান সামরিকগণকেও আমরা স্বাধীন বলিতে পারিতাম কিন্তু তাহা কদাচ পারি না ও পারিবও না, বরং তাঁহাদিগকে প্রধান শ্রেণীর দাস বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। যিনি পিতা মাতার ভক্তির অধীন, স্ত্রী পুত্রের প্রেমের অধীন, আত্মীয় কুটুম্বের অধীন, নিজ উত্তমর্ণের অধীন, বিষয়-বৃত্তির

অধীন এবং কোন না কোন প্রকারে সমাজের অধীন তিনি স্বাধীন কিরূপে ? যিনি জল, বায়ু, চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদির অবস্থা ও গতিবিধির অধীন থাকিয়া আপনার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সুখ লাভ করিয়া থাকেন, তিনি স্বাধীন কি রূপে ? যিনি বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যাদি কালের অধীন, চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের অধীন, শুভাশুভ কর্ম্মের অধীন, তিনি আবার স্বাধীন কি রূপে ? যিনি ভাবের অধীন, যিনি জাতি, কুল, অবস্থা, সংস্কার ও সম্প্রদায়ের অধীন, যিনি কাম ক্রোধাদি রিপুবর্গের অধীন, যিনি জন্ম জরা ও মৃত্যুর অধীন, তিনি আবার স্বাধীন কি রূপে ? বাস্তবিক সেই ব্যক্তিই যথার্থ বলবান্, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বীর, সেই ব্যক্তিই পুরুষ-প্রধান, সেই মহাত্মাই প্রভু ও ধন্য এবং তিনিই অবিসম্বাদিতরূপে স্বাধীন, যিনি তপস্তেজোবলে মহাবলশালী দুর্জ্জয় ষড়্‌বৈরী পরাভব পূর্ব্বক পঞ্চ কোষ রূপ

দুর্গভেদে সমর্থ ও যিনি অষ্ট পাশ পারিষদ পরিবেষ্টিত প্রবল বিক্রম মন মহারাজাকে নিজ শাসনাধীন করিয়া তাঁহার উপর স্বয়ং আধিপত্য করিতে পারেন, আমরা সেই মহাত্মা বীরশ্রেষ্ঠকে স্বাধীন জানিয়া বার বার নমস্কার করি।

যিনি নিয়ত দাসের ন্যায় প্রভুর আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিয়া কার্য্য করেন, তাঁহাকে কোনমতেই স্বাধীন বলা যাইতে পারে না। যিনি এক কি! ছয় প্রভুর সেবায় অনবরত নিরত থাকিয়া তাঁহাদের আদেশ অনুসারে কার্য্য করেন ও প্রভুবর্গের আনন্দ বর্দ্ধনে সর্ব্বদা আত্মদেহ ও মন অর্পণ করিয়া সনাতন ধর্ম্ম-পরাঙ্‌মুখ হয়েন, তাঁহাকে পুরুষাধম ও দাসানুদাস ভিন্ন আর কি বলিব? যিনি পরসেবাপরাঙ্‌মুখ, নির্ভীক এবং যিনি স্বেচ্ছানুসারে লোক-কল্যাণকর কার্য্য-পারদর্শী, সেই মহাত্মাকেই আমরা স্বাধীন, বীর ও সাধু বলিয়া গণ্য করিতে বাধ্য। যদি পূর্ব্বোক্ত

যোদ্ধৃবর্গ যথার্থই "স্বাধীন" পদবী পাইবার যোগ্য হইতেন, যদি উক্ত বীরবর্গ সত্য সত্যই "বীর" পদবাচ্য হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই কালের করাল কবলে বিষম নিষ্পীড়ন সহ্য করিতেন না। তখন তাঁহারা বীরপ্রতাপে কেন না অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া শমনকে শাসন করিলেন? রাবণ, দুর্য্যোধন জরাসন্ধ, প্রভৃতি প্রাচীন বলবীর্য্যশালী রাজগণ এক্ষণে কোথায়? রাবণ তো যমরাজকে সমরে পরাভব করিয়া তাঁহার অশ্বসেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তবে তিনি কালের কবলস্থ হইলেন কেন? পরমেশ্বর তো তাঁহাদিগকে অতুল ঐশ্বর্য্য ও প্রভূত বলবীর্য্য দান করিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার তাঁহাদিগের হস্ত হইতে তৎসমস্ত কাড়িয়া লইয়া তাঁহাদিগকে কালের বিষম দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন কেন? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ সকল মহীপাল ঐশ্বর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া স্বাধীন রাজবৎ ব্যবহার না করিয়া নিকৃষ্ট বিষয়ের দাস্যবৃত্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে মঙ্গলময়

জগদীশ্বর তাঁহাদিগকে রাজ্যশাসনের অযোগ্যপাত্র বিবেচনায় রাজ্য ও জীবন হইতে বঞ্চিত করিলেন।

ভারত ! যখন তুমি প্রকৃত স্বাধীনতা ও বীরত্ব লাভ করিবে, তখনই তোমার সুচারু চরণ চুম্বন করিব। এইরূপ স্বাধীনতাই মনুষ্যকে ভাবদ্বন্ধন-জাল ছেদন করিতে সমর্থ করে। ইন্দ্রিয় দমনে পারগ হইলে বিশ্ব-বিজয়-পতাকা তাহার সম্মুখে স্বতঃই উড়িতে থাকে। ভগবান্ সহায় হইলে তিনি স্বহস্তে স্বাধীনতার মণিময় মুকুট ভক্তের মস্তকে দান করেন। ভারত ! যদি স্বাধীন হইতে চাও, তবে অষ্ট পাশ বেষ্টিত জীবত্মাকে যোগ-বলে ও জ্ঞানবলে স্বাধীন কর, ক্ষুধা পিপাসাদি হইতে প্রাণকে স্বাধীন কর, রোগ, জরা, জন্ম মরণাদি হইতে দেহকে স্বাধীন কর, অতঃপর প্রতিবাসী ও সমস্ত দেশকে স্বাধীন করিবার আশা করিও ; নতুবা ভাগ্য-বলে ও দৈবচক্রে যদিও অকস্মাৎ তোমার রাজকীয় স্বাধীনতা লাভ হয়, তাহা কখনই রক্ষা করিতে পারিবে

না। এই জন্য বলি ভারত! পরিণাম বিবেচনা করিয়া শান্ত ও সুধীর হও। উষ্ণমস্তিষ্কে কেবল "স্বাধীনতা স্বাধীনতা" করিয়া চীৎকার পূর্ব্বক জগৎকে বিরক্ত করিও না। ভূতভাবন ভগবানের শরণাপন্ন হও, উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত বল বুদ্ধি আদি দান করিয়া তিনি তোমাকে প্রকৃত স্বাধীন করিয়া দিবেন। আলেক্‌জাণ্ডার প্রভৃতির ন্যায় স্বাধীন হইয়া ফল কি? ভগবান্ শুকদেব, দেবর্ষি নারদ প্রভৃতির ন্যায় স্বাধীন হও।

ভারত! তুমি বিদেশাচার, কদাচার ও ধর্ম্মবিপ্লব রূপ ভয়ানক তরঙ্গে ভাসিয়া চলিলে, একটু সাবধান হও, নতুবা পরিত্রাণ নাই। শূন্যগর্ভ রাজপ্রসাদাকাঙ্ক্ষী কমলানুকম্পিত মহাশয়গণকে বিনয়-বিনম্র বচনে জিজ্ঞাসা করি, যে বৃথা উপাধি লাভার্থ বৃটিশ রাজকোষ পূর্ণ করিয়া কি হইবে! যাহাতে ভারতে পুনর্ব্বার স্বাধীনভাব উদ্দীপন দ্বারা অজ্ঞান-তিমির-জাল দূরীভূত হয়, ও সমস্ত ভারত সনাতন আর্য্যধর্ম্ম-প্রচাররূপ

রবিকিরণ-জালে তপস্তেজস্তপ্ত হয়, তাহার চেষ্টা ও সহায়তা করুন। গ্রন্থকারগণ! ভারতের জাতীয় ও প্রাকৃতিক উন্নতিসাধক গ্রন্থাদি রচনা করিয়া ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার করিয়া দিন। সদ্বক্তাগণ! নিজ নিজ সাধু জীবন প্রদর্শন পূর্ব্বক হৃদয়ের নিগূঢ় ভাব রাজ্য হইতে বাগ্বিস্তার করিয়া সমুৎসুক শ্রোতৃগণের হৃদয়ে ধর্ম্মোৎসাহ, ভাবোদ্দীপনা, সদুত্তেজনা ও সৎ কার্য্যনিষ্ঠা বদ্ধমূল করিয়া দিন। ভারত-বন্ধুগণ! সকলে প্রশস্তহৃদয়ে ভারতের হিতকার্য্যে যত্ন করুন। শিশুগণ! তোমরা এই সময় হইতেই আর্য্য শাস্ত্রীয় সুনীতি শিক্ষা করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের সরলপথে অগ্রসর হও; অবলাবর্গ! তোমরা সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী আদির পদানুসরণে বদ্ধপরিকর হও; ভারত! তোমাকে পুনর্ব্বার বলি, তুমি পদে পদে ভগবৎপদের আশ্রয় গ্রহণ কর। তুমি ধর্ম্মাত্মা আর্য্যগণকে ক্রোড়ে লইয়াছিলে, আবার বর্ত্তমান সন্তানগণকে আর্য্য আচারে,

আর্য্য ধর্ম্মে ও আর্য্যভাবে দীক্ষিত কর, স্বাধীন হইবে। আর্য্যধর্ম্মের প্রকৃত উন্নতিসাধন ও পুনরুদ্দীপনা করিতে কায়িক, মানসিক, বাচনিক ও আর্থিক সহায়তা কর, নির্ম্মল আর্য্যধর্ম্ম-পালন-পরায়ণ হও, সদাচারে সর্ব্বদা দিনপাত কর, স্বাধীন ভাব লাভ করিবে। মুক্তিই প্রকৃত স্বাধীনতা। ভারত! যদি তুমি স্বাধীনতা চাও তবে এই বেলা স্ব স্বরূপ ভগবানের অধীনতা (স্ব-অধীনতা) স্বীকার কর। আপনাকে (অহংভাবকে) তাঁহার সেবায় নিযুক্ত কর। বল, বীর্য্য, তেজ, ঐশ্বর্য্য আদি তোমাকে আশ্রয় করিবে।

ভারতের ধর্ম্ম-বিপ্লব।

ধর্ম্মজীবনে—প্রকৃত ধর্ম্মজীবনে—ভারতের সনাতন ধর্ম্ম-জীবনে অধুনা ভয়ঙ্কর বিপ্লব উপস্থিত, এ কথা হৃদয়-বান্ ব্যক্তি মাত্রেই দুঃখের সহিত স্বীকার করিবেন।

বিপ্লব-ঝটিকা ভারতের রমণীয় ধর্ম্মকুসুম-কানন ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে, সুগন্ধী প্রফুল্ল ফুল গুলিকে উড়াইয়া লইয়া গিয়া পথের ধূলিরাশিতে বিলুণ্ঠিত করিয়াছে, তরুগুলিকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া দিগ্দিগন্তে ফেলিয়া দিয়াছে। সময় পাইয়া কণ্টকী বৃক্ষ ও আবর্জ্জনা মনোহর কাননকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। পবিত্র ও উজ্জ্বল ভারত এখন অতি-জঘন্য ও মলিন হইয়া পড়িয়াছে।

যখন বেদ, বেদান্ত, রামায়ণ, মহাভারতাদি পাঠ করি, তখন যেন বোধ হয়, আর এ জগতে থাকি না, তখন বোধ হয় যেন এমন এক প্রদেশে আসিয়াছি, যেখানকার সূর্য্য আরও উজ্জ্বল ও পূতকিরণবর্ষী, যেখান-কার চন্দ্রমা আরও স্নিগ্ধ ও পবিত্র, যেখানকার আকাশ আরও গভীর ও সুনির্ম্মল, যেখানকার নদী আরও স্বচ্ছ ও মধুর নিনাদে নৃত্য করিতে ২ প্রবাহিত, যেখানকার প্রকৃতি যেন স্বর্গীয় পবিত্রতা ও উজ্জ্বলতা মণ্ডিত। তখন যেন এক পবিত্র প্রশান্ত জ্যোতির্জ্জগতে বিচরণ

করিতেছি। সেখানকার সকলই নবীন, নির্ম্মল নিরুপদ্রব। কিন্তু যখনই পাঠ শেষ করি, অমনি বোধ হয়, যেন কে আমাকে সবলে ধাকা দিয়া আর এক জগতে ফেলিয়া দিল। পড়িতে পড়িতে দেখিতে লাগিলাম, যেন সে চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, নদী, আকাশ একে একে আমার চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে, আর আমি দূরে—বহুদূরে আর এক জগতে আসিয়া উপস্থিত হইতেছি—সেখানকার সকলই নিষ্প্রভ, সকলই শোভাহীন, সকলই যেন কি এক অব্যক্ত কালিমায় বিলেপিত। তখন আমার মন কাঁদিয়া উঠে। ভগবন্! কেন আমার এদশা ঘটিল। কেন অন্তঃকরণের সজীবতা ও সুন্দরতা বিনষ্ট হইল! যাহা দেখিলাম, আর কি তাহা দেখিতে পাইব না!

কোন কাব্যের অভিনয় হইতে হইতে যদি সুনিপুণ গায়ক, বাদ্যকর ও অভিনেতৃগণ অকস্মাৎ রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করে ও তৎপরিবর্ত্তে কতক গুলি অশিক্ষিত ও

হীনমতি বালক ও যুবক তাহা অধিকার করে, কেহ বীণার সুর চড়াইতে গিয়া তাহার তার ছিঁড়িয়া ফেলে, কেহ মৃদঙ্গ বাজাইতে গিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে, সকলে মিলিয়া ঘোর রোল উপস্থিত করে, দর্শকগণ বিরক্ত ও ত্রস্ত হইয়া পলায়ন-পর হয়েন—তাহা হইলে রঙ্গশালার যেরূপ অবস্থা হয়, ভারত-ভূমিরও ঠিক সেই রূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। তেজঃপুঞ্জ ঋষি ও মহামান্য পিতামহগণ ভারত-রঙ্গশালা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের বেদ, পুরাণ, স্মৃতি আদি পড়িয়া আছে। সামান্যা বিদ্যা ও ধনদুর্ম্মদান্ধ হইয়া, আমাদিগের ন্যায় কাপুরুষগণ তাঁহাদিগের পবিত্র ও উজ্জ্বল অভিনয়-ক্ষেত্রে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আমরা শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মার্থ বুঝিতে না পারিয়া, তাহার সদ্ব্যবহারে অসমর্থ হইয়া, তাহার নিগূঢ় লক্ষ্য সকল উপেক্ষা করিয়া, দিন দিন অধঃপাতিত হইতেছি, আর্য্যদিগের পবিত্র কার্য্য-ভূমি নিতান্ত নিন্দিত করিয়া ফেলিতেছি, সুখ, স্বাধীনতা

ধৰ্ম্ম আদিং হইতে একেবারে বঞ্চিত হইতেছি। এতদ্দর্শনে সাধুগণ গম্ভীর বিজন বনে পলায়ন করিলেন, সূক্ষ্মদর্শিগণ নীরব হইলেন, প্রবীণগণ একে একে অবসর লইলেন। শাস্ত্র-মহিমা, মন্ত্র-মহিমা, তপো-মহিমা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অসদর্থে, অসদ্ব্যবহারে, কপটাচারে সমস্তই নিন্দিত হইয়া উঠিল। ভারতভূমি শূন্য ও মলিন হইতে লাগিল—রঙ্গশালার দীপমালা নির্ব্বাণ হইল—অভিনয় বন্ধ হইয়া গেল—গীত, সুর তান, লয় লোপ পাইল। সকলই অন্ধকার!!। ঘোর অন্ধকারে ভারত আচ্ছন্ন হইল।

হা! দুঃখের উপর আবার দুঃখ আসিয়াই উপস্থিত হয়। এই সময়ে কতকগুলি খদ্যোতের অভ্যুদয় হইয়াছে। তাঁহারা বলেন " আর্য্য আর্য্য করিয়া মর কেন! আর্য্যেরা জানিত কি? তাহাদের ছিল কি? এখন রেলওয়ে হইয়াছে। টেলিগ্রাফ হইয়াছে। (সৌদামিনী স্বয়ং দুতী হইয়াছেন!) ভূরি ভূরি বিলাসদ্রব্য পাই-

তেছ। মোটা মাহিনার চাকুরী পাইতেছ। "সভ্যতার যথেস্ট উন্নতি হইয়াছে। (Civilization far improved) ধর্ম্মও এক রকম চলিতেছে, আবার চাও কি?" আমরা ধুম ধাম গোল মাল চাহি না; আর্য্যেরা কি জানিতেন, তাহা যদি আমরা জানিতাম, তবে ভাবনা কি ছিল! তাঁহারা যাহা জানিতেন, তাহাই জানিতে চাই, তাঁহারা যাহা দেখিতেস তাহাই দেখিতে চাই, তাঁহারা যাহা ভাবিতেন তাহাই ভাবিতে চাই,তাঁহারা যাহা করিতেন, তাহাই করিতে চাই। যে সভ্যতা পিতা, মাতা, ভ্রাতাকে উপেক্ষা করিয়া, শ্বশ্রু স্ত্রী, ও শ্যালকের বশীভূত হইতে পরামর্শ দিতেছে, যে সভ্যতা সমাজে অনিবার্য্য ব্যভিচার, স্বার্থপরতা, স্বতন্ত্রতা বিশৃঙ্খলা, অনৈক্য আদি পুঞ্জায়মান আবর্জ্জনা রাশি আনিয়া ফেলিয়াছে, যে মায়াবিনী সভ্যতা সন্তরণে সাগর পার হইয়া, লোক-সকলকে শিশ্নোদর-পরায়ণতার বীজমন্ত্রে দীক্ষিত করি-তেছে; আমরা তাহাকে সভ্যতা বলিতে চাহি না।

যে সভ্যতা কেবল বিষয়-স্পৃহাকেই বলবতী করিতেছে, যে সভ্যতা ধর্ম্মকে হৃদয় হইতে টানিয়া রসনার বিলাস-বস্তু করিয়া দিয়াছে, যে সভ্যতা বিকট হাস্য-বিকাশে সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকেও উড়াইতে চায়, আমরা তাদৃশী সভ্যতার পক্ষপাতী নহি। আমরা বিরাটের উত্তর গোগৃহে অর্জ্জুনকে শূন্য মার্গে রথ চালাইতে দেখিয়াছি, আমরা মহারাজা নলকে ষ্টীম এঞ্জিন অপেক্ষাও দ্রুতবেগে রথ-সঞ্চালনে সমর্থ দেখিয়াছি। আমরা সেইরূপ তড়িদ্বার্ত্তাবহ দেখিতে চাই, যাহা দুর্ব্বাসার আগমনে বনবাসিনী দ্রুপদনন্দিনীর ব্যাকুল চিন্তাস্বর শ্রীকৃষ্ণের কর্ণকুহরে কহিয়া ছিল। এরূপ বিলাস-দ্রব্যে আমাদের প্রয়োজন কি, যাহাতে হৃদয়ের পবিত্রতা বিনষ্ট করে; এমন ধনে প্রয়োজন কি, যাহাতে আমা-দিগকে মদান্ধ করিয়া দেয়। আমরা পর্ণকুটিরে বাস করিতেও প্রস্তুত, যদি আর্য্যগণের ন্যায় সুখ পাই। আমাদের বিক্রম গেল, বীরত্ব গেল, সুখ গেল, স্বাধীনতা গেল, শান্তি গেল, তবে থাকিল কি!

হায় ! এ মনের দুঃখ কাহাকে জানাইব ! যাঁহা-দিগকে জানাইলে বেদনার উপশম হইত, তাঁহারাও নাই । সে অগ্নি নিবিয়া গিয়াছে। হা ! ভারতে যে বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ সমাজ ও ধর্ম্মপথের নেতা ছিলেন, এক্ষণে এই ঘোর বিপৎসময়ে তাঁহারা কোথায় লুক্কা-য়িত হইলেন ! তাঁহাদের বংশধরগণ সেই পবিত্র পদবী পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক্ষণে কোন্ দিকে প্রস্থান করিতে-ছেন ! হাঃ ! সিংহের শিশু হইয়া শৃগালের বেশ কেন হইল ! অভ্যন্তর হইতে জীবন্ত ফণী চলিয়া গিয়াছে, কেবল ফণীর অনুকৃতি জীর্ণত্বক্ পড়িয়া আছে। গলদেশে পবিত্র যজ্ঞোপবীত থাকিতে থাকিতেই কি ব্রহ্ম-তেজ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল ! আশ্রমে আশ্রমে ভ্রমণ করি-লাম, কুলনারীগণের কলহ ভিন্ন আর বেদধ্বনি শ্রুত হইল না। ভারতীয় গগণ আর যজ্ঞধূমে পবিত্র হয় না। গৃহাদি আর দেবপূজা ও হোমের সৌগন্ধে আমোদিত হয় না। অর্থের লালসা, বিষয়ে মত্ততা ও ধর্ম্মে ঔদাসীন্য

বৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে সমুচিত দক্ষিণা দিতে পারিলে, স্মৃতির নূতন ব্যবস্থা ক্রয় করিতে পারা যায়। পাশ্চাত্য আলোকের একটী কিরণ যদি কাহাকেও স্পর্শ করিতে পায়, অমনি তাহাকে ইন্দ্রজাল-বিমুগ্ধ করিয়া ফেলে। অধ্যাপক আর পুত্রকে সংস্কৃত শিখাইতে চান না, সন্তান আর সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতে ইচ্ছুক নহে। যাঁহারা পবিত্রতার জ্বলন্ত মূর্ত্তি ও ভূদেব বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, হা! ম্লেচ্ছাচার তাঁহাদিগকেও অন্ধ করিয়া দিল। ব্রহ্মচর্য্য গিয়াছে, ব্রাহ্মণ্য যাইতে বসিয়াছে, ব্রহ্মসূত্র গাছটী ও যায় যায় হইয়াছে। কি ঘোর বিপদ্! আর্য্য জাতির পবিত্রালোক ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে। ভীষণ নারকী অন্ধকার মুখ ব্যাদান করিয়া আসিতেছে, আর কিছু পরে যেন সকলই অন্ধকার হইবে। আশা, ভরসা সমস্ত ফুরাইবে, আর্য্যদিগের পবিত্র নাম বুঝি বিলুপ্ত হইবে। মহত্ত্ব যে ভারতভূমির সুচারু চরণের চির সেবক ছিল, সেই চির গৌরব বুঝি পৃথিবী হইতে ধৌত হইয়া যাইবে।

সত্য বটে, প্রধানতঃ অর্জ্জন-স্পৃহা রোমকে মহৎ করিয়াছিল ও ইংলণ্ডকে মহৎ করিয়াছে। মাতৃভূমির প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ গ্রীস্‌কে মহৎ করিয়াছিল, কিন্তু কে না স্বীকার করিবে যে, আমাদের ভারতবর্ষ এক সময়ে গ্রীস, রোম ও ইংলণ্ড অপেক্ষা উন্নতির অধিকতর উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। সত্য বটে, দুই এবং জন খ্রীষ্টিয়ান মুখোপাধ্যায়, বন্দোপাধ্যায় মহোদয় বলেন যে " ভারতের আর কি উন্নতি হইয়াছিল, কেবল জন কতক লোক একটু ফিলজফি শিখিয়াছিল। " কিন্তু প্রকৃত চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, ভারতের যে উন্নতি হইয়াছিল, তাহা আর কোন দেশে এপর্য্যন্ত হয় নাই। কেবল পরমাত্ম-পরিচিন্তনাই ভারতকে উন্নতির উচ্চ সিংহাসনে বসাইয়াছিল। ভাষা, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন আদি তাবদ্বিষয়িণী উন্নতিই তাঁহাদের চরণ সেবা করিয়াছিল।

ভারতীয় সমাজ ধর্ম্মে গঠিত। ধর্ম্ম-সূত্রকে অবলম্বন না করিয়া অত্রস্থ দৈনন্দিন কার্য্যের একটীও সংরচিত হয় নাই। আজ সেই পুণ্যভূমি আর্য্যক্ষেত্রে ধর্ম্ম অনাদৃত, পদবিদলিত ও তিরস্কৃত হইতেছে। স্বেচ্ছাচারই আজ কাল ধর্ম্মের পবিত্র আসন অধিকার করিয়াছে। কেহ কৃষ্ণভ্রমে খ্রীষ্টের শরণ লইলেন, কেহ স্বয়ং সিদ্ধ সহজজ্ঞানশীল হইয়া জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন, কেহ নিজ বিধানকে নব বিধানের পরিচ্ছদ পরাইয়া সখি সম্বাদ গাইতেছেন, এবং অবশিষ্টের মধ্যে কত লোক যে মুখে হিন্দু স্বীকার করিয়া না হিন্দু না মুসলমান হইয়া উঠিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না।

ধর্ম্ম-জীবনে কেন এত বিপ্লব ঘটিল, ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্ম ভ্রাতারা বলিবেন, ঋষিগণ মনুষ্য ছিলেন, সুতরাং অভ্রান্ত ছিলেন না, অতএব তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্ম যে ভ্রান্তিসঙ্কুল হইবে তাহার বিচিত্রতা কি! তাঁহাদের ভ্রান্তি-প্রচারের

সঙ্গে ২ ভারতের ধর্ম্ম-জীবনে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। বৌদ্ধ,মুসলমান, খ্রীষ্টীয় আদি কত ধর্ম্ম যে সনাতন ধর্ম্মের মণিময় মন্দিরের সুচারু চূড়া চূর্ণ করিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিলেন, তাহা বলা যায় না; কিন্তু যাই একটী ধর্ম্ম প্রবল হইয়া, আর্য্য ধর্ম্মের মর্ম্মদেশে আঘাত করিতে যায়, অমনি আর্য্য ধর্ম্মের বজ্রবিজয়ী সিংহনাদে সকলে ত্রস্ত, কম্পিত ও হতচেতন হইয়া পড়ে। বিশুদ্ধ ভারত আর্য্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া আর কাহারও নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে চাহে না। ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত রাজার শাসনাধীনতা, আর্য্য শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যার অভাব, বালক কাল হইতে আর্য্য ধর্ম্মানুকূল রীতিনীতি শিক্ষাদানে ক্রটী, সময়ে ২ আর্য্যধর্ম্মের প্রচুর প্রচারাভাব, গুরু পুরোহিতবর্গের অকৃতবিদ্যতা, চিত্তের অপ্রশস্ততা, স্বার্থপরতা ও ধর্ম্মজ্ঞান-বিহীনতা, সংস্কৃত-ভাষার প্রতি অযথা বিরাগ আদি বিবিধ কারণে ভারতের ধর্ম্ম-জীবনে ঘোর বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

যদি ভারতের সাধু সন্তানগণ আবার সাধু চেষ্টা করেন, তবে আবার ভারত সেই অবহেলিত ও পদবিমর্দ্দিত ধর্ম্মকে মস্তকে ধারণ করিয়া নৃত্য করিবে, আবার সুখের দিনে ভারত সুখের পরম জ্যোতিঃ বহুধা বিকীর্ণ করিয়া, সমস্ত জগৎকে সুখ-সাগরে ভাসাইবে।

আঘাতের পর যেমন প্রতিঘাত, ক্রিয়ার পর যেমন প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক, উন্নতির পর অবনতিও তদ্রূপ অনিবার্য্য। বিজাতীয় ভাষা-শিক্ষা এই অবনতি-স্রোতে ভয়ঙ্কর বিপ্লব-তরঙ্গের সাহায্য করিয়াছে। মুসলমান-শাসনে পার্সি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভারত বিলাস-প্রিয় ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইয়াছিল, কিন্তু তখনও আর্য্য আচার ব্যবহারের অবশিষ্ট ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষা সেটুকুও ভাসাইয়া দিতেছে। ইংরাজি পড়িতে দোষ দিই না, কিন্তু ভাষার অনুরাগ সহ অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে যে সেই বিজাতীয় প্রকৃতি অলক্ষিত ভাবে পাঠকের হৃদয়াধিকার করে ইহাই আক্ষেপের বিষয়। ইংরাজি

শিখিতে শিখিতে যে ইংরাজ হইতে ইচ্ছা হয় ইহাই পরম দোষাবহ। এই ভাব পরিহার করা বড়ই কঠিন। অনুরাগ সহ আর্য্য শাস্ত্র পড়িতে পড়িতে মোক্ষমূলরের আর্য্য হইতে স্পৃহা জন্মিয়াছে। জল-মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিতে গেলে যেমন জল পরিহার করা যায় না, তদ্রূপ ইংরাজি ভাষা পড়িবার সময় ইংরাজি প্রকৃতি অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। হংসপাঠক কয় জন পাওয়া যায়? এই ভাবে চিত্ত বিকৃত হইল। আবার মিশনারিগণ শাস্ত্রের মর্ম্ম না বুঝিয়া আর্য্য ধর্ম্মের বৃথা নিন্দা বাদ করিয়া অশিক্ষিত লোকের মন আরও কলুষিত করিলেন, শাস্ত্র-জ্ঞানবর্জ্জিত বালকের কপালে আগুণ লাগিল। তৎপরে ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণ বক্তৃতার বেগে তাহাদিগকে আকর্ষণ করিলেন। বক্তৃতার আশু মনোমোহিনী শক্তি হৃদয় অধিকার করিল। কিছু দিন পরে যখন দেখিল যে সমাজে কেবল-মাত্র বচন-সাধনায় ব্রহ্মোপলব্ধি হইবার আশা নাই, উহাও রূপান্তরিত খ্রীষ্ট ধর্ম্ম; তখন যুবা

ভাবিল ধর্ম্ম কর্ম্ম মিথ্যা। নাস্তিকতা তাহার স্কন্ধে আশ্রয় করিল। কুকর্ম্মকণ্টকমালা তাহার কণ্ঠমালা হইল, মনুষ্যের জীবনের উদ্দেশ্য কেবল ভোগেচ্ছায় পরিসমাপ্ত হইল। যুবা দিগ্বিদিক্ জ্ঞান-শূন্য হইল। বারুণী, বারাঙ্গনার সেবাই তাহার প্রধান কার্য্য হইল। রাক্ষসাচার, পশ্বাচার, ব্যভিচার, যথেচ্ছাচার আর তাহার চক্ষে দূষণীয় নহে। সহধর্ম্মিণীও তাহার সহগামিনী হইল। ভারত পাপস্রোতে ভাসিতে লাগিল। ভয়ানক বিপ্লব আসিয়া পবিত্র ভারতকে কলঙ্কিত করিল।

আর্য্যসন্তান! যদি কেহ জাগ্রত থাকেন, সচেতন থাকেন, তবে উত্থান করুন। জননী ভারতভূমির দুঃখাপনোদনে যথাবিধি যত্ন করুন।

ত্রাহি! ত্রাহি!! ত্রাহি!!!

জাতীয় প্রকৃতি।

বিধাতার বিচিত্র রচনাপ্রণালী পর্য্যালোচনা কর, দেখিতে পাইবে তাঁহার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে, অনন্ত দ্রব্য, অনন্ত কৌশল, অনন্ত ব্যবস্থা ও অনন্ত ব্যাপার নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছে, অনন্ত ভাবে তাঁহার অনন্ত মহিমার গুণ কীর্ত্তন করিতেছে। "অনন্ত" শব্দ আমাদিগের বুদ্ধির আয়ত্ত নহে, কিন্তু চিরদিন তাঁহার ভাবের, গুণের ও স্বরূপের সেবা করিয়া থাকে। এই অনন্ত ব্যাপারের মধ্যে আবার সৌষ্ঠব ও শৃঙ্খলার সীমা নাই। সমস্ত জগৎ তাঁহার নিয়মের অধীন হইয়া কেমন শৃঙ্খলা পূর্ব্বক তাঁহার বিচিত্র লীলার অভিনয় করিতেছে! কীট পতঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত, তরুলতা গুল্মাদির দিকে অভিনিবেশ কর তাহারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। তির্য্যগ্ জাতির দিকে নেত্রপাত কর, তাহারাও স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত,

চতুষ্পদের দিকে তাকাও, তাহারাও পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত। এই রূপ স্থাবর জঙ্গমাত্মক সৃষ্টি অনন্ত হইয়াও আশ্চর্য্য কৌশল ক্রমে সকলে ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইয়া বিধাতার বিচিত্র শিল্প চাতুরীর পরিচয় প্রদান করিতেছে।

প্রকৃতির বৈচিত্র্যই জাতি বা শ্রেণীভেদের মূল। বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি অনুসারে বিশেষ বিশেষ জাতি বিরচিত হইয়া থাকে। অশ্বত্থ, আম্র, বিল্ব, বট, বকুল, শাল, তাল, তমাল, নিম্ব, নারিকেল প্রভৃতি ভূরুহবর্গ সকলেই উদ্ভিদ্ হইয়াও প্রকৃতিভেদে বিশেষ বিশেষ নাম, রূপ গুণ, অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছে। মক্ষিকা, মশক, দংশক, আদি ক্ষুদ্র জীবগণ প্রকৃতিভেদে ভিন্ন জাতিত্ব লাভ করিয়াছে। সর্প, বৃশ্চিকাদি সরীসৃপগণ প্রকৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে আবদ্ধ হইয়াছে। শুক, পিক, কাক, শকুন্ত, গৃধ্র আদি খেচরগণ প্রকৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন

জাতি হইয়াছে। গো, মেষ, মহিষ, মার্জ্জার, সিংহ, শার্দ্দূল আদি চতুষ্পাদ গণও প্রকৃতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। বাহ্য আকৃতি, স্বর, মনঃপ্রকৃতি জন্য ইন্দ্রিয়গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা আদি দেখিয়াই, আমরা বিশেষ বিশেষ প্রাণীর শ্রেণী নিরূপণ করিয়া থাকি। আবার স্ব স্ব শ্রেণীর মধ্যেও দেশ দেশান্তর, জল বায়ু ও জ্যোতিশ্চক্রের গতি বিধি অনুসারে প্রকৃতির বিভিন্নতা প্রযুক্ত অগণ্য বিভাগ দৃষ্ট হয়, তাহার সীমা করা মানবের সামান্য বুদ্ধির সাধ্যায়াত্ত নহে। অনন্ত স্বরূপের অনন্ত লীলার সম্যক্ তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে, প্রথমে অনন্ত সত্তার অমৃতসাগরে অবগাহন করিতে হয়। নতুবা কেবল বুদ্ধি, চিন্তা, বা কল্পনা তাহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারে না। তাঁহার অনন্ত আকাশে তারকাস্তবক দেখিয়া কে না অবাক্ হইয়া যায়!

দ্বিপদ জীবের মধ্যে মানব একটী বিশেষ শ্রেণীভুক্ত।

মানবের শরীর ও মনঃপ্রকৃতি সকল প্রাণী হইতে অতীব উন্নত ও পরিণত। দেখিলে বোধ হয় যেন সমস্ত প্রাণীর উন্নতির আদর্শস্থল হইয়া মনুষ্য বিরচিত হইয়াছে। দেশ দেশান্তরীয় প্রকৃতি মনুষ্য সমাজের দৈহিক বর্ণ, গঠন, বল বীর্য্য, ভাষা, পরিচ্ছদ, ধর্ম্ম আদি তাবদ্বিষয়েরই বিভিন্নতা সম্পাদন করিয়াছে। এই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় জন্য পাশ্চাত্য দেশের সহিত পূর্ব্ব ভূভাগের সর্ব্বসাধারণ বিষয়ে ঐকারয়বিকত্ব বা একরূপত্ব দৃষ্ট হয় না। প্রকৃতি সকল জাতিকে একজাতীয় উপাদানে নির্ম্মাণ করেন নাই সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মে সকল দেশের মনুষ্য কখনই এক অবস্থাপন্ন হইবে না ও হইবার নহে। প্রকৃতির রীতি এই যে যেখানেই প্রকৃতির উপাদান তীব্র, তেজস্বী ও প্রবলতর, সেই স্থানেই দুর্ব্বল প্রকৃতি তাহার পদানত হইয়া থাকে। যদি তীব্রতর প্রকৃতি অধিক দিন উক্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির সহানুভূতি করে, তবে দুর্ব্বলাও বলীয়সী হইয়া উঠে। আর যদি প্রবলতর

প্রকৃতি দুর্ব্বলের উপর আধিপত্য করে, তবে দুর্ব্বল এক কালে বিনষ্ট হইয় যায় ও বলবতী প্রকৃতি সেই স্থানে অধিকার বিস্তার করে। যদি একজন বিদ্যাবান্ ব্যক্তি জনৈক মূঢ়ের সহিত বার্ত্তালাপ-কালে তাহার মূঢ়তা জন্য অস্ফুট ভাব ও তর্কের অযৌক্তিকতা দর্শনে দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক নিজ বুদ্ধি দ্বারা তাহার ভাবের বিকাশ ও তর্কের সরল পথ দেখাইয়া দেন, তবে উক্ত মূঢ় ব্যক্তি বিদ্যাবান্ পুরুষকে গুরুপদে বরণ করিয়া নিজ উন্নতি সাধন করিতে পারে। আর যদি বিদ্যাবানের তীব্র তর্কজাল মূঢ়ের বুদ্ধি ভেদ করিয়া কেবল নিজ তেজস্বিতা বিস্তার করিতে থাকে, তবে মূঢ়ের বুদ্ধি নিতান্ত অভিভূত ও বিনষ্ট হইয়া যায় ও উক্ত পণ্ডিতের যুক্তি ও তর্কই তাহার হৃদয়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রথমটীতে ইহাই প্রদর্শিত হইল যে প্রবলতরের সহানুভূতিতে দুর্ব্বল প্রবল হইয়া উঠে; দ্বিতীয়টীতে ইহাই উপপন্ন হইল, প্রবলতরের আধিপত্যে দুর্ব্বল বিনষ্ট

হইয়া যায় ও তৎপরিবর্ত্তে একমাত্র প্রবল প্রকৃতিরই সর্ব্বত্র অভ্যুদয় হয়।

কালক্রমে স্বাভাবিক রীতিতেও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়। ৫০০০ বর্ষ পূর্ব্বে যে দেশের, যে জাতির, যে দ্রব্যের যে প্রকৃতি ছিল, বর্ত্তমান শতাব্দীতে সর্ব্বত্র তাহার অল্লাধিক ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। যে সময় লোকের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি যে রূপ ছিল, এক্ষণে আর সেরূপ নাই। সে সময় যত প্রকার জীব ও তরু লতাদি দৃষ্ট হইত, এক্ষণে তাহার অনেক গুলি দেখিতে পাওয়া যায় না, আবার ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক নূতন জাতীয় দ্রব্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বে যে দেশীয় লোকের মনঃপ্রকৃতি যে দিকে ছিল, এক্ষণে তাহার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই রূপে বহুল প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে কালক্রমে স্বাভাবিক নিয়মে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন কোথাও শুভ এবং কোথাও বা অশুভ ফল প্রসব করিয়া থাকে।

কালের স্রোতের উপর নির্ভর করিয়া কোন জাতিই উন্নতি লাভ করে নাই, করিতেও চাহে না। প্রযত্ন ও উদ্যমই উন্নতির মূল। যে জাতি আপনাকে অন্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদবীতে আরূঢ় করাইতে চায়, সে একটী ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের উচ্চতর প্রকৃতিকে আদর্শ করিয়া পুষ্টিলাভ করিতে থাকে এবং সেই উচ্চতর প্রকৃতির সাহচর্য্যে ও সহানুভাবকতায় সমগ্র জাতি উন্নত হইয়া উঠে। স্বতন্ত্র হইয়া কোন ব্যক্তি একাকী জগতে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে না। এক ব্যক্তি কোন একটী নূতন শক্তির আবিষ্কার করিলেন, যত ক্ষণ পর্য্যন্ত সেইটী বহুতর লোকে সমাদর না করিবে অর্থাৎ যত দিন সাধারণের প্রকৃতি তাঁহার প্রশংসনীয় প্রকৃতিতে পরিণত ও তৎসহানুভূতিতে প্রবৃত্ত না হইবে, ততদিন তিনি একাকী কখনই নিজ আধিপত্য সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। ইহাও বর্ত্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞান-বিশারদদিগের দ্বারা

প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, যে গ্রামে একটী মাত্র তাল বৃক্ষ আছে অর্থাৎ যদি সেই বৃক্ষ তাহার অলক্ষ্য শক্তির দ্বারা জানিতে পারে যে তথায় তাহার সজাতীয় বৃক্ষ আদৌ নাই, তবে সেখানে সে উত্তম রূপে বর্দ্ধিত বা ফলপ্রসূ হইবে না। ইহা বোধ হয় অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, যদি একটী উদ্যানে কেবল মাত্র এক জাতীয় বৃক্ষ অর্থাৎ কেবল আম্র বা কেবল নারিকেল রোপিত হয়, তবে সে উদ্যানে এক একটী বৃক্ষে এত ফল ফলিবে যে, অন্য উদ্যানে যদি এক এক জাতীয় এক একটী মাত্র বৃক্ষ থাকে, তাহাতেই কখনই তত ফল দান করিতে পারিবে না। আম্রাতক, নারিকেল, নিম্ব একত্রে দণ্ডায়মান, প্রকৃতিগত কেহই কাহারও সহিত মিত্রতা করিতে পারিতেছে না—হৃদয়ে কাহারও স্ফূর্ত্তি নাই, পরস্পর সকলেই নিস্তেজ—অগত্যা উদ্যানাধিকারীর আশানুরূপ ফলদানে অসমর্থ। যেখানেই অধিক ফলের আশা, সেই খানেই এক প্রকৃতির বৃক্ষ অধিক থাকা আবশ্যক।

মনুষ্য যখন নিজ গুণের বা পরাক্রমের ফল জগতে অধিক দেখাইতে চায়, তখন এক প্রকৃতির লোক-সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে থাকে। একটী প্রধান প্রকৃতি যত অধিক পরিমাণে লোকরাশিকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ করিবে, ততই প্রত্যেকের প্রকৃতি অধিক পরিমাণে কার্য্যানুকূল হইবে। যে জাতির মধ্যে যে সময়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবিশিষ্ট মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করেন ও যাঁহাদের মহতী প্রকৃতি ধীরে ধীরে, বা দ্রুত-বেগে প্রত্যেকের হৃদয় অধিকার করিতে পারে, সেই জাতিই জগতে প্রবলতর হয় ও তাহারাই জাতীয় প্রকৃতির ফল ও রসাস্বাদে চরিতার্থ হয়।

আহার, ব্যবহার, পরিচ্ছদ, ভাষা, ধর্ম্ম আদি কতিপয় সামগ্রীই জাতীয় প্রকৃতি সংগঠনের প্রধান উপাদান। যদি কোন দেশে কোন মহাত্মা বা কোন সম্প্রদায় এই কএকটীর নির্ব্বিশেষ অথবা অবিরুদ্ধ বা অবিসম্বাদী ভাব প্রচলন করিতে পারেন, তবে সেই

দেশেই জাতীয় প্রকৃতির প্রতিভা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। যে দেশে আহার-সামগ্রী একরূপ, যেখানে জাতক্রিয়া, বিবাহ, শ্রাদ্ধ আদি ব্যবহার প্রণালী এক শাস্ত্রানুমোদিত, যে দেশে পরিচ্ছদ বা বস্ত্রাদি পরিধান করিবার রীতি নীতি একরূপ, যে দেশে সকলেই এক ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে অথবা স্থানীয় নানা ভাষা সত্ত্বেও যে দেশে একটী সর্ব্বসাধারণের বোধ-সুগম ভাষা প্রচলিত আছে এবং যে দেশের অধিবাসীবর্গ এক শাস্ত্রোপদেশানুসারে স্ব স্ব ধর্ম্মসাধন করিয়া থাকে অর্থাৎ, যাহাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস আদি এক প্রকার উপাসনা পদ্ধতিরই অনুগত এবং আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপও এক বিধিতে সম্পন্ন হইয়া থাকে সেই দেশেই জাতীয় প্রকৃতির উজ্জ্বলতর সুন্দর মূর্ত্তি অতীব দেদীপ্যমান— সেই দেশই জগতে উচ্চ পদবী লাভ করিতে সমর্থ।

দুঃখী ভারত! তোমার গতি কি? তোমার এ আশা কোথায়? যদি তুমি আজ স্বতন্ত্র অসভ্যজাতির বাসভূমি

থাকিতে, তাহা হইলেও তোমার প্রকৃতি-গঠনের উপায় ছিল, অথবা যে বিদেশীয় রাজা তোমার উপর প্রভুত্ব করিতেছেন, তিনি যদি তোমার দুর্ব্বলতার সহানুভূতি করিয়া নিজ প্রবল প্রকৃতির সহযোগে তোমার পুষ্টিসাধন করিতেন, তাহা হইলেও আশা ছিল। কিন্তু তাহা না হইয়া বরং প্রবলের আধিপত্যে তোমার নিজ প্রকৃতি বিলুপ্ত হইতে চলিল। বিজাতীয় বিদেশীয় প্রকৃতির প্রতাপে তুমি বিপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছ, এ প্রকৃতি পরিত্যাগ না করিলে, তোমার কল্যাণ নাই। বিজাতীয় প্রতাপে তোমার বুদ্ধি বিকল, ভাব কলুষিত, মতি ছিন্ন ভিন্ন ও চিত্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছে। তোমার প্রকৃতি অতি মলিন হইয়া উঠিয়াছে। তুমি যথেচ্ছ আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া বৈধ আহার ব্যবহারের অনুকরণ কর। কখন বিলাতী, কখন মুসলমানী পরিচ্ছদ না পরিয়া ভারতের স্ব স্ব প্রদেশানুরূপ পরিচ্ছদ ধারণ কর। ভাষা কতক

ইংরাজী, কতক পার্শী, কতক স্বদেশী না বলিয়া কেবল স্বদেশী ভাষার অনুশীলন বা ব্যবহার করিতে থাক। কতক খ্রীষ্টানী, কতক মুসলমানী, কতক বৌদ্ধ, ঈদৃশ বিরূপ ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম সত্য সনাতন স্বদেশীয় (বৈদিক) ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর। ভারতে জাতীয় প্রকৃতির যথোচিত উন্নতি হইবে। ভারত! তবে আবার আত্ম-শাসনে সক্ষম হইবে, ভারতবাসিগণ তখন একটী বিশেষ জাতি বলিয়া সভ্যজগতে পরিচয় দিতে পারিবেন। জাতীয় প্রকৃতি সংঘটিত না হইলে, ভারতের কিছুমাত্র আশা ভরসা নাই। ভারত! সচেতন হও, নিজ অধিকার বুঝিয়া লও। নিজ আসনে স্বয়ং উপবিষ্ট হও, আপনার পরিচয়ে আপনি সুখী হও। আপনার ধনে ধনী হইয়া, সভ্যতা ও জ্ঞানের উচ্চ সিংহাসনে অধিরোহণ কর।

আৰ্য্য ধৰ্ম্মের বিষম বিপদ্।

ধৰ্ম্মরাজ্যের ভিত্তি স্বর্গীয় সৌগন্ধযুক্ত উপদেয় উপাদানে আর্য্যগণই প্রথম সংস্থাপন করেন। প্রকৃতির নিভৃত কোষ হইতে অমূল্য রত্ন রাজি নিষ্কাশন করিয়া তাহার স্তরে স্তরে আর্য্য গণই সাজাইয়া দেন। সেই উজ্জ্বল কিরণ মালা হইতেই দিগ্ দিগন্তে ধৰ্ম্ম-প্রভা ক্রমশঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। তাঁহারা তপস্যা, স্বাধ্যায়, যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, উপাসনা, ব্রত, নিয়ম সংযম আদি দ্বারা ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জগৎকে তুলা দণ্ডের ন্যায় সমতুল করিয়া রাখিয়াছিলেন। ধৰ্ম্ম জীবের কাৰ্য্য দ্বারাই উন্নত ও মলিন দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধৰ্ম্ম অনন্ত স্বরূপের অনন্ত ভাণ্ডারের সূক্ষ্ম ভাবে নিত্য বিদ্যমান বস্তু। জীব নির্ম্মল প্রকৃতির নিয়মানুসারী হইলেই ধৰ্ম্ম ধরাধামে আসিয়া জীবগণের ইহপারলৌকিক সুখ-সম্পত্তি বৃদ্ধি করিতে থাকেন। যে সময়ে জাতীয়

প্রকৃতি সমবেত বল দ্বারা ঐশী শক্তির অক্ষয় কোষ হইতে অনুরাগ ও ভক্তির সহিত ব্রহ্মতেজকে প্রবল রূপে আকর্ষণ করিতে থাকে, সে সময়ে বাহ্য জগতেও সুখের শুভ চিহ্ন দৃষ্ট হয়। তৎকালে জীব মাত্রেই পরম সুখে কাল অতিবাহিত করিতে পারে। দুঃখ দুর্ভিক্ষ, পীড়া অকাল-মরণ প্রভৃতি যাতনা কাহাকেও ভোগ করিতে হয় না। পৃথিবী কোন কালেই একবারে ধর্ম্মশূন্য হয় নাই, হইবেও না। কোন সময়ে ধর্ম্ম ক্ষীণবল কখনও বা প্রবল বলিয়া লক্ষিত হয়। বিরল লোকে ধর্ম্ম সাধন করিলে ধর্ম্মকে ক্ষীণবল, এবং অধিকাংশ লোকে ধর্ম্ম-পরায়ণ থাকিলে পৃথিবীতে ধর্ম্ম প্রবল বলিয়া প্রতীত হয়। বস্তুতঃ স্বয়ং ধর্ম্ম কখনও ক্ষীণবল বা প্রবল হয়েন না। মনুষ্যগণ অধিক পরিমাণে বিষয়-সুখ-ভোগী ও বিলাসী হইলেই ধর্ম্মের যে কিরণ-মালা পূর্ব্বে প্রবল বেগে ইহ জগতে বর্ষিত হইতেছিল তাহা ধীরে ধীরে নিজ স্থানে সংহৃত হইয়া যায়। মনুষ্যগণই সুখ হইতে

বঞ্চিত হয়। বস্তুতঃ ধর্ম্মের কখনই হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। মনুষ্যের কর্ম্মদোষে যখন ধর্ম্ম ধরাধাম হইতে অপসৃত হইতে থাকেন, তখন যে অল্পসংখ্যক ধর্ম্মাত্মা পবিত্র স্থান-বিশেষে থাকিয়া যথাবিহিত তপস্যাদি করেন, তাঁহাদের অন্তঃকরণ অত্যন্ত নির্ব্বেদ-যুক্ত হয়। তাঁহাদের হৃদয় উৎসবান্তে পুরীর ন্যায় বিষণ্ণ হইয়া পড়ে। এই মাত্র তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিকের প্রকৃতি পবিত্র কণ্ঠে যে মধুর গান গাহিতেছিল, তাহা অকস্মাৎ স্তব্ধ হওয়ায় তাঁহারা চমকিয়া উঠেন। তাঁহারা চতুর্দ্দিকে যেন মরু-মরীচিকা দর্শনে ভীত হয়েন, প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাই তাঁহারা জগৎকে পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থাপিত করিবার জন্য যথোচিত যত্ন ও চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারেন না। যখন পৃথিবীতে নিতান্ত দুর্ব্বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন কেবল মাত্র তাঁহাদিগের যত্ন ও চেষ্টা রূপ বায়ু দ্বারা পৃথিবীর কদর্য্য কলুষ রূপ ধূলি রাশিকে অপসারিত করিতে না পারেন, যখন পৃথিবীর অভাব

আসিয়া তাঁহাদিগের পূর্ণ হৃদয়কে বিশুষ্ক করিতে থাকে; তখন তাঁহাদিগের প্রাণ মন কাঁদিয়া উঠে। তখন গলদশ্রুনয়নে নির্জ্জনে বসিয়া সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ ভগবানের শরণাপন্ন হয়েন। ভগবান্ সাধু দিগকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য এবং দুষ্কৃতি রাশি অপসারিত করিয়া ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনার্থে কখনও আংশিক শক্তির বিকাশে কখনও বা অপরিসীম শক্তি সহ অবতীর্ণ হইয়া উপাসক দিগের মনোরথ পরিপূর্ণ করেন। ধর্ম্ম-জগতের এই রূপ বিপ্লব ভারতবর্ষ বহু বার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আদি কল্পে বেদ যখন অন্তর্হিত হয়, বৈদিক ধর্ম্ম যখন বিপ্লুত হইয়া যায়, ভগবান্ স্বয়ং তখন অবতীর্ণ হইয়া বেদোদ্ধার করিয়াছিলেন। যখন অসুর দল বিষয়-বিলাসে উন্মত্ত হইয়া ধর্ম্মকে পদাঘাত, ভক্তগণকে নিপীড়িত ও বেদপথ রুদ্ধ করিয়াছিল, তখনও ভগবান্ সময়ে সময়ে নৃসিংহ, রাম কৃষ্ণাদি রূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন।

যখন স্বেচ্ছাচারী বেণ রাজা কদাচারে ভারতের মুখ মলিন করিয়া তুলিল, ভগবান্ তখনও ভারতের শান্তি বিধান করিলেন। যখন পুনর্ব্বার বেদাচার ও বৈদিক ক্রিয়া বিলুপ্ত হইতে লাগিল, তখন সরস্বতীতীরে বিশুদ্ধসত্ত্ব ব্রাহ্মণ গণ সরস্বতীর আরাধনা ও উৎকট তপস্যা দ্বারা বেদ পুনর্লাভ করিলেন ও বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইল। শাক্যসিংহের সময়ে যে ভয়ানক বৈদিক ধর্ম্মে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহাও ভগবৎ-কৃপায় সম্পূর্ণ রূপে নিরস্ত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে যে ধর্ম্মের বিপ্লব হয় তাহার পরেই প্রায় শুভ ফল দেখিতে পাওয়া যায়। জলপ্লাবনে দেশ ডুবিয়া যায় সত্য, কিন্তু সকল স্থানের পূতিগন্ধকর জলরাশি তাহার প্রবল প্রবাহে ভাসিয়া যায়। যখনই যে রূপ বিপ্লব হউক না কেন, পরিশেষে ভারতবর্ষে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মই মনুষ্যের মনে আধিপত্য করিতে পারে নাই। আর্য্য ধর্ম্ম যদি অসার, অমূলক ও সাধারণ লৌকিক

বুদ্ধিপ্রসূত হইত, তাহা হইলে ইহা দৃঢ়মূল ও কল্প-কল্পান্ত স্থায়ী হইয়া মনুষ্যের কামনা পূর্ণ করিতে পারিত না। আর্য্যধর্ম্মের মূল কিছুতেই উৎপাটিত হইবার নহে। উহা সপ্ত পাতাল ভেদ করিয়া রসস্বরূপের পূর্ণ সত্ত্বা হইতে রসাকর্ষণ করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান শতাব্দীও বিসম ধর্ম্ম-বিপ্লবের সময় বলিতে হইবে। এই অবকাশে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ হইতে সকল দেশের ভাষা, ভাব, রীতি, নীতি, ধর্ম্ম নিজ২ রত্নালঙ্কারে ভূসিত হইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। বালকের ন্যায় সেই কল্পান্তস্থায়ী বীরেন্দ্রকেশরী স্থবির সৌম্যমূর্ত্তি আর্য্য-ধর্ম্মকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উপহাস করিতেছে। অনন্তশক্তিমান্ আর্য্যধর্ম্ম তাহাদিগের দিকে ভ্রূক্ষেপও করিতেছেন না। যৌবন-মদ-মত্ত পাশ্চাত্য ভাষা ও ভাব-প্রিয় কতিপয় স্বেচ্ছাচারীকে নিজ নিজ শিষ্য করিয়া বিজাতীয় উপধর্ম্ম রাশি ভাবিতেছে, বুঝি ভারত তাহাদিগের পদানত হইল। কিন্তু যখনই প্রকৃত

ধর্ম্মাচরণের প্রবৃত্তি প্রবল হইবে, যখনই ভারতীয় হৃদয় ভগবৎপদ-লাভে ব্যাকুল হইবে, তখনই সনাতন আর্য্যধর্ম্মের ক্রোড়ে তাঁহারা স্বতএব আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। পক্ষিগণ পৃথিবী ছাড়িয়া যতই কেন আকাশে উড্ডীয়মান হউক না, যত দূর কেন ভ্রমণ করুক না, কিন্তু ক্ষুধা বা পিপাসায় কাতর হইলে পরিশেষে তাহাকে পৃথিবীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে।

পূর্ব্ব২ কালে ভারতে যেরূপ ধর্ম্ম-বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান বিপ্লবের প্রকৃতি তাহা হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। এক্ষণে সমস্ত উপধর্ম্মই আর্য্যধর্ম্মকে পরাভব করিবার জন্য সমর-ভূমিতে উপস্থিত। আর্য্যধর্ম্ম অগণিত আয়ুধ সত্ত্বে কাহারও প্রতি আঘাত করা আবশ্যক মনে করিতেছেন না। যাহার যত তীক্ষ্ণধার অস্ত্র আছে, ভূরি পরিমাণে নিক্ষেপ করিতেছে, কিন্তু আর্য্যধর্ম্মের অক্ষয় কবচে লাগিয়া সমস্তই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। দেখিতে পাওয়া যায়, এক্ষণে প্রায় সকল ধর্ম্মেরই

অস্ত্র শেষ হইয়া আসিয়াছে। কেবল বাহ্বাস্ফোটন, লম্ফ প্রলম্ফ, দন্ত দ্বারা অধর পীড়ন মাত্র অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। এক্ষণে সকলেই দেখিতেছে, "আর্য্য" এই নামে একটি অপূর্ব্ব উপাদেয় জাতীয় প্রকৃতি নিহিত রহিয়াছে। তাই সংগ্রাম-স্থলে সকলেই কপট আর্য্য বেশধারী হইয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক্ষণে যিনি সর্ব্বদা অনার্য্য আচারে প্রবৃত্ত অর্থাৎ মদ্যপান, বেশ্যাসেবন, উৎকোচগ্রহণ আদি যাঁহার নিত্য ব্রত, তিনিও বলেন " আমি আর্য্য ধর্ম্মী "। যিনি অভক্ষ্য ভোজন, ম্লেচ্ছান্ন—যবনান্ন ভোজনে আসক্ত, যজ্ঞোপবীত-পরিত্যাগী, সগুণ উপাসনার দ্বেষ্টা তিনিও বলেন "আমি আর্য্যধর্ম্মী"। কুক্কুট মাংস যাঁহার বড় প্রিয়, সাহেবী চাল যাঁহার একান্ত অনুকরণীয়, যিনি পূজা পাঠ ব্রত নিয়মাদি বর্জ্জিত, তিনিও বলেন " আমি আর্য্য ধর্ম্মী "। যিনি বলেন ঈশ্বর নাই, উপাসনা করা যাঁহার মতে বাতুলতা, ভক্তির সহিত উপাসনা

করিলে ঈশ্বর দয়া করেন না, ইহা যাঁহার বিশ্বাস, তিনিও বলেন " আমি আর্য্যধর্ম্মী "। এই রূপে আর্য্য-ধর্ম্মের পতাকা হস্তে লইয়া কত লোকে বক্তৃতা দ্বারা ব্যাখ্যান দ্বারা সংবাদ পত্রে ও সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া আর্য্যধর্ম্মের ঘোষণা করিতেছেন, যাঁহারা বাস্তবিক কখনও আর্য্যধর্ম্মের সেবা করেন না, আর্য্যশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, ব্রত সংযম-শীল সদ্ গুরুর নিকটে উপদেশ পান নাই, তাঁহাদের দ্বারা আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ায় বস্তুতঃ আর্য্য-ধর্ম্ম মর্ম্মাহত হইতেছেন। আজ কাল লোকে বক্তৃতা-শ্রবণ, সংবাদ পত্র ও নবীন লেখক গণের লেখনীপ্রসূত পুস্তক পাঠ দ্বারা ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে চান। দুর্গম শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া রত্নোদ্ধার করিতে কেহই অগ্রসর হন না। সুতরাং আজ কাল লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিশ্ব-বিদ্যা-লয়ের প্রসংশাপত্রধারী অথবা রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি নিজ লেখনীর দ্বারা ধর্ম্মকে যেরূপ চিত্রিত করিতেছেন,

"শিব গড়িতে বানর হইলে।" তাহাই প্রকৃত আর্য্য-ধর্ম্মের মর্ম্ম, ইহাই অনেকে বুঝিতে ও বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতেছেন। অমুক ব্যক্তি "এম এ বি এল্", উনি যাহা বুঝিয়াছেন, অবশ্য তাহা সত্য হইবে। অমুক ব্যক্তি "সি আই ই", উনি অমুক অমুক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, উনি শিক্ষাবিভাগে এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ, উনি যখন বলিতেছেন, ঈশ্বর উপাসনার কিছু মাত্র আবশ্যক নাই, কেবল পরোপকার সাধনই মনুষ্যের পরম ব্রত, অতএব ইহাঁর কথাই সত্য। অমুক ব্যক্তি একজন রাজকীয় বিচারকর্ত্তা, ইহাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলী-পাঠে বঙ্গভাষা নূতন জীবন লাভ করিয়াছে, উহাঁর গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত হই-তেছে, উনি যখন বলিতেছেন, "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই এক মাত্র অবতার, ও মৎস্য কূর্ম্মাদি ব্রাহ্মণ দিগের স্বকপোল কল্পিত রচনা মাত্র", তবে এই কথাই মানিবার যোগ্য। অমুক ব্যক্তি বঙ্গ-ভাষার একজন সুপরিচিত

লেখক, তিনি যখন একটি প্রকাণ্ড প্রবন্ধে লিখিলেন, যে শরৎকালে কচু, কলা ধন্য আদি কেমন নধর প্রফুল্ল হইয়া উঠে, তাই দুর্গোৎসবে প্রকৃতির উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ দশভুজা মূর্ত্তি বুদ্ধির কল্পনা মাত্র। তখন এ কথা অবহেলা করি কিরূপে? অমুক ব্যক্তি একজন ডেপুটি কলেক্টর, তিনি একটি সুদীর্ঘ ইংরাজি-প্রবন্ধে লিখিলেন, যে মহাভারতের যে পঞ্চ পাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহার ঐতিহাসিক ঘটনা বস্তুতঃ সর্ব্বৈব মিথ্যা। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চ ভূতই পঞ্চ পাণ্ডব। দ্রৌপদী ক্রিয়া-শক্তি ও শ্রীকৃষ্ণ আত্মারূপে বর্ণিত হইয়াছেন মাত্র। অতএব এ কথা কেমন করিয়া অবিশ্বাস করিব! এই রূপে সাধারণ হিন্দুসমাজ পরমুখাপেখী হইয়া প্রকৃত ধর্ম্ম-জ্ঞান-লাভে বঞ্চিত হইতেছেন। আর্য্যধর্ম্ম এই রূপে প্রচারিত হওয়ায় ইহার সত্যতা, সারবত্তা ও গৌরবের পরিবর্ত্তে গ্লানি বিঘোষিত হইতেছে। মহর্ষিগণের উচ্চ

উদার ধৰ্ম্মশাস্ত্রের অবমাননা করা হইতেছে। আর্য্য-শাস্ত্র পিতৃ মাতৃ হীন অনাথের ন্যায় যথেচ্ছ ব্যবহৃত হই-তেছে। এই দুঃসময়ে বাস্তবিক যদি সকলে কৃপা করিয়া নিজ নিজ পাণ্ডিত্যের অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর্য্যশাস্ত্র-সাগর-মন্থনে প্রবৃত্ত হয়েন ও তাহা হইতে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া জগতে প্রচার করিতে থাকেন, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের নিকট চির-কৃতজ্ঞ থাকিব।

আর্য্যধৰ্ম্ম কেবল বাক্যে বুঝিবার ধৰ্ম্ম নহে। আর্য্য-ধৰ্ম্মের গভীর তত্ত্ব কিছু জানিতে হইলেই তদনুকূল সাধন না করিলে কিছুই জানিতে পারা যায় না। শাস্ত্র অধ্যয়ন কালে বিশেষ বিশেষ ব্রত ও সংযম করা বিধি আছে। তাহা উল্লঙ্ঘন করিলে সে শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করা যায় না। তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন কালে মস্তিষ্কের যে যে অংশ স্ফুরণ করিবার জন্য যে যে ব্রতের আচরণ ও যে যে বৃত্তির সংযমন করা আবশ্যক, যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন

কালে তাহার সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যাপার করিতে হয়। এই সকল নিয়ম নিষেধ আজ কাল লক্ষ্য করা হয় না বলিয়াই ব্রহ্মতত্ত্বনিরূপক ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াও লোকে ঘোর কদাচারী হইয়া পড়ে। আজ কালকার রাজকীয় বিদ্যা-লয়ের ইংরাজি শিক্ষা-প্রণালীর ন্যায় শাস্ত্রশিক্ষা-প্রণালী বিধিবদ্ধ হয় নাই। যথোচিত ধারণা শক্তি ভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করা বিড়ম্বনা মাত্র। এরূপ শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্যভিচার ফল ভিন্ন কখনও সুফল প্রসব করে না। যাঁহারা ভারতে ধর্ম্ম প্রচার করিতে চাহেন, যাঁহারা বৈদিক ধর্ম্মের মুখোজ্জ্বল করিতে চাহেন, যাঁহারা আর্য্যধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানে আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিজ২ কল্পনাপ্রসূত লিপি-চাতুরীতে যেন ভারতকে আর অন্ধতামিস্রকূপে নিক্ষেপ না করেন, ইহাই বার২ প্রার্থনা। তাঁহারা সকলে কৃতবিদ্য, একটু অভিমান ত্যাগ এবং একটু পরিশ্রম স্বীকার করিলে তাঁহারা ভারতের নিতান্ত উপকারী বন্ধু বলিয়া

পূজিত হইবেন। আর্য্যসমাজ অনেক কষ্টে অনেক বিপদ্ উত্তীর্ণ হইয়া অগাধ সাগরে ভাসিতে২ কম্পিত-কলেবরে সিক্তপদে কূলের পিচ্ছিল ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়াছে। যেন কেহ আর ধাক্কা দিয়া আবার প্রবল স্রোতে ফেলিয়া না দেন।

এক্ষণে বন্ধু বেশধারী শত্রু ভারতে অনেক বিদ্যমান। আজ কাল সংবাদপত্রে যেমন পেটেণ্ট ঔষধের অনেক নকল হইয়া বিক্রীত হইতেছে, অথচ পীড়ার কোন উপশম হয় না বলিয়া ঔষধ-আবিষ্কর্ত্তা গণও নিন্দাভাজন হইয়া থাকেন ও পরে তাঁহারা জানিতে পারিলে যেমন বিজ্ঞাপন দ্বারা সকল লোককে সাবধান করিয়া দেন, আমরাও তাঁহাদেরই ন্যায় পবিত্র আর্য্যশাস্ত্রের ও ঋষি গণের মর্য্যাদা রক্ষানুরোধে উচ্চৈঃস্বরে সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছি—

সাবধান ! সাবধান !! সাবধান !!!

পুনর্মনঃ পুনরায়ুর্ম আগন্ পুনঃপ্রাণঃ পুনরাত্মা
ম আগন্ পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্রোত্রং ম আগন্।

আমাদের সেই মন (যাহা অন্তরাত্মার মননে ও বৈদিক
তত্ত্বাবধারণে পটু ছিল,) আমাদের সেই আয়ু, সেই
বুদ্ধি (যাহা কেবল আত্মাতেই স্থির থাকিত,) আমাদের
সেই চক্ষু, সেই কর্ণ আবার ফিরিয়া আসুক। যাহা
আমরা হারাইয়াছি, যাহা আমাদের বিনষ্ট হইয়া
গিয়াছে, তাহা আবার ফিরিয়া আসুক।

নিজস্ব।

ভারত! তুমি সমস্তই ভুলিলে! তোমার নিজ কর্ম্ম-
দোষে তুমি সমস্তই হারাইলে! স্বপ্নের ন্যায় কাল্পনিক
উন্নতি স্রোতে ভাসমান হইয়া প্রকৃত উন্নতি লাভে
বঞ্চিত হইলে। বিদেশীয় ভাষা, ভাব, ইঙ্গিত, বিদেশীয়

শিক্ষা, বিদেশীয় রীতি নীতি, বিদেশীয় প্রথা প্রণালীর মায়ায় মোহিত হইয়া তোমার নিজ প্রকৃতি-সুলভ উন্নতির উজ্জ্বল সোপান দর্শনে বঞ্চিত হইলে, তুমি আপনাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর উন্নত জীব মনে করিয়া বৃথা গৌরবে গর্ব্বিত হইয়াছ। আমরা তোমার এই উন্নতিকে বৈদেশিক অপরিস্ফুট জ্ঞান-সমুৎপন্ন অধোগতি বলিয়া স্বীকার করি। " ঊনবিংশ শতাব্দী " তোমার নহে। উহা উন্নতিকামী আধুনিক সভ্য খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের। রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে বৎসর গণনা করিলেও বর্ত্তমান কাল তোমার বিংশ শতাব্দী। বিংশ শতাব্দীর অধোগতির অতীব গভীর গর্ভে তুমি দিন ২ ডুবিতেছ। য়ুরোপ অসভ্যাবস্থা হইতে সভ্যাবস্থার দিকে বেগে দৌড়িতেছে। তাহার দেখাদেখি তুমি বেগে দৌড়িলে চলিবে না। তোমার অবস্থা য়ুরোপ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তুমি অতি উচ্চ পদ হইতে বিচ্যুত হইয়া এক্ষণে মলিন দশা গ্রস্ত হইয়াছ। তোমার সংস্কার মাত্র

আবশ্যক। য়ুরোপ নূতন পদ গঠন করিতেছে, নবীন উদ্যম ও প্রভূত প্রযত্নসত্ত্বেও যদি উহার পদ স্খলন হয়, তবে তাহাও মার্জ্জনীয়। কিন্তু তুমি আর্য্য মহাত্মাগণের নির্ম্মল পদচিহ্নিত পথ সত্ত্বেও যথেচ্ছার পন্থা অবলম্বন করিতেছ কেন? পথ দেখাইয়া দিলেও যে সে পথে না চলে ও পথে বিপন্ন হয়, তাহার দোষ মার্জ্জনীয় নহে এবং সে লোকের করুণা লাভে বঞ্চিত হয়। তুমি আপনার শরীর, আপনার প্রকৃতি, আপনার অবস্থার দিকে না তাকাইয়া পরের পশ্চাতে ধাবিত ও ক্রমশঃ বিপদ্গ্রস্ত হইয়া পড়িতেছ। তুমি একে একে আপনার অঙ্গ হইতে বহুমূল্য হীরক-কাঞ্চন-জড়িত অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া ফেলিতেছ। বোধ হয় কিছু দিন মধ্যে তোমার নিজ শরীরটি পর্য্যন্ত বিদেশীয় ধাতুতে গঠিত করিয়া লইবে, তোমার স্বতন্ত্রতা ও পবিত্রতা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইবে। অতএব ভারত! ঊর্দ্ধমুখে ধাবমান হইও না! পশ্চাৎ দিকে তাকাইয়া দেখ, বিধাতার প্রদত্ত

কত মহার্ঘরত্ন-রাশি ফেলিয়া আসিলে। তোমার দোষে তোমার অলঙ্কার মলিন হইয়াছে। মলিনতার উপর ঘৃণা করিয়া সম্মুখের রশ্মিকিরণদীপ্ত দিব্যকান্তি কাঁচ কঙ্কনের জন্য বহুমূল্য কাঞ্চন পরিত্যাগ করিও না। ধীর ভাবে সমস্ত মালিন্যের অপনয়ন কর, কণককান্তি-ভাতি দর্শনে তোমার মন পুনঃ প্রফুল্ল হইবে।

য়ুরোপীয় উপাদানে আপনার অঙ্গ পরিষ্কার করি৹ না। একটি মালিন্য দূর করিতে গিয়া আর একটি কদর্য্য দুর্গন্ধ লাগিয়া যাইবে। আপনার গৃহ অন্বেষণ করিয়া দেখ, একাকী না পার, বৃদ্ধ মহাত্মাদিগের মন্ত্রণা গ্রহণ করিয়া দেখ, তোমার পুরাতন কোষে স্তরে স্তরে কত উপাদেয় সামগ্রীরাশি সজ্জিত রহিয়াছে। সেই শাস্ত্র পুঞ্জ উন্মোচন করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে তুমি যাহা চাও তাহা কেমন পরিপাটী রূপে রক্ষিত রহিয়াছে। যদি তাহাতেও তত্ত্বাবাতের পরিচয় বুঝিতে না পার, তবে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ঈশ্বরের শরণাগত হও! সেই বেদবিধাতা

তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন। তোমার নিগূঢ়তর শক্তি-সাধনে সহায়তা করিবেন, স্বহস্তে তোমার অভাব মোচন করিয়া দিবেন। তুমি আপনাকে নিতান্ত তুচ্ছ মনে করিও না। তুমি চেষ্টাপরায়ণ হইলে ভগবৎ-কৃপায় আপনাকে অসামান্য অদ্বিতীয় করিয়া তুলিতে পার। নিজ নিজ সাধন-শক্তি ও তপঃ-প্রভাবে ধ্যানস্তিমিত-নেত্র দেবপ্রতিম আর্য্যঋষিগণ মনুষ্য-মঞ্চের শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। তুমি ধীর জিজ্ঞাসু তত্ত্বজ্ঞান-নিপুণ হও, তোমার মলিন দশা ঘুচিয়া যাইবে। তোমার বৃথা সভ্যতার গর্ব্ব পরিহার করিয়া আর্য্য শাস্ত্রীয় শাসনের অনুগত হও, তোমার দুঃখ বিদূরিত হইবে। তুমি আপনার সামগ্রীকে আপনার বলিতে শিক্ষা কর, তোমার সুখ-সূর্য্যের শীঘ্র উদয় হইবে। তুমি আপনার ভাবে আপনি নিমগ্ন হও, তোমার হৃদয়ে আনন্দ-স্রোত প্রবল উচ্ছ্বাসে প্রবাহিত হইবে। ভারত! তুমি আপনাকে বিস্মৃত হইও না।

তুমি নিজ দোষে আপনার গৃহদ্বার আপনি অবরুদ্ধ করিয়া ঘোর অন্ধকারে আপনাকে আপনি চিনিতে পারিতেছ না। যত্ন ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ হও, সমস্ত অন্ধকার কাটিয়া যাইবে। আত্ম-দৃষ্টি রহিত হইয়া তুমি অন্যের রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়াছ, তাই আজ আর্য্যরীতি নীতি বিসর্জ্জন দিয়া আর্য্য সমাজকে অনার্য্য-সমাজ প্রস্তুত করিতে এত চেষ্টা করিতেছ। ভাগ্যদোষে তোমার এই দুর্ব্বুদ্ধি না ঘটিলে কি আজ গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন,* জাতকর্ম্ম, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ, উপনয়ন প্রভৃতি আর্য্য সংস্কার গুলি মানসিক ও শারীরিক বিশেষ কল্যাণের উপযোগী বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতে ? এই ক্ষুদ্র ২ সংস্কার গুলি ত দূরের কথা, এসকল গুলির প্রতি বিশেষ কটাক্ষ না করিয়া বিবাহ-সংস্কারের প্রতি আমরা কিঞ্চিৎ হস্তক্ষেপ করিব। কেননা এই গুরুতর সংস্কারটি সংসার-প্রবাহের মূল ভিত্তি, গার্হস্থ্য-আশ্রম ধর্ম্মের প্রশস্ত

পথ, বহুল ধর্ম্ম-সাধনের অনুকূল উপায়, ও সামাজিক শৃঙ্খলার প্রধান উপাদান।

যে সমাজে ধর্ম্মের অল্প বা অধিক যেমনই আদর থাকুক না কেন, ধর্ম্ম ভাবেই হউক বা সামাজিক বন্ধন বা শৃঙ্খলার দিকে তাকাইয়াই হউক, বিবাহ যে একটী প্রধান সংস্কার, তাহা সকলেই সর্ব্বত্র সমান আদরে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আর্য্যগণ এই সংস্কার-বিধির যেরূপ গুরুত্ব অনুধাবন করিয়াছিলেন, ইহার আদ্যোপান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তা ও আলোচনা করিয়াছিলেন, বোধ হয় এ পর্য্যন্ত কোন জাতিই তাদৃশ চিন্তা করিতে অগ্রসর হয়েন নাই। পুরুষ ও স্ত্রী বিভিন্ন গুণ-ধর্ম্মাক্রান্ত হইলে যে উত্তম বিবাহ হয়, গোত্রের স্বীকারে তাহা অনেক জাতি অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আর্য্য জাতি কেবল মাত্র গোত্র-বিচারের আবশ্যকতা দেখিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। তাঁহাদের উন্নত চিত্তের গম্ভীর গবেষণা এই খানেই

পরিশ্রান্ত হইয়াছে, এমন নহে, তাঁহারা মানবের মনস্তত্ত্ব ও শারীর প্রকৃতি মাত্র পর্য্যালোচনা করিয়াই তৃপ্ত হয়েন নাই। তাঁহারা মনুষ্যের আত্মগত প্রকৃতি পর্য্যন্ত দৃষ্টি করা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে পুমাত্মার প্রকৃতি ও স্ত্রী আত্মার প্রকৃতি নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ-বিধি নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। পিতৃ মাতৃ-সহযোগে সন্তান উৎপন্ন হয়, প্রজাপতির এই বিশাল রাজ্যের শ্রীসৌন্দর্য্য এই সন্তান গণেরই উত্তমাধমতার উপর নির্ভর করে, এই জন্য জগদীশ্বরের রাজ্যে পিতা মাতার স্কন্ধে অতীব গুরুতর কার্য্যভার ন্যস্ত রহিয়াছে বলিতে হইবে। আবার স্নেহভাজন সন্তান গণের সুখ স্বচ্ছন্দতারও মূল সূত্র প্রচুর পরিমাণে পিতা মাতার হস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে। দুর্ব্বলতা বা সবলতা, সচ্চরিত্রতা ও অসচ্চরিত্রতা, সাধু ও অসাধু প্রবৃত্তি আদি মনুষ্যত্বের অনেকগুলি উপাদান পিতা মাতার আত্মগত প্রকৃতিতে নিহিত আছে। পিতা মাতা বলিলে আমাদিগের যাহা

উপলব্ধি হয় তাহারই সূক্ষ্ম ভাবে আলোচনা করিবার জন্য আমরা স্থানে স্থানে পুমাত্মা ও স্ত্রী-আত্মা বলিয়া উল্লেখ করিব।

পুমাত্মা ও স্ত্রী আত্মার সহযোগে একটী তৃতীয় পুরুষ কিম্বা স্ত্রী আত্মার উদ্ভূতি হয়। ঈদৃশোদ্ভূতির কারণ দ্বিবিধ। আমাদের শরীরের মধ্যে আত্মা বিরাজ করিতেছেন সত্য কিন্তু তদ্ভিন্ন আমাদের ঊর্দ্ধ ও নিম্নভাগে পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাগে অগণ্য আত্মা বিরাজ করিয়া থাকেন। আমাদের চর্ম্মচক্ষু কেবল স্থূল শরীরে ভিন্ন সূক্ষ্ম বা কারণ-শরীরে আত্মার লক্ষ্য করিতে পারে না। আমরা দেখিতে অথবা অনুভব করিতে পারি বা না পারি, অনন্ত আকাশ মণ্ডলে লক্ষ লক্ষ সূক্ষ্ম শরীরধারী আত্মা যে বিচরণ করিতেছেন তাহার সন্দেহ নাই। ঈদৃশ বিচরণশীল আত্মা নিজ কর্ম্ম বা প্রকৃতি অনুসারে যে পুরুষে নিজ সাজাত্য দর্শন করিবে, নিজ ভোগোপযোগী দেহ ধারণার্থ তাহাতেই প্রবিষ্ট

হইবে এবং স্ত্রী-সংযোগ দ্বারা ভূমিষ্ঠ হইলে আত্মার উৎপত্তি হয় এবং পুরুষের আত্মা স্বতঃ ও স্ত্রী সংযোগে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। এই দ্বিবিধ উৎপত্তি প্রকরণের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার উৎপত্তি-ক্রম হৃদয়ঙ্গম হইলেই প্রথমটী সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। এই জন্য দ্বিতীয়টীর আলোচনাতেই প্রবৃত্ত হইব। পুমাত্মা ও স্ত্রী আত্মা গুণ বা শক্তি সমূহ হইতে সমুদ্ভূত তেজোদ্বয়ের (পুরুষের বীর্য্য ও স্ত্রীর রজঃ) রাসায়নিক সংযোগে তৃতীয় পুরুষ বা স্ত্রী আত্মার উৎপত্তি হইয়া থাকে। আত্মার প্রধানতঃ চারিটী শক্তি বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়—যথা আকর্ষণ, অপকর্ষণ, সংযমন ও তনুপ (তনুপ এই শক্তির সহিত ইংরাজী Magnetic force নাম্নী শক্তির সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে)। সংযমন, আকর্ষণ ও অপকর্ষণ এই তিন শক্তিকে দার্শনিক ভাষায় সত্ত্ব, রজঃ ও তম বলিয়া কথিত হয়। আকর্ষণ ও অপকর্ষণ-শক্তি

আবার ভাবিকা ও ব্যঞ্জিকা—প্রাণন ও অপানন শক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আত্মাকে যে মন, চিত্ত, অভিমান, মহত্তত্ত্ব আদি ঊনবিংশতি অথবা মতভেদে সপ্ত বিংশতি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, সে সমস্ত আত্মার প্রথমোক্ত চারিটী শক্তির ক্রিয়া মাত্র। আত্মার (স্থূলভাবে বলিতে গেলে এমন কি যদি একটী বিভিন্ন শক্তি না বলা যায় তবে মনের) কার্য্য ক্রমে আমাদের শরীর গঠিত হয়। আত্মার শক্তির ক্রিয়া-ক্রম জানিতে হইলে স্থির-চিত্তে একটু গম্ভীর চিন্তা আবশ্যক। ক্রিয়ার একটী ক্ষুদ্রতম অংশের নাম "একটী সম্বেগ" বলিয়া কল্পনা করুন। একটী ক্রিয়ার যত সম্বেগ হইবে, ধারা বাহিক রূপে তত্তাবতের অনুমান করিতে পারিলে উক্ত ক্রিয়ার দীর্ঘতা অনুমান হইবে। আমাদের প্রবৃত্তির প্রাবল্য এইরূপে ক্রিয়া সূত্রের দৈর্ঘ্য দ্বারা পরিমিত হইয়া থাকে। এক্ষণে সন্তানোৎপাদনের হেতু পুমাত্মা

ও স্ত্রী আত্মার শক্তি সমূহের কিরূপে রাসায়নিক সংযোগ হয়, তাহা উপলব্ধি করা সহজ হইয়া আসিল। আমার শরীরে যদি কেহ ধূলি নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে ধূলি গুলি শরীরে সংলগ্ন থাকিল না অল্পে অল্পে পতিত হইল, যে কতক গুলি তাহাতে সংলগ্ন রহিল বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাও ধীরে২ দেহ চ্যুত হইবে। ঈদৃশ সংযোগভাবকে রাসায়নিক সংযোগ বলা যায় না। দুইটী বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থ পরস্পর বিরোধে যখন একটী অপরটীকে এরূপ অভিভূত করিয়া ফেলে যে সেটী অপরটীকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হয় এবং উভয়েরই নিজ নিজ পার্থক্য বা স্বতন্ত্রতা দৃষ্ট হয় না, তখনই পদার্থ দ্বয়ের রাসায়নিক সংযোগ হইয়াছে বলিতে পারা যায়। বস্তুতঃ দুটী বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তুর মধ্যে একটী অধিকতর বলবান্ না হইলে রাসায়নিক সংযোগ হওয়া অসম্ভব। বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত দ্বয়

বলিয়াই হউক অথবা বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত হইলেও শরীর হইতে অল্লাধিক বলাক্রান্ত নয় বলিয়াই হউক, নিক্ষিপ্ত ধূলি রাশি আমার শরীরে রাসায়নিক সংযোগে মিলিত হইল না। পুমাত্মার শক্তি রাশি প্রোক্ত রাসায়নিক ক্রম অনুসারে স্ত্রী আত্মার শক্তি রাশির সহিত সম্মিলিত হইয়া তৃতীয় পুরুষ বা স্ত্রী আত্মার উৎপাদন করিয়া থাকে।

পুমাত্মার সহিত সহিত স্ত্রী-আত্মার কি রূপে ক্রিয়া-সংযোগ হইয়া থাকে তাহাই এক্ষণে চিন্তনীয়। তড়িৎ শক্তি যেমন যোজক ও বিয়োজক (Positive and Negative) এই দুই অংশে বিভক্ত, আত্মস্থ তন্মুপ শক্তিও তাদৃশ। তন্মুপের শক্তি দ্বয় পরস্পর বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত। রতিক্রিয়া কালে পুরুষের আত্মস্থিত তন্মুপ শক্তির বিয়োজক অংশ টুকু স্ত্রী আত্মস্থিত তন্মুপ শক্তির যোজক অংশের সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। আকাশীয় তড়িৎ ও পার্থিব তড়িতের সংযোগ কালে যেমন উভয় তড়িৎ

যথাসামর্থ্য বর্দ্ধিত হইয়া পরস্পর ঘন সন্নিবিষ্ট হয়, তদ্রূপ পুংতন্তুপ ও স্ত্রী তন্তুপ চরম সীমায় বর্দ্ধিত হইয়া ঘনিষ্ঠ সন্নিধানে সম্মিলিত হয়। স্ত্রীর গর্ভে রেণুবৎ এক প্রকার পদার্থ আছে। পুরুষ হইতে নিঃসৃত তেজঃ সেই রেণু-রাশির সহিত মিশ্রিত হয়। এই তেজ কেবল তন্তুপ নহে এবং উহা যে কেবল রেণুর সহিত মিশ্রিত হয় তাহাও নহে। বিবিধ পুংশক্তি সম্মিলিত তন্তুপই এই তেজ এবং উহা বিবিধ স্ত্রীশক্তি-সম্মিলিত তন্তুপের সহিত গিয়া মিশ্রিত হয়। এরূপ সম্মিলন যদিও এক প্রকার রাসায়নিক সংযোগ বটে, কিন্তু ইহা সাধারণ রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। সাধারণ রাসায়নিক সংযোগ-কালে মূল পদার্থ কয়টির আদৌ স্বাতন্ত্র্য থাকেনা। কিন্তু স্ত্রী ও পুমাত্মার শক্তি সম্বন্ধীয় রাসায়নিক সংযোগ কালে বিভিন্ন পদার্থের সমাবেশ হইলেও মূল পদার্থ গুলির স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হয় না। আকর্ষণ ও অপকর্ষণ, অথবা ভাবিকা ও ব্যক্তিকার

সহযোগে স্ত্রী-তন্মুপ ও পুং-তন্মুপের সংযোগে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, উহা একটি পৃথক্ পদার্থ বটে কিন্তু তাহাতে ভাবিকা ও ব্যঞ্জিকা—স্ত্রী-তন্মুপ ও পুং-তন্মুপের স্বতন্ত্র্য থাকিয়া যায়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে রাসায়নিক সংযোগে যে দুইটি পদার্থের সংঘাত হইবে, তাহার মধ্যে একটি অপরটিকে পরাজিত বা অভিভূত করিবেই করিবে। তাহা না করিতে পারিলে উহা রাসায়নিক সংযোগ বলিয়া উক্ত হয় না। মনুষ্যের সন্তান উৎপন্ন হইলে কোন সন্তানে পুরুষের বীর্য্য ও কোন সন্তানে স্ত্রীর রজঃ অধিক বলবান্ বলিয়া দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ পুত্র সন্তান উৎপাদনে পুরুষের তেজঃ এবং কন্যা সন্তান উৎপাদনে স্ত্রীর রজঃ অধিক বলবান্ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষ ও স্ত্রী যদি উভয়েই সত্ত্বগুণাক্রান্ত হয়েন ও উভয়েই যদি একজাতি হয়েন, তবে তাঁহাদের পরস্পর-সহযোগে উৎপন্ন পুত্র সামান্যতঃ পিতার ও কন্যা মাতার সৌসাদৃশ্য

প্রাপ্ত হয় এবং পুত্র কন্যা উভয়েই সত্ত্বগুণাক্রান্ত হইয়া থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ একজাতীয় হইলে সন্তান গুণবান্ হইবে বটে, কিন্তু দম্পতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিলে তদ্রূপ হইবার আশা নাই। এই জন্য পিতার উপরিস্থ সপ্ত পুরুষ সম্পর্কীয় কন্যাকে এবং মাতার উপরিস্থ পঞ্চ পুরুষ সম্পর্কীয় কন্যাকে বিবাহ করিতে নাই। পিতার উপরিস্থ অষ্টম পুরুষ এবং মাতার উপরিস্থ ষষ্ঠ পুরুষ সম্পর্কীয়া কন্যাতে যে সম্বন্ধ আছে তাহা অতি সামান্য এবং সে সম্বন্ধ সত্ত্বে বিবাহ করিলেও বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই আর্য্যশাস্ত্রকারেরা এই রূপ স্থলে বিবাহ নিষেধ করেন নাই। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের প্রকৃতি যদি সমান ধর্ম্মাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের পরস্পর আসক্তিতে সুন্দর রূপ রাগাত্মনিক সংযোগ হয় না। এই জন্য স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। পরস্পরের প্রকৃতি যদি একটু ভিন্ন হয়, তাহা হইলে সেই স্ত্রী পুরুষের সহযোগ-জাত পুত্র যথাবৎ সৌষ্ঠব-সম্পন্ন

হইবে। এইরূপ স্থলে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের প্রকৃতির ভেদ থাকা প্রযুক্ত পরস্পরের প্রতিদ্বন্দিনী শক্তি পরস্পরের প্রকৃতি হইতে বল সঞ্চয় করিবে এবং পরিপুষ্ট তৃতীয় প্রকৃতি (সন্তান) সমুৎপন্ন হইবে।

প্রথমতঃ সবর্ণ-বিবাহের বহুল প্রশংসা করিয়া পুনর্ব্বার বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত স্ত্রী পুরুষ সমাগমে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহা সমধর্ম্মাক্রান্ত দম্পতির সন্তান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে, এরূপ কথিত হওয়ায় সহসা এই সংশয় উঠিতে পারে যে এতদনুসারে, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীতে বিবাহ অপেক্ষা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াতে বিবাহ অর্থাৎ অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ পরম প্রশংসনীয়। বুদ্ধিমান্ গণ নিরর্থক সংশয়ারূঢ় হইয়া বিচলিত হইবেন না। কেননা ব্রাহ্মণের সত্ত্ব গুণাধিক্য ও ক্ষত্রিয়ের রজোগুণাতিশয্য ইহা চিরপ্রসিদ্ধ ও শাস্ত্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী-গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইলে সন্তান বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাক্রান্ত হইবে এবং

ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্ষত্রিয়াতে সন্তান উৎপন্ন হইলে সন্তান রজোগুণ-মিশ্রিত সত্ত্বগুণাক্রান্ত হইবে, এই জন্য সবর্ণ-বিবাহ অনুলোম অসবর্ণ বিবাহাপেক্ষা অধিক প্রশংসনীয় ও উৎকৃষ্ট ফলপ্রসূ। ইত্যবসরে এরূপ সংশয় হওয়াও আশ্চর্য্য নহে যে ব্রাহ্মণের সত্ত্বগুণ অধিক পরিমাণে থাকিলে ক্ষত্রিয়ার রজোগুণকে নিজ বলে অভিভূত করিয়া সন্তানকে সত্ত্বগুণাক্রান্ত করিতে পারিবে না কেন? বিচারবান্ পুরুষ এই ব্যর্থ বিতর্ক-জাল ছেদ করিতেও সঙ্কুচিত নহেন। গুণ সকল মনুষ্যের প্রকৃতিনিহিত। যত দিন পর্য্যন্ত ক্রিয়া, আচার, ব্যবহার, ব্রত বিশেষাদির দ্বারা প্রকৃতির পরি-বর্ত্তন না হয়, তত দিন সত্ত্ব, রজ, বা তমোগুণ পরস্পর নিতান্ত নিকটে থাকিলেও পরস্পরকে অভিভূত করিতে পারে না। সুতরাং ব্রাহ্মণের বীর্য্যস্থ সত্ত্বগুণ রজোগুণাক্রান্ত ক্ষত্রিয়ার শোণিত-প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করিতে অসমর্থ। একটী গুণের দ্বারা আর একটি গুণ-

বিনষ্ট হয় না, কিন্তু একটা গুণ জনিত ক্রিয়াচরণ দ্বারা অপর একটা গুণ ক্ষীণ ও পরিবর্জিত হইয়া যায়। একটী গুণের আশ্রয় পদার্থ যদি অপর গুণের আশ্রয়-ভূমিকে বিঘাতন করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উৎপন্ন সন্তান সবর্ণ বিবাহজাত সন্তান অপেক্ষা নিন্দনীয় হইত না। অনুলোম অসবর্ণ-বিবাহ শাস্ত্র নিষিদ্ধ নহে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাকে এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যাকে শাস্ত্র-বিধি অনুসারে বিবাহ করিতেন। শূদ্র কন্যাকে কামতঃ বিবাহ করিলে দ্বিজ-গণ পতিত হইতেন। দ্বিজ গণের মধ্যে সবর্ণ এবং অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা উৎপন্ন ছয় প্রকার সন্তান (ব্রাহ্মণ, অম্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয়, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, বৈশ্য, পারশব) যথাযথ মর্য্যাদাক্রমে দ্বিজ বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছেন। অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ বা নিন্দিত নহে কিন্তু সবর্ণ-বিবাহ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিতে হইবে। এই জন্য বর্ত্ত-মান যুগে দ্বিজাতি গণের তেজ হানির সঙ্গে সঙ্গে এই

প্রথা অপ্রচলিত হইয়াছে। বিলোম অসবর্ণ বিবাহ (অর্থাৎ যে অসবর্ণ বিবাহে পুরুষ নিম্ন শ্রেণীস্থ এবং স্ত্রী উচ্চ শ্রেণীস্থ) শাস্ত্রে নিতান্তই নিষিদ্ধ। শাস্ত্রকারেরা বলেন, বিলোম অসবর্ণ বিবাহোৎপন্ন সন্তান চণ্ডালাদি হইয়া থাকে। অত্যন্ত কুপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করাই চণ্ডাল্ শব্দের উদ্দেশ্য। নিম্ন শ্রেণীর প্রবল পুং-শক্তি উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রী-শক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া অতি কদর্য্য সন্তান উৎপাদন করে। যে কারণ বশতঃ অনুলোম বিবাহে সবর্ণ বিবাহ হইতে উৎপন্ন সন্তান অপেক্ষা নিকৃষ্ট সন্তানের উৎপত্তি হয়, বিলোম বিবাহেও তাদৃশ কারণ বশতঃ অতি নীচ-প্রকৃতি চণ্ডালের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পুং-প্রকৃতি স্ত্রী প্রকৃতির উপর প্রবল আধিপত্য করিয়া থাকে ইহা স্বতঃসিদ্ধ, অগত্যা বিলোম বিবাহে নীচ প্রকৃতিরই প্রাধান্য বৃদ্ধি হয় এবং সেই কারণ বশতঃ বিলোম অসবর্ণ বিবাহ হইতে উৎপন্ন সন্তানও নীচ

প্রকৃতির হইয়া থাকে। সিদ্ধান্ত স্থলে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, যে সবর্ণ-বিবাহই ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতির মূল ভিত্তি। অনুলোম অসবর্ণ-বিবাহ যথোচিত প্রশংসনীয় নহে। বিলোম অসবর্ণ-বিবাহ নিতান্ত নীচ, নিন্দিত ও ঘৃণিত আবর্জ্জনা রাশি সমাজে আনয়ন করিয়া সমাজকে নিতান্ত কলুষিত করিয়া দেয়।

শিক্ষিত ভারত বাসিগণ! চিন্তাশীল দেশ হিতৈষিগণ! বিচারশীল কুশলাকাঙ্ক্ষি গণ! একবার বিদেশীয় ভাষা শিক্ষার অভিমান পরিত্যাগ করিয়া উপযুক্ত আর্য্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ববীজ-ভূমিতে কিঞ্চিৎ প্রণিধান করুন। তপঃসাধন-শীল নির্ম্মলচেতা ব্রাহ্মণ গণ স্বার্থসিদ্ধির কুৎসিত অভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া জাতিভেদের প্রথা প্রচলন করেন নাই, অনর্থক অসবর্ণ-বিবাহের নিন্দা করেন নাই। যাহাতে সমাজের পরম মঙ্গল হয়, যাহাতে সমাজ কুৎসিত ও কুচরিত্র

লোকে পরিপূর্ণ না হয়, সেই জন্যই তাঁহারা সবর্ণ-বিবাহের প্রশংসা ও অসবর্ণ বিবাহের নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সাধন-গুণে, আচার ব্যবহার-গুণে জ্ঞানী ও মুক্তকাম ছিলেন। শাস্ত্রের কোন বিধি প্রণয়ন কালেই তাঁহাদিগের বুদ্ধি কদর্য্য অভিপ্রায়ের দ্বারা প্রণোদিত হইত না। যাঁহারা আপনার সুখ, সংসারের ভোগ-সুখ তুচ্ছ করিতেন, যাঁহারা বৈরাগ্যাবলম্বন পূর্ব্বক সংসারে জলাঞ্জলি দিতেন, তাঁহারা কি নিজ নিজ পুত্র পৌত্রাদির সুখের জন্য শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাকালে পক্ষপাতিতা অবলম্বন করিয়াছিলেন? ইহা স্বপ্নেও স্মরণ করিলে পাপ হয়। আজ কাল ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের মধ্যে ভূরি ভূরি অসচ্চরিত্র ও নিন্দিত প্রকৃতির লোক দৃষ্ট হয়, তজ্জন্য মনু আদি শাস্ত্রকর্ত্তা মহাত্মাদিগের মতকে ভ্রান্তিপূর্ণ ও অসঙ্গত বলিও না। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ গণ যে পবিত্র রীতিতে জীবন যাপন করিতেন, এক্ষণে আর তাহা

দৃষ্ট হয় না। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদিগের যেরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধা ছিল, আচারের প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ছিল, গুরুবাক্যের প্রতি যেরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের প্রতি যেরূপ আস্থা ও আগ্রহ ছিল, আজকাল আর সেরূপ কিছুই নাই। সুতরাং বর্ত্তমান উচ্চ বর্ণ গণের ঈদৃশ হীন চরিত্র হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যে বর্ণের যেরূপ আচার ব্যবহার, তদনুরূপ অনুষ্ঠিত না হইলে সে বর্ণ নিশ্চয়ই অপকৃষ্ট প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে। তজ্জন্য 'সদ্বিধিবক্তা শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ ভ্রান্ত বা স্বার্থপর বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারেন না। আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে এবং নিজ নিজ কার্য্য ফলে আর্য্য-জাতি-সুলভ ধৈর্য্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছি, বিষয়-বিশেষের সম্যক্ চিন্তা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি, সেই জন্য অপরিণাম-দর্শীর ন্যায় আশু-সুখকর যাহা কিছু দেখি, তাহারই পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে পারি না, এক্ষণে আমরা

বিবাহের আদান প্রদান কালে কন্যা ও বরের কুল, শীল, আচার, বিনয়াদির প্রতি দৃষ্টিপাত করি না। কন্যার রূপ ও বরের অর্থবল দেখিয়াই সন্তুষ্ট হই। লক্ষণ দ্বারা তাহাদের শরীরগত, মনোগত, এবং প্রকৃতিনিহিত শক্তির বৈষম্য আছে কি না তাহা বিচার করিতে পারি না। এই অবিবেকতাই অনেক বিবাহের বিষময় ফল উৎপাদন করে। অনেক স্থলে আমরা মূঢ়ের ন্যায় নীচপ্রকৃতির আদর ও উচ্চ প্রকৃতির অনাদর করিয়া প্রলয়-পাপ-ভাগী হইয়া থাকি। এই মহাপাপের ফলেই আমাদের পবিত্র আর্য্যসমা[illegible] এক্ষণে বিষম বিশৃঙ্খল। এই বিশৃঙ্খলতা বিদূরিত [illegible] হইলে উহা পরিহার করিবার উপায় সকল শিক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের সমাজের কল্যাণ নাই। যাহাতে পবিত্র প্রকৃতির সমাদর ভারতে বৃদ্ধি হয় তাহারই যত্ন করা সকলের কর্ত্তব্য। অসবর্ণবিবা[illegible] পবিত্র প্রকৃতি রূপ কল্পতরুর বিষম কাল কীট স্বরূপ

শুদ্ধসত্ত্ব ভগবান্ আর্য্যসমাজের পবিত্র প্রকৃতি রক্ষা করুন।

ধর্ম্মকর্ম্মে বিষম বিভ্রাট।

স্বেচ্ছাচার যাহাদের ধর্ম্ম, তাহাদিগের ধর্ম্মহানি হইবার আশঙ্কাও অতি অল্প। যাঁহারা ধর্ম্মতত্ত্বের নিগূঢ় চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন যে বিষয়াসক্ত চিত্তের স্বাধীন চিন্তার ফল ধর্ম্ম নহে। ব্রহ্ম-নিষ্ঠ পুরুষ ব্যতীত কেহই ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে বা নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়েন না। বহু গবেষণা, সুগভীর চিন্তা ও ভগবদারাধনার সাহায্যে আর্য্য ঋষিগণ আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। সিদ্ধ মহাত্মাগণের নিরূপিত নিয়ম নিষেধ রাশির মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিলে আর্য্যজাতির ধর্ম্ম সাধন হয় না। তত্ত্ববেত্তাদিগের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করা ধর্ম্মার্থীদিগের পক্ষে মহাপাপ। আর্য্য

জাতির অস্থি মজ্জাতে এই সুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তু মিহার্হসি॥
ভঃ গীতা ১৬শ অঃ।

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচার-ধর্ম্মের সাধন করে, সে ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, ইহলোকে সুখ বা পরলোকে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয় না। অতএব শাস্ত্র প্রমাণানুরূপ কার্য্যাকার্য্য বিদিত হইয়া শাস্ত্র বিধানোক্ত কর্ম্মেরই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।

আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এই ত্রিকাণ্ডে বিভক্ত। শাস্ত্রবিহিত বিধানে সুচারু রূপে কর্ম্ম রাশি অনুষ্ঠিত হইলে মনুষ্য প্রকৃত উপাসনার অধিকারী হয়। উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও আত্মানাত্ম-

বিচার বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিকাশ হইলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। এই জ্ঞানই মুক্তিফল-প্রদাতা ও পরমানন্দের বিধাতা। যেমন ত্রিতল গৃহের নিম্নতম প্রথমতল ভগ্ন হইয়া গেলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত তিন কাণ্ডের প্রথম কাণ্ডটী (কর্ম্ম) বিহিত রূপে অনুষ্ঠিত না হইলে শত চেষ্টা ও যত্ন করিলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাণ্ডের সাধনাধিকার কাহারও জন্মিতে পারে না। আমরা যে কাণ্ডেরই অনুষ্ঠান করিনা কেন, শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া তত্তৎ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ নহি। উপাসনা ও জ্ঞানকাণ্ড সবলাধিকারীর জন্য, তাহা লইয়া অদ্য আলোচনা করিব না। দুর্ব্বলাধিকারীর নিতান্ত অনুষ্ঠেয় কর্ম্মকাণ্ডের কথাই এ প্রস্তাবের আলোচ্য। কর্ম্মকাণ্ডের প্রকারভেদ, প্রকরণ, ক্রম প্রভৃতি লইয়া আন্দোলন করা আজ আমাদের মন্তব্য নহে। এই কর্ম্মানুষ্ঠানের পথে আপাততঃ যে বিঘ্ন ও উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে, তাহা লিখিয়াই আমরা প্রস্তাবনা শেষ করিব।

স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র আমাদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানের বিচারক ও ব্যবস্থাপক। মন্বাদি বিরচিত স্মৃতি সমূহ বেদ-মূলক, এই জন্য স্মৃতি বিহিত ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান বেদ-বিহিত ও ঈশ্বর-প্রণোদিত বলিয়া আর্য্যধর্ম্মীর সম্পূর্ণ বিশ্বাস। আর্য্যশাস্ত্রকারগণ সর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞ, এবং লৌকিক ও অলৌকিক যুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন হইলেও স্মৃতি বা ধর্ম্ম শাস্ত্রে তাঁহারা কোন কথাই যুক্তি বা দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া কাহাকেও বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা ঈশ্বরনিষ্ঠ শিষ্য ও লোক সমাজের সরল শ্রদ্ধা ও সাধু ভাবের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া লোক হিতার্থ অনুষ্ঠান রাশির নিয়ম - নিষেধ, প্রকরণ, ক্রম ও ফলাফলাদি বিস্তার পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সরল সাধকগণ যুক্তির বিদ্যুন্ময়ী প্রতিভা অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞ ঋষিদিগের আজ্ঞা অধিক প্রতিভা ও প্রভাযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এইজন্য লোক-কল্যাণকারী আচার্য্যগণ যুক্তির ক্ষুদ্র সাহায্য লইয়া লোকসমাজের নিকট আপনা-

দিগের ও স্ব স্ব প্রণীত গ্রন্থের গৌরব হানি করেন নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রের আজ্ঞা আর্য্যধর্ম্মাবলম্বিগণ ঈশ্বরাজ্ঞার ন্যায় চিরকাল প্রতিপালন করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। এতদিন মনের অনুরাগে ধর্ম্ম কর্ম্ম যে ভাবে ভারতে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছিল, কালের প্রভাবে—আমাদের অদৃষ্ট বৈগুণ্যে শাস্ত্রে কিছু ২ লোকের অনাস্থা জন্মিবার হেতু লক্ষিত হইতেছে। ইহা ধর্ম্ম-শাস্ত্রের দোষ নহে, জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ্বর্গের।

যেমন চিকিৎসকের সঙ্গে ঔষধ বিক্রেতার সম্বন্ধ, সেইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অতি নিকট সম্বন্ধ। চিকিৎসক ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দেন; কিন্তু সেই ঔষধ গুলি আনিতে হয় ঔষধবিক্রেতার নিকট হইতে। ঔষধ বিক্রেতা যদি ব্যবস্থালিখিত ঔষধের পরিবর্ত্তে, জানিয়া হউক বা না জানিয়া হউক, অপর একটী ঔষধ দেয়, তবে চিকিৎসকের ব্যবস্থা অতি উৎকৃষ্ট হইলেও রোগীর রোগ-নিবারণের আশা

নাই; হয়তো অযথা ঔষধ-সেবনে রোগ বাড়িতেও পারে। বর্ত্তমান আর্য্যসমাজ যাহা কিছু ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা সমস্তই ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত। ধর্ম্মশাস্ত্র যে তিথিতে, যে লগ্নে, যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন, সাধু গৃহস্থ তদনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্যোগ করিলেন; কিন্তু তিথি ও লগ্নের তত্ত্ব জানিবেন কোথা হইতে? স্মৃতিশাস্ত্রে তাহা জানিবার কোন সুবিধা নাই। তাহা জানিতে হইবে জ্যোতিষ শাস্ত্রের নিকট। কর্ম্মানুষ্ঠাতাকে স্মৃতির কাছে ব্যবস্থা লইয়া আবার জ্যোতিষের সাহায্য লইতে গমন করিতে হইল। জ্যোতির্ব্বিৎ যদি গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি বিধি যথাযথ গণনা করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তাহইত কর্ম্মানুষ্ঠাতার মঙ্গল, নতুবা অ-তিথিতে, অলগ্নে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। জ্যোতিষ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে বেদান্ত শাস্ত্রীয় অন্ধ ও পঙ্গুর ন্যায় সম্বন্ধ। অন্ধের স্কন্ধে পঙ্গু আরোহণ

করিলে অন্ধের গতিশক্তি ও পঙ্গুর দৃষ্টিশক্তি এতদুভয়ের সাহায্যে উভয়েই যেমন লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিতে পারে, সেইরূপ জ্যোতিষ ও স্মৃতি উভয়ের সমবেত সাহায্যে ধর্ম্মফল লাভ হইয়া থাকে। স্মৃতির সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি আছে, কিন্তু পঙ্গুর ন্যায় চলিতে পারেন না। জ্যোতিষের গতিশক্তি আছে, কিন্তু অন্ধের ন্যায় দেখিতে পান না। জ্যোতিষের স্কন্ধে স্মৃতি আরূঢ় হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠান রূপ ক্রিয়াটী সুসম্পন্ন ও অনুষ্ঠাতার আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হইয়া থাকে। জ্যোতিষ বা স্মৃতি যাহারই হউক, কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলেই কর্ম্মানুষ্ঠানের শুভ ফলের আশা করা যায় না।

বার, তিথি, নক্ষত্র, লগ্ন প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আমাদিগের পঞ্জিকাই একমাত্র সম্বল ও সহায়। আজ এই পঞ্জিকার গণনা বিভ্রাটে ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ নিতান্ত চিন্তিত ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে সংশয়াপন্ন হইয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিলেন—

"একাদশ্যাম ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি"।

এক্ষণে পঞ্জিকার গ্রহ নক্ষত্র গণনার দোষে যদি দশমীতে বা দ্বাদশীতে একাদশী লিখিয়া থাকেন এবং তদনুসারে তুমি একাদশীর উপবাস করিলে, ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে তুমি প্রত্যবায়ভাগী হইবে। পঞ্জিকার স্কন্ধে দোষ দিয়া তোমার পাপক্ষয় হইবে না, কেননা স্মৃতিতে লিখিত আছে—

"ভুঙ্‌ক্তে যো মানবো মোহাৎ
একাদশ্যাং স পাপকৃৎ"।

যে ব্যক্তি মোহবশতঃ (না বুঝিয়া, না জানিয়া, ভুলিয়া বা অন্য কোন ভ্রম বশতঃ) একাদশীতে ভোজন করে, সে পাপভাগী হয়। তিথি লইয়া অনেক সময় ভিন্ন ২ পঞ্জিকার মতভেদ দৃষ্ট হয়। পণ্ডিতের গণনার গণ্ডগোলে অনেক নিরীহ বিধবাকে দুই দিন উপবাস করিয়া ক্লেশ পাইতে হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যে অলগ্নে অ-তিথিতে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে

অনুষ্ঠাতার তাহাতে কোনও পাপ নাই, সে পাপ পঞ্জিকা-সংকলন কর্ত্তা পণ্ডিতের। এ বড় আশ্চর্য্য সিদ্ধান্ত! ইহাতে আমাদিগের মন যথোচিত প্রবোধ পাইল না। শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"পিতরঃ পর্ব্বকালেষু তিথি কালেষু দেবতাঃ"

পর্ব্বকালে * পিতৃগণ ও নির্দ্ধারিত তিথি বিশেষে দেবতা গণ পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

"অমাবস্যা দিনে প্রাপ্তে গৃহদ্বারং সমাশ্রিতাঃ।
বায়ুভূতাঃ প্রবাঞ্ছন্তি শ্রাদ্ধং পিতৃগণান্নৃণাম্।"

বায়ু পুরাণ।

অমাবস্যা দিনে পিতৃগণ পুত্র, পৌত্রাদির নিকট শ্রাদ্ধের প্রত্যাশা করিয়া বায়বীয় দেহ ধারণ পূর্ব্বক তাহাদের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। পিতৃগণ

* চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি, এই পাঁচটি পর্ব্বদিন।

দেবতা, গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি বিধি তাঁহাদের অগোচর নহে। তাঁহারা “যথার্থ অমাবস্যার” দিন শ্রাদ্ধপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন—অবিহিত দিনে তাঁহাদের আগমন আশা করা যায় না। এদিকে ধর্ম্ম শাস্ত্রও অমাবস্যার দিনে শ্রাদ্ধের বিধি দিয়াছেন; কিন্তু আমাদিগের অদৃষ্ট দোষে—পঞ্জিকার ব্যবস্থা দোষে হয়তো আমরা চতুর্দশী বা প্রতিপদে অমাবস্যা জানিয়া শ্রাদ্ধের আয়োজন করিলাম. সেদিন কিন্তু গ্রহ নক্ষত্রাদির বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ শক্তি প্রভাবে পিতৃ গণের আমাদিগের সমীপবর্ত্তী হওয়া অসম্ভব হইল। শ্রাদ্ধজন্য পিতৃগণ প্রকৃততঃ তৃপ্তিলাভের অবকাশ পাইলেন না, কিন্তু আমরা জানিলাম শ্রাদ্ধ করিয়া পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিলাম। বস্তুতঃ কর্ম্ম পণ্ড হইল। যেজন্য এত উদ্যোগ, এত ব্যয়, এত ক্লেশ করিলাম, তাহা সমস্তই ব্যর্থ হইল। পণ্ডিত মহাশয় হয়তো বলিবেন, শ্রাদ্ধকারিন্। ইহাতে তোমার পাপ নাই, পঞ্জিকাকার পণ্ডিত ইহার পাপভাগী।

এ সিদ্ধান্তে কিছু মাত্র ফল নাই। কেননা, শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকারীর পুণ্য হয়, পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন, শ্রাদ্ধ নিয়মিত কালে না করিলে অথবা অনিয়মিত সময়ে করিলে শ্রাদ্ধকারীর পাপ হয় ও পিতৃগণ অতৃপ্ত থাকেন। এক্ষণে দেখিলাম, পঞ্জিকার দোষে নিয়মিত সময়ে শ্রাদ্ধ না করায় শ্রাদ্ধকারীর যে পাপ হইবে, পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যবস্থানুসারে সে পাপ কাটিয়া যায় যাউক—পঞ্জিকাকার নরকে পড়েন, পড়ুন। কিন্তু নিয়মিত সময়ে বিধি পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকারীর যে পুণ্য হইত, তাহা হইল কৈ? পিতৃগণ যে তৃপ্তি লাভ করিতেন, তাহা হইল কৈ? তাঁহারা তৃপ্ত হইয়া শ্রাদ্ধকারীর প্রতি শুভ দৃষ্টি করিলে তাহার যে কল্যাণ হইত, তাহা হইল কৈ? তাঁহাদের অতৃপ্তি বশতঃ শ্রাদ্ধকারীর প্রতি তাঁহাদের অশুভ বা কোপ দৃষ্টি জন্য যে অনর্থপাত হইবে, সে অনর্থ নিবারণের উপায় কি? দেখা যাইতেছে পঞ্জিকার দোষে শ্রাদ্ধকারী বহু সম্পদে বঞ্চিত হইলেন

এবং তাঁহার অর্থব্যয়, উদ্যোগ ও উপবাসাদি ক্লেশ তিনি যেজন্য করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই ব্যর্থ হইল। মনে কর, হরিদাসের ওলাউঠা হইয়াছে, তাহার ভৃত্য রামলাল অন্ধকার রাত্রিতে বাজারে ঔষধ লইতে আসিয়াছে, ফিরিয়া যাইবার সময় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিল, প্রভুর পীড়া শক্ত, ঔষধ লইয়া যাইতেছি, শীঘ্র যাওয়া যায় এমন সহজ পথ দেখাইয়া দিতে পার? পথে গর্ত আছে, তুমি ইহা জানিয়া হউক বা না জানিয়া হউক, আরও অন্ধকারময় একটা বাগানের ভিতর দিয়া যাইবার পথ দেখাইয়া দিলে। ভৃত্য যাইতে যাইতে এক বিষম গর্ত্তে পড়িয়া গেল। এই আকস্মিক পতনের বিষমাঘাতে তাহার এক খানি পা ভাঙ্গিয়া গেল। এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে ও প্রভুর নিকট যাইতে রাত্রি শেষ হইয়া গেল, এদিকে চিকিৎসাভাবে—ঔষধাভাবে প্রভুও লীলা সম্বরণ করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় হয়তো বলিবেন, ভৃত্যের ইহাতে পাপ নাই, এপাপ তোমার

কেননা তুমিই এ কুপথ দেখাইয়া দিয়াছ। 'পাপ তো নাই বুঝিলাম, গর্ত্তে পড়িয়া তাহার যে পাখানি ভাঙ্গিয়া গেল ও বেদনায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল, প্রভুর যে অকাল-মৃত্যু হইল, এতাবতের ক্ষতি পূরণ করিবে কে ? তাই বলিতেছি, লোকে কেবল পাপের ভয়েই ধর্ম্ম করে না; ধর্ম্মের দ্বারা পুণ্য ও সুকৃতি লাভ হয়। তবে পাপের ভয় এড়াইলেই যে ধর্ম্মের ফল লাভ হইল, তাহা কে বলিল ? বস্তুতঃ অকালে বা অলগ্নে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে অনুষ্ঠাতাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, এবং যে পিতৃগণ বা দেবতার উদ্দেশে কার্য্যের অনুষ্ঠান, তাঁহাদেরও প্রসন্নতা সাধিত হয় না। জ্যোতিষ শাস্ত্রের অপূর্ণ শিক্ষার দোষে আমাদিগের দেশে আমাদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম সমস্তই পণ্ড হইবার উপক্রম হইয়াছে। ব্রাহ্ম-সমাজের বিকট ক্রন্দনে, নাস্তিকগণের আস্ফালনে, মহম্মদীয় নির্য্যাতনে, খ্রীষ্টীয়দলের কুন্দনে, বিলাত-প্রত্যাগত গণের সংঘর্ষণে আর্য্য গৃহস্থ গণের আশ্রম-ধর্ম্মের

যে ক্ষতি করিতে পারে নাই, আজ বুঝি আমাদের ঘরের পণ্ডিত মহাত্মারাই সেই টুকু করিয়া বসেন। জ্যোতিষিগণ সে কালের বাঁধা নিয়ম ধরিয়া গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি বিধি গণনা করিয়া যাইতেছেন, কিন্তু এই গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি বিধি যে সময়ে২ পরিবর্ত্তিত হয় এবং এই জন্য মধ্যে মধ্যে জ্যোতির্গণনার ক্রমও যে পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি থাকিলে এই ঘোর দুর্ব্বিপত্তি ঘটেনা। গ্রহ নক্ষত্র গণের গতি অনুসারে তাহাদের স্থানও প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পঞ্জিকার গণনা পদ্ধতি শুদ্ধ হইলেও গ্রহ গণের স্থান বিপর্য্যয় সংঘটন হেতু যুগভেদে ফলভেদ দৃষ্ট হয়। আর্য্য মহাত্মাগণ যে সময়ে নক্ষত্রাদির স্থিতি-স্থান স্থির করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সে বহু দিনের কথা; এখন নক্ষত্রাদির অনেক স্থান-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; সুতরাং এক্ষণে পুনর্ব্বার যন্ত্রাদির সাহায্যে নভোবক্ষ পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক তাহাদের স্থান স্থির করিয়া গণনা না করিলে বহু

ভ্রম হইবে। সময়ে সময়ে এই রূপ ভ্রম সংশোধন না করিলে যে চলেনা, এবং বয়েকবার এরূপ ভ্রম সংশোধনও যে হইয়াছে, জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে। একবার জ্যোতিষ শাস্ত্রের পুনঃ সংস্কার না হইলে আমাদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম যে যথাবিহিত অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার আশা অতি অল্প। আবার এই সংশোধনেই যে চিরদিন চলিবে, তাহা নহে—এইরূপ সময়ে সময়ে চিরদিনই করিতে হইবে। এই জন্য পণ্ডিত, ধর্ম্মাত্মা ও ধনাঢ্যগণ এ বিষয়ে বিশেষ রূপ মনোযোগ করেন, ইহাই আমাদিগের অনুরোধ, নতুবা ধর্ম্মরক্ষার আর উপায় দেখিতেছি না।

" ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

তস্মাদ্ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মানো ধর্ম্মো হতোবধীৎ " ॥

ধর্ম্মকে যিনি রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন, ধর্ম্মকে যিনি নাশ করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে নাশ

করেন। অতএব ধর্ম্ম যেন বিনষ্ট না হন, তাহা হইলে আমাদিগকেও বিনষ্ট হইতে হইবেনা।

এক্ষণে উপায় কি !

আর্য্য ঋষি, তপস্বীশোভিত বীরপ্রসূতি ভারতভূমি অকূল কালসাগরে ভাসিতে ভাসিতে কলিকলুষ-গভীর-নীরে ডুবিয়া গেল, যোগী, যতি, সিদ্ধ, সমাহিতগণ দৃষ্টির অগোচর হইলেন, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী সমর-চতুর রণধীর বীরবর্গ অস্ত্র শস্ত্র সহ অদৃশ্য হইলেন, আসমুদ্র-করগ্রাহী ভারতভূপতিগণ নিস্তেজ, সাহসহীন ও হত-চেতন হইয়া একে একে ভূতকালের নিভৃত প্রদেশে লুক্কায়িত হইলেন ; ভারত শবরাশিপূর্ণ শ্মশানের ন্যায়, উৎসবান্তে পুরীর ন্যায়, দাবদাহ-দগ্ধ বনের ন্যায় শূন্য ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল ; কোমল-হৃদয় সাধুগণ ব্যাকুল হইয়া বলিতে লাগিলেন এক্ষণে উপায় কি ! বেদবিধি

বিলুপ্ত প্রায় হইল, সাধু সংস্কৃত-বিদ্যার অনুশীলন হতাদর হইয়া পড়িল, ব্রহ্মচর্য্য কেবল নাম মাত্র রহিয়া গেল, সদাচার শঠগণ দ্বারা কপটাচারে পরিণত হইতে চলিল, মানবগণ ব্রহ্ম-বিচারণাকে হৃদয়ের কোমল কমলাসন হইতে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক বাগ্দ্বারের রসনাসনে নৃত্য করাইতে লাগিল, ঘোর পাষণ্ডাচারে ভারত পরিপূর্ণ হইয়া কাতর স্বরে বলিল, অহো! এক্ষণে উপায় কি! যজ্ঞধূম উত্থিত হইয়া বায়ুমণ্ডলকে সংশোধিত ও আকাশ-মণ্ডলকে আর মেঘাচ্ছন্ন করে না, যে রব বনের পশু পর্য্যন্ত একমনে শ্রবণ করিয়া অশ্রু বর্ষণ করিত, সে সামগান-ধ্বনি আর শ্রুতিবিবরে প্রবেশ করে না, ভারতের বিজয়-ভেরীর গম্ভীর নিনাদে আর দিগ্দিগন্ত পরিপূর্ণ হয় না, লক্ষ্মী ভারত-প্রকৃতির কোমল ক্রোড়ে বসিয়া আর ক্রীড়া করিতে চাহেন না, ভারতের গৌরব-চিহ্নচয় দিন দিন অদৃশ্য হইতে লাগিল, ভারতবাসীগণ ক্রমে সহায়সম্পত্তিহীন হইয়া পড়িল, এক্ষণে উপায় কি!

কলিকলুষপ্রভাবে লোক সকল অযথোচিত লুব্ধ, দুরাচার, নির্দ্দয়, বৃথাবিবাদ-প্রিয়, দুর্ভাগ্য, ভূরিতৃষ্ণ হইয়া উঠিতেছে ; সদাচার, সদনুষ্ঠান, সৎকার্য্য বা সৎকথার প্রসঙ্গে লোকের অভিরুচি দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে ; অসন্তোষ, অভিমান, দম্ভ, মাৎসর্য্যের অধিকার লোক-সমাজে বিস্তৃত হইয়া উঠিতেছে ; মমতা মিথ্যাভাষণ, আলস্য, ঔদাস্য, নিদ্রা, দ্বেষ, বিষাদ, শোক রোগ, দরিদ্রতা, দুর্ভিক্ষ আদিতে ভারত ভূমি জর্জ্জরিত হইতে লাগিল, এক্ষণে উপায় কি ! লোক-সমাজ ক্ষুদ্র-দৃষ্টি, সংকীর্ণমনা, বহুভোজী, বহুপুত্র, বহুকাম এবং নারীগণ স্বেচ্ছাচারিণী ও অপ্রিয়বাদিনী হইয়া উঠিল, জনপদ সকল দুরাত্মাগণে আকীর্ণ, বেদ সকল পাষণ্ড-দূষিত, ভূপতি প্রজাভক্ষক, ব্রাহ্মণগণ শিশ্নোদর-পরায়ণ ও কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখ, ব্রহ্মচারীবর্গ বিহিতাচারবর্জ্জিত ও অশৌচাচারী হইতে চলিল ; সত্যানুসন্ধান প্রায় কাহারও নাই, জ্ঞানোপার্জ্জনে বিরাগ, তপস্যাচার কেবল শব্দ-

মাত্র ও দান খ্যাতিবৃদ্ধির জন্য হইয়া "আর্য্যাবর্ত্ত পুণ্যভূমি" এই নির্ম্মল নামে দোষ স্পর্শ করিল, এক্ষণে উপায় কি! তপস্বীগণ বনবাস ত্যাগ করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিতেছে; সন্ন্যাসীগণ অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইতেছে, লোক সকল অদীর্ঘকায়, অসৎপুত্রবান্, নির্লজ্জ, কটুভাষী ও দুঃসাহস হইয়া উঠিতেছে, ধূর্ত্ততা কপটতা লোকহৃদয়ের ভূষণ হইতেছে; স্বার্থপরতাশূন্য পরোপকার-কামনা মানবের মন হইতে তিরোহিত হইতে লাগিল; ন্যায়, ধর্ম্ম, কম্পিতকলেবরে নিভৃত পর্ব্বত-গুহায় পলায়ন করিতেছে; ভারতভূমি বিভীষিকাময়ী পুরী হইয়া উঠিল, এক্ষণে উপায় কি! আয়ু, বল, স্মৃতি, শৌচ, সত্য দিন দিন ক্ষীণভাবাপন্ন এবং সৌভাগ্য, সুখ ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি তিরোহিত হইতেছে; যাহার ধন অধিক আছে, সেই ব্যক্তিই আচারবান্, গুণবান্, জ্ঞানবান্ ও প্রশস্তকুলে সমুদ্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইতে অবসর পাইল, পূজ্যগণের মর্য্যাদার লাঘব ও গুরুলঘু জ্ঞান

সুদূরপরাহত হইতে লাগিল, অভিরুচি হইলেই লোকে পতি পত্নীভাব স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহাদের কুল বা গোত্রাদি বিচারিত হইতেছে না। ভারতবর্ষ প্রায় ধর্ম্ম-শাসন-শূন্য হইয়া উঠিল, এক্ষণে উপায় কি! একমাত্র সূত্র থাকিলেই ব্রাহ্মণ, ধনহীন হইলেই অসাধু, বহুভাষী হইলেই পণ্ডিত, শ্মশ্রু রাখিলেই লাবণ্যযুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে চলিল, দূরে স্থিত হইলেই জলাশয় মাত্রই তীর্থ বলিয়া পরিসেবিত হইতেছে; আত্মবিচ্ছেদ, অন্তর্ব্বিবাদ, ও গৃহকলহে ভারত উচ্ছিন্ন প্রায় হইল; চারি বর্ণই শূদ্রধর্ম্মী, ধেনু সকল অল্পদুগ্ধ, আশ্রম সকল গৃহ প্রায়, ঔষধি সকল অল্পগুণ ও লোক সকল পিতা মাতা আদি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র স্ত্রীকেই পরিবার বলিয়া পালন করিতে লাগিল, অতএব এক্ষণে উপায় কি! শাস্ত্র মর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক জনগণ নিজরুচির প্রাধান্য স্বীকার করিতেছে, সাধুবিগর্হিত পথ সাধারণের জন্য প্রসারিত ও বিদ্যা, বুদ্ধি, গুণ অপেক্ষা

অর্থের গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে, নির্ধন অথচ গুণবান্ প্রভুকে ভৃত্য ও পরম গুণবান্ বিপদ্‌গ্রস্ত বা স্থবির ভৃত্যকে প্রভু ত্যাগ করিতেছে, শিক্ষিতাভিমানী লোক-সকল পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, সুহৃদ্ জ্ঞাতি বর্গকে পরিত্যাগ করিতেছে, স্ত্রীপরায়ণ হইয়া মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি দূরে ত্যাগ করিয়া ননন্দা ও শ্যালকের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিতেছে; দরিদ্রতা, দুঃখ, শোক, অসুখ ও ক্লেশের বলবত্তরঙ্গে ভারত অধঃপতন-সাগরে ডুবিতে লাগিল, এক্ষণে উপায় কি! ব্রাহ্মণগণ বেদ-বর্জ্জিত ও শূদ্রগণ ধর্ম্মোপদেষ্টা হইল; কপটমতিগণ আচার্য্যের আসন অধিকার করিল; অপণ্ডিত পণ্ডিত, অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক ও যে কিছুই জানে না, সেও জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত হইল; অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অল্পবৃষ্টি প্রভৃতি উৎপাতে ভারত শস্যহীন হইল; উপর্য্যুপরি দুর্ভিক্ষদাহে প্রজাগণ প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল; অনা-হারে ক্ষুধার জ্বালায় মনুষ্যে মনুষ্য, মৃত পশু, পক্ষী

আদি ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইল; স্বামী স্ত্রীকে ও পুত্র পিতাকে পালন করিতে অসমর্থ হইয়া উঠিল ; শক্তি ও উপায় সত্ত্বেও কেহ প্রায় আপনাকে ভিন্ন অপরকে রক্ষা ও পালন করিতে চাহে না; রোগ, অনাহারে ও শোকে লোক সকল নিতান্ত শ্রীহীন ও শোভাহীন হইয়া পড়িল, অহো! এক্ষণে উপায় কি! মানব গণ হরি-আরাধনায় বিমুখ হইয়া উঠিল; সংসার-ক্লেশে বারম্বার পরিপীড়িত হইয়াও পরলোকের বিষয় স্মরণ করে না; বারুণি ও বারবনিতাবিলাস ভারতের মর্ম্ম-চ্ছেদ করিতে উদ্যত, জনগণ ধর্ম্মকথা শুনিয়া উপহাস করিতে থাকে, যে ধর্ম্ম ভারতের প্রাণ, আর্য্য ঋষিগণের চিরসমাদরের ধন ও যে ধর্ম্ম জীবের সংসারপাশ ছেদের অমোঘ অস্ত্র, সেই ধর্ম্মজ্ঞান মানবের মন হইতে অপ-সারিত হইতে লাগিল. আহা! ভারতের পবিত্র নাম বুঝি কলুষিত হইল! ভারতের এই দুর্দ্দিন-মোচনের এক্ষণে উপায় কি!

ভারত-ভূপতিগণ ! আপ   া চিরদিন ভারতকে ক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, এখ   । আর ইহার দুর্ব্বিপত্তি ন্য কাতর স্বরে কর্ণপাত করেন না কেন ! আপনারা কি এত কঠিন ও নির্ম্মম হইয়াছেন যে ভারতের আর্ত্ত-াদে আপনাদিগের হৃদয় বিগলিত হইতেছে না ! একবার আপনাদিগের দুঃখিনী ভারতজননীর দিকে দিয় দৃষ্টি করুন ; ভারতভূমি কি রাজমাতা হইয়া কাঙ্গালিনীর ন্যায় অশ্রুপাত করিতে থাকিবে ! শূরবীর-প্রসবিনী হইয়াও কি আর্য্যভূমি এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত থাকিবে ! আপনারাও ভারতের দুঃখ মোচনের জন্য যত্ন, চেষ্টা ও সহায়তা না করেন তবে এক্ষণে উপায় কি !

ভূদেব ব্রাহ্মণগণ ! আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতাপে ভারতভূমি বিশ্বপূজিত হইয়াছিল, আপনারাই ভারতীয় গৌরবের প্রতিষ্ঠাতা, আপনারাই ভারতভূষণ, যদি আপনারা আর কিছু দিন কর্ত্তব্যবিমুখ থাকেন, তাহা হইলে আপনাদিগের নামের সঙ্গে সঙ্গে ভারত-

বর্ষের নাম ও ডুবিবে। ও ।স্ত্র-বিজ্ঞান আলোচনা করুন, নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম যাজনা ক ।। ধর্ম্ম ও জ্ঞানবলে ভারতকে সচেতন করুন, সনাতন আর্য্যধর্ম্ম প্রচার দ্বারা ভারতের পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাণপণ ত্ন করুন, ইহা ভিন্ন বলুন, আর এক্ষণে উপায় কি!

ধর্ম্মাত্মা ধনাঢ্য, সদনুষ্ঠানশীল মহোদয় মাত্রকেই সম্বোধন করিয়া কাতরস্বরে বলিতেছি, সকলেই স্ব হৃদয়ে ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দূর করিবার পন্থা অন্বেষ করিয়া বলুন, এক্ষণে উপায় কি! চিকিৎসকগণ! আপনারা তো অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি শান্তি করেন ভারতবর্ষ বিষম বিকারগ্রস্ত, চিন্তা করিয়া বলুন, এই বিষ ব্যাধি শান্তির এক্ষণে উপায় কি! আমরা ভারতের এই ঘোর বিপদ্ কালে সকলের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যদি কেহ সাধনা বলে, জ্ঞান বলে অথবা আর্য্যবীর্য তেজো বলে বুঝিতে পারিয়া থাকেন তবে বলিয়া দিন এক্ষণে উপায় কি! যদি আপনারা ভারতবাসী হইয়া

ভারতের হিতসাধন না করিবেন, যদি আপনারা সকলেই ভারতের প্রতি উপেক্ষা করিয়া আমোদ উপহাস করিবেন, তবে আর এক্ষণে উপায় কি ? আপনাদিগের সমবেত যত্ন ও সহায়তা ভিন্ন ভারতের উন্নতি সাধনের এক্ষণে উপায় কি !

নারায়ণ ! তোমার চিরশরণাগত ভারত হতচেতন হইয়া পড়িয়াছে, আর তোমাকে আবাহন করে এরূপ সংজ্ঞা নাই। নাথ ! রক্ষা কর, প্রত্যেক আর্য্যসন্তানকে অভ্রভেদীস্বরে বলিয়া দাও "শীঘ্র উত্থান কর, আর্য্য-গণের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া আর্য্য কীর্ত্তি রক্ষা কর।" হে দীনবন্ধো ! আমাদিগকে তোমার জ্ঞান দাও, তেজ দাও. আর্য্যদিগের ন্যায় বল, বীর্য্য, বুদ্ধি বিচার দাও, ভক্তি, প্রেম, বিশ্বাস দাও, এবং জ্বলন্ত জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়া বজ্রনিনাদে বলিয়া দাও, ভারত উদ্ধারের এক্ষণে উপায় কি ! তোমার প্রেরণা

ভিন্ন ভারত তো কখনও কোন কার্য্য করে নাই, সুতরাং তুমি ভিন্ন ভারতের আর এক্ষণে উপায় কি !!

দল ভাঙ্গিয়া দল বাঁধা।

যে ধর্ম্মসমাজকেই জিজ্ঞাসা কর, সকলেই বলিবে যে "সাম্প্রদায়িকতা" বড়ই সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক। অথচ দেখ সকলেই এই জীর্ণ সূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে। অভিমান স্বার্থবুদ্ধির সূচনা করে। যখন কার্য্য-কৌশল চতুর ব্যক্তির এই স্বার্থ বুদ্ধির উদয় হয়, তখন তিনি বুদ্ধি কৌশলে নিজের স্বার্থকে অন্য অনেকের স্বার্থ বলিয়া বুঝাইয়া দেন, অমনি তাঁহার স্বার্থ নিমেষ মধ্যে সাধারণের সামগ্রী হইয়া পড়ে। স্বার্থসিদ্ধি দেখিতে দেখিতে বারবিলাসিনীর ন্যায় একস্থলেই অনেক লোক একত্র করিল। অমনি একটি দল বাঁধিয়া গেল। যেখানে অভিমান নাই—স্বার্থ নাই, সেখানে দলও নাই। যাহারা বিষয়ের দাস, তাহারা এরূপ দল

বাঁধিবে তাহা আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু যে ধর্ম্মবুদ্ধি ঈশ্বরের সহিত জীবের যুগল মিলন দেখিতে চায়, তোমায় আমায় এক করিতে চায়, বৈষম্যবুদ্ধির বিনাশ করিতে চায়, স্বর্গ মর্ত্ত্য একই নিয়মে চালাইতে চায়, সেই ধর্ম্মবুদ্ধিও যে দলাদলির হাত এড়াইতে পারে নাই ইহাই আশ্চর্য্য। যাঁহারা স্বচ্ছ হৃদয়-দর্পণে ধর্ম্মের মূর্ত্তি দর্শন করেন, তাঁহাদের এরূপ দুর্দ্দশা হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই; কিন্তু মলিন হৃদয়ে সেই সুন্দর ছবি আবার কদাকার বোধ হয়। যাঁহারা সরলতা, নিরভিমান, বিনয়, ভক্তি বিশ্বাস আদি ফুলে হৃদয়ের সাজি সাজাইয়া ধরা ধামে ভগবানের পূজা করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা সাম্প্রদায়িকতার কুটিল গর্ভে পতিত হয়েন না, কিন্তু তাঁহাদের অনুগামী বর্গের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মের পসারা মাথায় করিয়া জগতের কাছে আত্মমর্য্যাদা ভিক্ষা করিতে যান্, তাঁহারা অগত্যা সম্প্রদায়-বদ্ধ না হইলে কার্য্য-সাধন করিতে পারেন না।

দলবদ্ধ হইলেও ভগবানের পূজা সকলে এক প্রণালীতে করে না বা করিতে পারে না। ধর্ম্মের পরিচ্ছদ—মালা তিলকাদি চিহ্ন বা আসনাদি একরূপ হইতে পারে, কিন্তু পূজার প্রধান উপকরণ—মনের ভাব—সকলের এক রূপ হইতে পারে না। সুতরাং এক সম্প্রদায়ের হইলেও সকলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্বতন্ত্র ২ রূপে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন। কথা প্রসঙ্গে বা তর্ক-বিতর্ক-কালে এক মণ্ডলীর ঈশ্বর একই রূপ হইতে পারেন, কিন্তু পূজার সময় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন। লোকত হয়তো একটি প্রবল দল দেখিলাম, কিন্তু পরমার্থতঃ প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। সম্প্রদায় গুলির প্রকৃতি দেখিলে বোধ হয় যেন স্তরে স্তরে ইট গুলি সাজান আছে মাত্র, কিন্তু পরস্পারের মশালার যোড় নাই। আবশ্যক হইলে ক্ষণ মধ্যেই ঐ ইষ্টক-স্তূপে তিন চারিটি স্বতন্ত্র গৃহ প্রস্তুত হইতে পারে। সম্প্রদায় বা দল কথাটি শুনিলে যেন একটি প্রচণ্ড

শক্তির অভিনয়ক্ষেত্র বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে বস্তুতঃ উহা অন্তঃসারশূন্য। বালুকা-স্তূপবিনির্ম্মিত গৃহের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

বুদ্ধিমান্ মহাত্মারা যে সাম্প্রদায়িকতার এই কুহকময়ী বাজির ঠাট বুঝিতে পারেন না, তাহা নহে। ইহা বুঝিতে না পারিলে উহার মূলোচ্ছেদ করিয়া ঐকমত্য স্থাপনের জন্য তাঁহারা এত চেষ্টা করেন কেন? পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে পরমার্থ রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতার মলিন ছায়া প্রবেশ করিতে পারে না, তবে কতক গুলি মোটামুটি কথায় অনেক লোকের ঐক্য থাকে বলিয়া লোক-জগতে দলের বড় মর্য্যাদা। এই মর্য্যাদা রাখিবার জন্যই তর্কের দ্বারা অন্যের শাস্ত্রে দোষা-রোপ করিতে প্রবৃত্তি হয়। তোমার অভিমানে আঘাত পড়িল, অমনি তুমি দণ্ডাহত বিষধরের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া—মহা আস্ফালন করিয়া বিপক্ষের গ্লানি কুৎসা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলে—দম্ভ অহঙ্কারে

অন্ধ হইয়া বিপক্ষের মর্ম্মস্থানে দংশন করিলে, অভি-
মানের তাড়নায় আপনার পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া—
নিজ বুদ্ধিবোধিত সংস্কারের মর্য্যাদা রাখিতে গিয়া
ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই ভাসাইয়া দিলে। সম্প্রদায়ে আবদ্ধ
থাকিলে এই সকল বিড়ম্বনা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মহাত্মা
গণ সাম্প্রদায়িকতাকে জগৎ হইতে তাড়াইতে চাহেন-
তাঁহাদের ইচ্ছা অতি সাধু—সংকল্প অতি পবিত্র। কিন্তু
তাঁহারা করিবেন কি! তাল পত্রের খাঁড়া দিয়া
রাক্ষসীকে নিপাত করিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র।
কেবল বাহ্বাস্ফোটনে—কেবল কটি বন্ধনে—কেবল
তর্জ্জন গর্জ্জনে এ মায়াযুদ্ধে বিজয়ের আশা করা বৃথা।
উদ্দেশ্য মহৎ হইলে কি হইবে, তদুপযুক্ত উপায় কৈ ?
তুমি ভাবিলে পুরুভুজকে অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া
ফেলিলাম—পুরুভুজ মরিয়া গেল। মায়ার লীলা বুঝিবে
কি! ঐ দেখ পুরুভুজের এক একটি খণ্ড এক একটি স্বতন্ত্র
স্বতন্ত্র পুরুভুজ হইয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্বে একটি পুরুভুজ

ছিল, তোমার অস্ত্রাঘাতের গুণে পুরুভুজেরসংখ্যা বাড়িয়া গেল। তাই বলি, তুমিতো দল—সম্প্রদায় উঠাইতে গেলে, কিন্তু কপাল-গুণে তুমিই আবার সম্প্রদায়ের সংখ্যা বাড়াইয়া ফেলিলে। কত লোক অসাম্প্রদায়িকতার নিশান তুলিয়া সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করিতে গেল; গেল বটে, কিন্তু আর ফিরিল না। কিয়দ্দিন পরে দেখি "গণ্ডোপরি বিষস্ফোটক"। একে লোকে কতক গুলো সম্প্রদায়ের জ্বালায় জ্বালায়তন্ন, তাহাতে ঐ অসাম্প্রদায়িকতার ধ্বজাধারী গণই এক সম্প্রদায় বাঁধিয়া বসিল। তুমি আপনাকে অসাম্প্রদায়িক বলিয়া যতই পরিচয় দাও না কেন, কার্য্যতঃ—বস্তুতঃ তোমার অসাম্প্রদায়িক দলই এক সম্প্রদায়। হাতের পাঁচটী অঙ্গুলীর মধ্যে চারিটি অঙ্গুলীর বৃদ্ধা, কনিষ্ঠাদি চারিটি নাম আছে, একটির নাম নাই, তাই লোকে তাহাকে "অনামিকা" বলে, কিন্তু এক্ষণে "অনামিকাই" তাহার "নাম" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই রূপ "অসাম্প্রদায়িক"

দলই এক "সম্প্রদায়" বলিয়া উক্ত হয়। কিছু দিন হইল, সম্প্রদায়ের গণ্ডগোল হইতে ভারতকে বাঁচাইবার জন্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজা রাম মোহন রায়, সাধুহৃদয় শ্রীমন্মহাত্মা দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, মহামনা বাবু কেশব চন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্ম মণ্ডলী এই মহামন্ত্র সাধন করিতেছিলেন, তাহার ফল যাহা চির কাল হইয়া আসিয়াছে, তাহাই হইয়াছে। সাম্প্রদায়িকতা মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া বলিলেন, "যে ভয়ে পলাও তুমি, সেই দেবী আমি" ব্রাহ্ম সমাজ-সম্বন্ধে আমরা নিজ ভাষায় আর কিছু বলিব না। ব্রাহ্মগণ ভাবিবেন, আমরা বিদ্বেষ-বুদ্ধির বশম্বদ হইয়া তাঁহাদের গৃহকাহিনী গাহিতেছি; এই জন্য "নব্য ভারতে" প্রকাশিত জনৈক বিশেষ পরিচিত "বিধান-দল" ভুক্ত মহাত্মার (শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মার) কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেই দেখুন না কেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম

কত বিচিত্র প্রণালীর ভিতর দিয়া চলিয়া আসিল এবং কোথায় কি রূপ ধারণ করিল ? একটু ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয়, প্রত্যেকেরই যেন স্বতন্ত্র ঈশ্বর এবং স্বতন্ত্র ধর্ম্ম। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই এইরূপ স্বতন্ত্রতা লক্ষিত হইবে। অবশ্য বাহিরে দুই পাঁচটী বাহ্যকার্য্য সমবেত ভাবে নিষ্পন্ন হইতেছে এবং তাহাকে একটী সাধারণ নামে অভিহিত করিয়া আমি অমুক সম্প্রদায়ের লোক ইত্যাদি বাক্য সচরাচর সকলে ব্যবহার করেন, কিন্তু আন্তরিক ভাবের একতা কোথায় ? সে একতা যেখানে, সেই ত স্বর্গরাজ্য ! তাহা অতি বিরল। প্রাচীন ধর্ম্মের ইতিহাসে মানবের ধর্ম্মচরিত্র যেমন নানা বর্ণে চিত্রিত আছে, বর্ত্তমানেও তাহাই হইতেছে। ব্রাহ্মগণ কেহ হিন্দুধর্ম্মের কোন অংশবিশেষকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন, কেহ ভয়সি পার্কার নিউম্যানের বিচারপথ ধরিয়াছেন, কেহ প্রাণায়াম সাধনপূর্ব্বক নিশ্বাস বন্ধ

করিয়া আনন্দ ভোগ করিতেছেন ; কেহ বাউল, কেহ কর্ত্তাভজা, কেহ ভবিষ্যদ্বক্তা, কেহ প্রেততত্ত্ববাদী, কেহ ভাবপ্রধান পথে কেহ বা জ্ঞান-বিচার-পথে, কেহ অধিক বাহ্যাবলম্বনপ্রিয়, কেহ নির্গুণ ব্রহ্মবাদী, কেহ মনুষ্যের মুখাপেক্ষী, কেহ অধ্যাত্মবাদী নিরবলম্ব ব্রহ্মোপাসক, কেহ সামাজিক, কেহ বাহ্যসংস্কার-প্রিয় ; যিনি যে পথটী ধরিতে পারিয়াছেন, তাহাই ধরিয়া চলিতেছেন। যে ধর্ম্মের দ্বারা সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা বিনষ্ট হইবার কথা, তাহাই আবার ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল ! কেহ কেহ সাকারের রাজ্যে গিয়া জড়বাদী হইতেছেন, কেহ নিরাকারের অজানিত অকূল সমুদ্রপথে পড়িয়া অন্ধকার দেখিতেছেন। ব্রাহ্মগণ নানা দিকে দৌড়িতেছেন, কোথায় গিয়া তাঁহারা আশ্রয় পাইবেন, কাহার যে কি পরিণাম হইবে, তাহা ভাবিয়া উঠা যায় না।"

এই তো গেল আমাদের ব্রহ্মবাদী গণের চেষ্টা।

উদ্যোগ ও প্রযত্নের পরিণাম। এই পরিণাম দেখিয়া আমরা ব্রাহ্মগণকে পরিহাস করিতে চাহিনা, অধিকন্তু সাধারণ মনুষ্য গণের দ্বারা এতদপেক্ষা অন্যপ্রকার ফল উৎপন্ন হইবার যাঁহারা আশা করেন, তাঁহারাই পরিহাসাস্পদ হয়েন। প্রকৃতির গতিরোধ করিতে হইলে অলৌকিক শক্তি সাধন করা আবশ্যক।

উপসংহার কালে আমাদের আর্য্যশাস্ত্রানুরাগী থিয়সফিষ্ট ভ্রাতৃবর্গকেও দুই একটি কথা বলিব। তাঁহারাও এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহারাও সাম্প্রদায়িকতাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসন করিতে চাহেন। ইহঁাদেরও "উদ্দেশ্য" উচ্চ ও "উদার"। কিন্তু "উপায়" ইঁহাদেরও অন্যের যাহা হইয়া থাকে, তাহাই। ইঁহাদের মধ্যে অনেক ধীর, শান্ত, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আছেন। তাঁহাদের কার্য্যকুশলতা অনেক স্থলেই প্রশংসনীয়। থিয়সফি সম্বন্ধে কিছুদিনের মধ্যেই অনেক অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, সে সকল কথা আজ

এ প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য নহে, তবে সার্ব্বভৌম—ভ্রাতৃভাব (Universal Brotherhood) সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা এতৎপ্রসঙ্গাধীন বলিয়া বোধ হইতেছে। পৃথিবীশুদ্ধ লোককে "ভাই বলিয়া ভাল বাস" এটি পুঁথিসাজান কথা, সামাজিক ব্যবহার কালে ভূতলে এপর্য্যন্ত একথার কার্য্যকারিতা কখন কেহ দেখে নাই এবং পৃথিবীতে পার্থিব প্রকৃতি সত্ত্বে কেহ যে কখন দেখিবে তাহারও আশা নাই। বিদ্যাসুন্দরে বিদ্যার রূপ বর্ণনা পড়িয়া যদি কেহ সেইরূপ রূপবতী যুবতী সত্যসত্যই চর্ম্মচক্ষে দেখিতে চায়, তবে তাহাকে লোক যেমন পাগল বলে, সেইরূপ জ্ঞানসাধনার চরম ফল "সমদর্শন" যে ব্যক্তি এই পৃথিবীর ময়লা মাটি-মাখা মানব সমাজের কার্য্যক্ষেত্রে চালাইতে চাহেন, তাঁহাকে আমাদের ইচ্ছা না থাকিলেও পাগল ভিন্ন আর কি বলিব? রক্তমাংসের শরীর লইয়া, স্বার্থ, মান, যশোলিপ্সা, সাংসারিক সুখ সৌভাগ্য বাসনার বোঝা

মাথায় রাখিয়া সকলের সঙ্গে ভ্রাতৃভাব করা কথার কথা নহে। একটি নিন্দা শুনিলে ক্রোধে কাঁপিয়া উঠি, আমা হইতে অন্যের অধিক প্রশংসা শুনিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়, মহাসভায় হরি বাবু নিমন্ত্রণ-লিপি (Invitation Card) পাইলেন, আমি পাইলাম না, এই অভিমানে মরমে মরিয়া যাই, আপনি সভাতে যাইবা মাত্র সকলে উঠিয়া সৎকার করিল, আমি সভাস্থ হইলে, কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল না, এই দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, একজন দরিদ্র বা একজন নিম্নপদস্থ ব্যক্তি আমাকে "আপনি মহাশয়" না বলিয়া তুমি বা তুই বলিলে আমি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠি. আমার কি কর্ম্ম সকলকে ভাই বলিয়া ভালবাসা ? পূজার বাজারে যে সকল কাপড় বিক্রীত হয়, তাহার জমী ভাল হউক বা না হউক, তাহার চটকদার পাড় থাকিলেই তাহা অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া যায় ; সেইরূপ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই কার্য্যতঃ কিছু

থাকুক্ বা না থাকুক্, গোটা কতক ঐরূপ চটক্‌দার কথার মাত্রা থাকায় সংসারে সম্প্রদায় গুলি শোভা পাইয়া থাকে। আমরা এই উচ্চ উদার কথা গুলির বিরোধী নহি, তবে ব্যবহার-ক্ষেত্রে কোন ফল দেখিতে পাইনা বলিয়াই বড় দুঃখিত হই। আবার কার্য্য করিতে পারনা বলিয়া কথা গুলি উঠাইয়াও দিতে বলিনা। কেননা, ওকথা গুলি অতি উচ্চ উদার, প্রকৃতির আদর্শ জীবনের কথা। কথা গুলির টানে পড়িয়া মনুষ্যগণ সেই অবস্থা পাইতে ইচ্ছা করিবে। কথা গুলি মুছিয়া ফেলিলে মানব-হৃদয়ের আশা ভরসা সব ফুরাইয়া যাইবে। আরও একটি কাযের কথা বলিব। তুমি যখন থিয়সফিষ্ট ছিলেনা, তখন সাধারণ ভাবে কিছু কিছু সকলের সঙ্গেই তোমার সদ্ভাব ছিল, কিন্তু তুমি হিন্দুর ছেলে থিয়সফিষ্ট হইলে; দুটি হিন্দু, দুটি মুসলমান, দুটি ক্রিশ্চিয়ান, দুটি বৌদ্ধ, একত্র হইয়া ভাবিলে আমরা সাম্প্রদায়িকতা চূর্ণ করিয়া সকল দেশের লোক

সকল ধর্ম্মের লোক একাসনে একত্রে বসিয়া কেমন ভ্রাতৃভাব করিলাম! কিন্তু ভাই! জিজ্ঞাসা করি তুমি যদি প্রকৃত হিন্দু হও, তবে কি গোঘাতক, গোভোজী ক্রিশ্চিয়ান, মুশলমানকে একাসনে বসাইয়া ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করিতে পার? তাহার করকম্পন করিবার পর কি হস্ত না ধুইয়া কাপড় না ছাড়িয়া আপনাকে পবিত্র মনে করিতে পার! যদি বল, পারি, তবে আমরা বলিব—তুমি জ্ঞানী হইতে পার, তুমি বিবেকী হইতে পার, তুমি যোগী হইতে পার, তুমি সিদ্ধ হইতে পার, তুমি মহাত্মা হইতে পার, কিন্তু "হিন্দু" হইতে পার না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাচরণ করাই শাস্ত্র সঙ্গত হিন্দুয়ানি। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপেক্ষা কারিগণকে হিন্দু সমাজ "হিন্দু" বলিয়া স্বীকার করেন না। আবার দেখ, তোমরা চারি ধর্ম্মের আটটি লোক সভ্য হইয়া ভ্রাতৃভাবে সভা করিলে; তোমার যে ভ্রাতৃভাবশক্তি বিন্দু বিন্দু শিশিরের ন্যায় বিস্তীর্ণ বিশ্বক্ষেত্রে

ব্যাপ্ত ছিল, আজ সেই বিন্দু রাশি ধীরে ধীরে নৈসর্গিক নিয়মে প্রত্যাহৃত হইয়া কূপ (সভা) মধ্যে একত্রিত হইল। এখন যে ব্যক্তি তোমার সভায় প্রবিষ্ট হইবে, সেই তোমার ভ্রাতৃভাবের সুধাসেবন-ভাগী হইবে। কিন্তু আমি তোমার সভার বাহিরের লোক, যখন তুমি থিয়সফিষ্ট ছিলে না, তখন তোমাকে থিয়সফির বিরুদ্ধে কোন রহস্য করিলে, তুমি হাঁসিয়া উঠিতে অথবা আমার মতের অনুমোদন করিতে। কিন্তু যে দিন হইতে থিয়সফিষ্ট হইলে, সেই দিনের পর যখন আমি তোমার সভার বিরুদ্ধে একটি কথা বলিয়াছি, অমনি তুমি জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় আমার উপর বিরূপ হইয়া উঠিয়াছ, এখন আমার মুখ দেখিতে বা আমার সহিত কথা কহিতেও তোমার ক্লেশ বা ঘৃণা বোধ হয়। ভাই! তুমি যে ইতিপূর্ব্বে আমাকে একটু ভাই ভাই ভাবিতে. এ কোথাকার " ভাইহুড্ " আনিয়া, এ গরিব ভাইটীকে লুট্ করিয়া দিলে ! দল বাঁধিলেই

বাহিরের সহানুভূতি হারাইতে হয়, এবং বাহিরের সমাজে সহানুভূতি ও সহযোগিতা করিতেও তত ইচ্ছা হয় না। বস্তুতঃ যাঁহারা ভ্রাতৃভাব, ও অসাম্প্রদায়িকতার পক্ষপাতী, তাঁহাদের সভা করিলে দল বাঁধিলে কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। যদি সকল দল ভাঙ্গিয়া এক করিতে চাও, তবে নিজের দলটি প্রথমেই ভাঙ্গিয়া ফেল। নতুবা পুরাতন দল ভাঙ্গিয়া একটি নূতন দল বাঁধিলে আর কি হইবে। যেদিন তোমার " আমার " বলিবার আর কিছু থাকিবে না, সেই দিন সকলই ও সকলেই তোমার ও তুমিও সকলের হইবে। আমরা (মানব সমাজ) অপূর্ণশক্তি সম্পন্ন, আমরা দল ভাঙ্গিতে গিয়া দল বাঁধিয়া বসি। এখন আমরা ঘরের ছেলে ঘরে বসিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিলেই ভারতের কল্যাণ। দলের উপর দল বাড়াইয়া বৃথা গৃহবিরোধ বাড়াইতেছি মাত্র। কোন সাম্প্রদায়ই যেন আমাদের উপর অসন্তুষ্ট না হয়েন। আমরা

দলাদলিতে মর্ম্মবেদনা পাইয়াই কথা গুলি লিখিলাম। যাহাতে পরস্পর বিরোধ কমিয়া আসে, তাহারই সদুপায় উদ্ভাবন করেন, ইহাই সর্ব্ব সম্প্রদায়ের কাছে প্রার্থনা।

নীতি-শিক্ষা।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষ চক্ষু থাকিতে অন্ধ, কর্ণ থাকিতে বধির, হস্ত পদ থাকিতে পঙ্গু ও জীবন থাকিতে মৃত। ভারত দেখিয়াও দেখিবে না, শুনিয়াও শুনিবে না, কার্য্য করিতে পারিলেও করিবেনা, বুঝিয়াও বুঝিবেনা, জাগিয়াও উঠিবেনা। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচন পূর্ব্বক ভবিষ্যদ্ভারতের চিন্তা করিলে চিন্তাশীল মহাত্মা মাত্রেরই চিত্ত চকিত হইয়া উঠে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দুই চারিটী উপাধি, কিছু ঐশ্বর্য্য ও রাজকীয় সম্মান সূচক দুই একটী পদবী লব্ধ হইলে বর্ত্তমান ভারত নিজ জন্ম সার্থক ও জীবন সফল মনে করেন। এ গুলি ভিন্ন

জীবনের অন্য কিছু বিশেষ কর্ত্তব্য আছে কি না তাহা চিন্তা করিবার অনেকেরই অবকাশ নাই। ভারত বাল্য-কালে জীবিতাশা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া বিশ্ব বিদ্যা-লয়ের নিয়মিত সঙ্কীর্ণ শিক্ষা-সোপানে আরোহণার্থ কঠোর পরিশ্রম সহ দিবানিশি যত্নবান্, পরীক্ষার ক্রমাগত কঠোর শ্রমে ক্লান্ত হইয়া ভারত যৌবনাবস্থায় প্রবেশ করিয়াই শিক্ষার অপেক্ষাকৃত উন্নত সোপানে অধিরোহণ করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া পড়েন, আরও অগ্রসর হইলে শিক্ষার যে দিব্য মনোহর মূর্ত্তি হইয়া থাকে, তাহা প্রায় অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠেনা। শীতার্ত্ত ব্যক্তি ইন্ধন আহরণ করিল, কিন্তু ভাগ্যদোষে যত্ন ও অবধানের অভাবে অগ্নিতাপ সেবন করিতে পাইল না। জীবনের গূঢ় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া কিরূপে কিছু ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, কি উপায়ে মান সম্ভ্রম বৃদ্ধি হয়, নব্য ভারত তজ্জন্য ক্ষিপ্ত প্রায়, বৃদ্ধগণ গত জীবনের সংস্কারের বশীভূত, অগত্যা তাঁহারাও শিক্ষার

পরম সুখাস্বাদে বঞ্চিত। বিনা চিকিৎসায় ও অসাবধানতায় ভারতের বিষম ব্যাধি বাড়িতে লাগিল—পরমায়ু সত্ত্বে বুঝি ভারতের আসন্ন কাল উপস্থিত।

ভারত নিবাসিগণ পুরাকালে ব্রহ্মচর্য্যের পরম সমাদর করিতেন। ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস না করিয়া তাঁহারা গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিতেন না। ব্রহ্মচর্য্যকালে তাঁহারা বিদ্যা, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি জীবনের অবশ্য-কর্ত্তব্য গুলি বিশেষ রূপে শিক্ষা করিয়া গুরু গৃহ হইতে লোক সমাজে প্রবিষ্ট হইতেন। এই ব্রহ্মচর্য্যের প্রথা যেদিন হইতে পুণ্য ভূমি ভারতবর্ষকে পরিত্যাগ করিয়াছে সেই দিন হইতেই ইহা দুর্ব্বলতা, দুরাগ্রহ, দুর্ব্ব্যবহার, ভ্রষ্টাচার, ভীরুতা, চপলতা, অব্যবস্থচিত্ততা আদি ক্ষীণতা ও মানসিক মলিনতার প্রধান নিকেতন হইয়া পড়িয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্যগণের প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি কালে বর্ণানুসারে ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি সমাজনীতি ও বিবিধ সাধারণ নীতি শিক্ষা পাইয়া ভারত বাসিগণ

তপোবল, ধর্ম্মবল, বিদ্যাবল, বাহুবল, বিত্তবল আদির গুণে জাতীয় প্রকৃতি লাভ করিয়া এতৎ পবিত্র ভূমিকে সভ্যসমাজের শিরোভূষণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর দোষে ও পিতা মাতা আদি গুরু গণের তত্ত্বাবধান ও যত্নের অভাবে সুকুমারমতি বালক বর্গ স্বেচ্ছাচার ও যথেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া সমাজকে কলঙ্কিত ও বিষম উপদ্রবগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে। পিতা মাতা সন্তানের শৈশব হইতেই যদি নীতিশিক্ষার দিকে মনোযোগী হয়েন, তবে তাহারা ও সন্তান গণ চিরসুখী হইতে পারেন ও সমাজও নিরুপদ্রব থাকে। প্রথম হইতেই বালকের হৃদয় যে উপাদানে গঠিত হইয়া যায় "বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাহা আপনা আপনিই সংশোধিত হইয়া যাইবে" পিতা মাতার এই বিষম ভ্রম দূর না হইলে ভারতের কল্যাণ নাই। পিতা মাতার ঔদাস্য ও উপেক্ষা বালকবর্গের অত্যন্ত অনিষ্ট সাধন করিতেছে। পিতা মাতা

যদি সন্তান হইতে সুখী হইতে ও সন্তানকে সুখী করিতে চাহেন, তবে আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া বালক গণের সুনীতি-শিক্ষার উপায় বিধান করুন। নীতি শিক্ষা প্রচুর পরিমাণে সাধারণ সমাজে প্রচলিত হইলে বৃথা কলহ, বিবাদ, বিসম্বাদ, অসভ্যতা, মূর্খতা, ধৃষ্টতা, ধূর্ত্ততা, কপটতা, প্রবঞ্চনা আদি সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়; বিচারালয়ে এত মিথ্যা অভিযোগ ও তজ্জন্য অনর্থা অর্থব্যয়ও হয় না, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার, বেশ্যালয়-গমন, মদ্যাদি সেবন জন্য মহাপাপ ও সমাজে দারিদ্র্য দুঃখ বৃদ্ধি হয় না, সামান্য প্রভুত্ব লাভের জন্য নরশোণিতে রণস্থল প্লাবিতও হয় না, অধিক কি সমাজ নিতান্ত নিরুপদ্রব হইয়া উঠে। নীতি শিক্ষা দ্বারা শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারা যায়। পারিবারিক, সামাজিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত সুখ স্বচ্ছন্দতাই সুনীতি-শিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে।

নৃত্য-গীত।

সেনাদিগের গতি ও কার্য্য যেমন সেনাপতির আজ্ঞার অপেক্ষা করিয়া থাকে, সেইরূপ শরীরের যন্ত্র সকলও মনের ইঙ্গিত ভিন্ন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না। মনঃ-প্রবৃত্তির অবস্থা ও গতি অনুসারে শারীরিক যন্ত্র সকলেরও কার্য্য প্রণালী স্বতন্ত্র ২ হইয়া থাকে। মনো মধ্যে একটী ভাব বা তরঙ্গের উচ্ছ্বাস উঠিলে তাহা শরীরের কোন না কোন যন্ত্র দ্বারা বহির্জগতেপ্রকাশিত হয়। শরীরের বহির্দৃশ্য মনোবৃত্তি-প্রবাহের স্থূল পরিচয়-চিহ্ন। মনে আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠিলে মুখের এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গের যেরূপ ভাবভঙ্গী প্রকাশিত হয়, ক্রোধ বা অভিমানের উদয় হইলে শরীরের বাহ্য-চিহ্ন আর সে রূপ দৃষ্ট হয় না। তত্তদ্বৃত্তির প্রকৃতি-ভেদে অঙ্গভঙ্গী স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে। যদি কোন ব্যক্তির সৎ হউক বা অসৎ হউক মনঃপ্রভাব অন্যের অপেক্ষা ঐকান্তিক ও অধিক প্রবল হয়, তবে তাহার

বহিরঙ্গের প্রকাশিত ভাবভঙ্গী নিকটস্থ দ্রষ্টার মনোমধ্যে পূর্ব্ব ব্যক্তির ভাবপ্রবাহ বহন করিয়া লইয়া যায় এবং তাহার দুর্ব্বল মনকে সেই ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। আমরা যদি একজন লোককে পুত্রশোকে কাতর হইয়া বিষণ্ণ বদনে বসিয়া থাকিতে দেখি, তবে মানবীয় সহানুভূতির বলে আমরাও সহজে বিষাদগ্রস্ত হইব। একজন লোক যদি অকপট মনে পরম উল্লাসে এক স্থানে বসিয়া উচ্চ হাস্য করিতে থাকে, তবে তাহার দিকে তাকাইলে দ্রষ্টার মনের বিষাদ-ভাব বিদূরিত হইয়া যায় এবং তাহার উল্লাসের তরঙ্গে মনও স্বয়ং আনন্দ অনুভব করিতে থাকে। মনের ভাব বিশেষের অনুকুল শরীরের যে ভঙ্গী, সঞ্চলন বা কম্পন বিশেষ, তাহাই প্রণালীবদ্ধ হইলে নৃত্য নামে অভিহিত হয়। মনের প্রবল উচ্ছ্বাস ভিন্ন শরীরের নৃত্য করিবার সামর্থ্য হয়না। নৃত্য নীরবে উপদেশ ব্যাখ্যান করিয়া থাকে। ভগবৎ-প্রেমে বিহ্বল হইয়া গৌরাঙ্গ যখন ভক্তগণ সঙ্গে নৃত্য

করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে অথবা তাহার প্রতি-কৃতি-দৃশ্য দর্শন করিলে মনোমধ্যে কি সেই উচ্চ প্রেমানন্দ-ভাবের উদয় হয় না? একজন লোক ধন সম্পত্তি পাইয়া নৃত্য করিতেছে, তাহা দেখিলে কি গৌরাঙ্গের ভাব মনোমধ্যে আসিতে পারে? একজন লোক দেবীর সম্মুখে ছাগ বলিদান দিয়া ছাগস্কন্ধে নৃত্য করিতেছে, তদ্দর্শনে কি মনে একটা বীভৎস—বীর-ভাবের উদয় হয় না? একজন বারবিলাসিনী কুৎসিত কামনাপূর্ণ চিত্তের তরঙ্গাঘাতে যে ভাবে নৃত্য করে, তাহা দর্শন করিলে কাহার মনে অপবিত্রতার উদয় না হয়? আবার ভাব-বিশেষকে উদয় করিবার জন্য সুর তালের সহযোগিতা লওয়া হইয়া থাকে। বাদ্যযন্ত্রে যে সুর বা তাল ক্রীড়িত হয়, তাহাও মনের ভাব-প্রবাহ মাত্র যন্ত্রের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া বাহ্য জগতে নিজ শক্তির বিস্তার করে। বাদ্যের গুণে মনুষ্যকে হাসাইতে, কাঁদাইতে, নাচাইতে, মাতাইতে ও লুটাইতে পারে।

বাদ্য মনুষ্যকে ভক্ত, বীরমদে মত্ত, জ্ঞানগম্ভীর চিত্ত, প্রেম সুধাসিক্ত অথবা বৃথামোদযুক্ত করিতে সমর্থ হয়।

গীতও কণ্ঠের নর্ত্তন মাত্র। হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, উদাত্ত অনুদাত্ত, স্বরিৎ স্বরের প্রকার ও প্রয়োগ ভেদে গীত ভিন্ন২ ভাবে মনোবৃত্তি-প্রবাহকে বহির্জগতে আনয়ন করে। প্রাতঃ, সন্ধ্যা, রাত্রি ইত্যাকার সময় ভেদে, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা আদি ঋতুভেদে মনোভাবেরও তারতম্য ও ভিন্নতা হইয়া থাকে। তদনুসারে মনঃ-প্রকৃতির অনুকুল তত্তৎ সময়োপযোগী সুরেরও সৃষ্টি হইয়াছে। সময়ানুকুল সুরে গীত গাইতে পারিলে বড় মধুর লাগে অর্থাৎ উহা মনোবৃত্তির অনুকুল হয়। সংগীতে ভাব ব্যাখ্যা করিবার সময় ভাবের প্রকৃতির দিকে রচয়িতার দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। সাত্বিক ভাব প্রকাশ বা উদ্দীপনার সময় গম্ভীর বা মধুর সাত্বিকী ভাষার প্রয়োগ সহ তদনুকূল সুরে গান রচনা করা বিধেয়। দাশরথি গান বাঁধিলেন, "জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে

ঘরে"। সাত্ত্বিক ভাবের উদয় করাই দাশরথির উদ্দেশ্য, কিন্তু রচনার ভাষায় রাজস ভাবের স্রোত উদ্গারিত হইতেছে, সুতরাং শ্রোতার মনে সত্ত্বগুণের উদয় করিয়া দিবার গীতটীর তাদৃশ শক্তি নাই। সুর অনুসারে ভাবেরও উদ্ভাবনা হইয়া থাকে। কীর্ত্তনের সুরে যেমন ভক্তির গান রচিত হয় এবং তাহাতে শ্রোতার অন্তঃকরণে যে ভাবসুধা বর্ষণ করে, মল্লার রাগে সেই গান রচিত হইলে শ্রোতার হৃদয়ে সে ভাব কখনই প্রবেশ করিতে পারেনা। স্বর-তত্ত্বানভিজ্ঞ লোকেই আজকাল ইংরাজী সুরে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়া মনুষ্যসমাজে কুরুচির পরিচয় দিয়া থাকে। সুর, তাল, গান, মান ও নৃত্য আদি ভাবের স্বশ্রেণি ভুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। নৃত্য গীতাদিতে যে মোহিনী শক্তি (Mesmeric power) আছে, তাহার প্রকৃততঃ প্রয়োগ হইলে জগতের বিশেষ কল্যাণ হইতে পারে। কিন্তু আজ কাল অনভিজ্ঞতা মনুষ্যসমাজকে বিশেষতঃ আমাদের ভারতীয়

বর্ত্তমান সমাজকে বিষম বিভ্রাটে ফেলিয়াছে। টপ্পার সুরে যোগের গান বাঁধিয়া তৈল ও জলে মিশাইতে চেষ্টা করিয়াছে। তৈলমিশ্রিত জলপাত্রে জলপান করা যেমন অসম্ভব অর্থাৎ জল খাইবার আগে তৈল খাইতে হয়, সেইরূপ অপবিত্র ভাবোদ্দীপক ঠুংরী সুরে ভক্তির গান গাইতে গেলে ভক্তির উদয় হউক বা না হউক, কুৎসিত ভাবে হৃদয়তন্ত্রি অগ্রেই নাচিয়া উঠিবে। বর্ত্তমান সমাজের রুচি এত বিকৃত ও বিশৃঙ্খল, যে একজন বুদ্ধিমান্ তদ্দর্শনে সমাজকে বাতুলতারোগ গ্রস্ত মনে করিতে পারেন। গায়কের সঙ্গে ২ বাদ্যের তাল মান না মিলিলে যেমন শ্রুতিকটু বলিয়া বোধ হয়, বর্ত্তমান সমাজের নৃত্য গীতের ব্যবস্থা দেখিয়া তাদৃশ উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া অনুমিত হয়। বাসরঘরে যদি কেহ, "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" এই গীতটী গান করে, সে যেমন তথাকার রমণীমণ্ডলী কর্ত্তৃক উপহসিত হয়, ভগবতীর সৌম্য মূর্ত্তি জগদ্ধাত্রী পূজার দিন দেবী

সমক্ষে বাই ও তয়ফা নাচও সাধুসমাজে তাদৃশ নিন্দিত। নৃত্য গীতকে আর্য্যধর্ম্মিগণ কখনও অনাদর করিতে পারিবেন না, কেননা তাঁহারা দেবরাজ ইন্দ্রের সভাতেও অপ্সরীর নাচের অবতারণা দেখিতেছেন। আমোদ-সূচক ঘটনা বিশেষে এরূপ নৃত্য শোভা পায় বটে, কিন্তু যে দিন ভক্তি, জ্ঞান ও মুমুক্ষুতার প্রার্থী হইয়া দেবীর আরাধনা করিতেছি, সেদিন কি তাঁহার সমক্ষে অপবিত্র ভাবোদ্দীপক নৃত্য গীতাদির অবতারণা করিলে ভাব-রাজ্যে বিষম সমরানল প্রজ্জ্বলিত হয় না? সেদিনের ক্রিয়া কাণ্ড সমস্তই বিফল ও পণ্ড হইয়া যায়। পূজার দিনে দেবতার সমক্ষে সাধুভাব-উদ্দীপক নৃত্যগীত হওয়া আবশ্যক। এই জন্য বলি, বর্ত্তমান সমাজ যেন বাতুলের ন্যায় বেসুরে ও বেতালে প্রলাপগান করি-তেছে। ভাবের অনুকূল নৃত্য ও গীত যাহাতে আমা-দের সমাজে প্রচলিত হয়, তজ্জন্য বর্ত্তমান চিন্তাশীল সমাজের বিশেষ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ

আমরা আজ কাল যেরূপ দুর্ব্বল প্রকৃতি, নিরুদ্যম ও মৃদুস্বভাব হইয়া পড়িয়াছি, তাহাতে অপবিত্র নৃত্য গীতের অভিনয় যত না হয় ততই মঙ্গল। এক্ষণে উন্নত ও পবিত্র ভাব ভারতে অভিনীত হইতে থাকুক।

তীর্থোৎসব।

তীর্থ পর্য্যটন করা কুসংস্কার, সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরকে দর্শন করিবার জন্য নিজগৃহ পরিবার পরিত্যাগ করিয়া দূরাদ্দূরতরদেশান্তবর্ত্তী তীর্থে গমন করা অজ্ঞানের কার্য্য, এরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের মত খণ্ডন করিবার জন্য অদ্য আমরা অগ্রসর নহি। পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে অগণ্য তীর্থ বিরাজমান। ঋষিগণ, সাধুগণ অথবা চতুরাশ্রমের সমস্ত লোকই আর্য্যধর্ম্মের জয়-পতাকা হস্তে করিয়া চিরদিন এতাবত্তীর্থ পর্য্যটন করিতেন এবং গগণ-ভেদী স্বরে তত্তাবতের মহিমা ঘোষণা করিতে ত্রুটি করিতেন না। তীর্থস্থানে দেব দর্শন, স্নান, দান পূজা আদি নিতান্ত পুণ্যকর, ইহা আর্য্যধর্ম্মী মাত্রেরই

চিরসংস্কার। যে স্থানে কোন দেবতা বা কোন ঋষি কোন মহাযজ্ঞ বা কোন লোককল্যাণকর কার্য্য অথবা কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেই সকল পুণ্য-ভূমি মাত্রই—উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গেই হউক বা দুর্গম বন-মধ্যেই হউক, জনাকীর্ণ নগরীর মধ্যেই হউক, অথবা ফেণিল নীল নীর তরঙ্গাহত সমুদ্র কূলেই হউক, তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তীর্থস্থান সকল সামান্য ভূমি ব্যতীত আর কিছুই ছিলনা সত্য, কিন্তু তত্রানুষ্ঠিত কার্য্য প্রভাবে ও অনুষ্ঠাতাগণের তেজঃপ্রভাবে সেই সকল স্থানের প্রকৃতি অতীব পবিত্রতাময়ী হইয়া উঠিয়াছে। সাধু এবং অসাধু ভাবের—কার্য্যের—অনুষ্ঠানের এমনই একটী অনির্ব্বচনীয় শক্তি আছে যে তাহা দ্বারা স্থানীয় প্রকৃতির পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া যায়! সাধুগণের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে ও ফুৎকারে, নেত্রপাতে ও অঙ্গুলীর ইঙ্গিতেও স্থানীয় প্রকৃতি সাধুতার সৌগন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। যাঁহার আত্মা যে পরিমাণে ব্রহ্মভাবাপন্ন,

তাঁহার প্রভাব সেই পরিমাণে নিজ বিরাজভূমিতে বিকীর্ণ হইয়া অবিচলিত ভাবে স্থিতি করিতে থাকে। সাংসারিকী কোন সামান্য শক্তি তাহাকে বিতাড়িত বা বিদূরিত করিতে পারে না। বরং বিষয়বুদ্ধি-বিমূঢ় মনুষ্যগণ নিজ২ মলিন ভাব লইয়া সেই২ স্থানে গমন করিলে তত্তৎ স্থান-বিকীর্ণ পবিত্র শক্তির দ্বারা হৃদয়ের পবিত্রতা লাভ করিতে পারে। তীর্থ স্থানে গমন করিলে প্রাসঙ্গিক সমস্ত ঘটনাবলী স্মরণ-পথে উদিত হয়। অর্থাৎ যে তীর্থে যে মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল ও যে দেবতা বা মহাত্মা সেই কার্য্যের সূচনা করিয়াছিলেন, সেই সকল অতীত বার্ত্তা হৃদয়ে প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইতে থাকে এবং তীর্থাগত ব্যক্তির মনকে নবীন ভাবে জাগ্রত করিয়া দেয়। তাঁহার কলুষিত চিত্তকে প্রাচীন পুণ্যকীর্ত্তি-প্রণিধানে উন্মত্ত করিয়া দেয়। তিনি যেন পুণ্যসুধাসিন্ধু-নীরে অবগাহন করিয়া থাকেন। তাঁহার মন যেন যাবদ্-যাতনা ও বিড়ম্বনাপূর্ণ বর্ত্তমান সংসার-কোলাহল

হইতে অবসর পাইয়া অতীতের শান্তিপূর্ণ ক্রোড়ে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। তিনি যেন তখন আর এক জন হইয়া উঠেন। তীর্থ নিদ্রিতকে জাগ্রত করিতে পারে, দুর্ব্বলকে বলবান্ করিতে পারে, শোকসন্তপ্তকে সুশীতল করিতে পারে ও পতিতকে উদ্ধার করিতে পারে।

পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার মহাযজ্ঞানুষ্ঠান-কাহিনী পুরাণের কোন্ পুরাতন জীর্ণ পত্রে লিপিবদ্ধ আছে, গহন কাননের কুটির পরিত্যাগ করিয়া, নিভৃত গিরিকন্দর পরিহার করিয়া কত মহাতেজা তাপস গণ সেই যজ্ঞে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুরূপ গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী পিতামহের অলঙ্ঘ্য আদেশ পাইয়া প্রয়াগে একত্র হইয়াছিলেন, তাহা আজ লোকের চক্ষে অমূলক উপন্যাস হইতে পারে, কিন্তু ত্রিবেণীতে এখনও সেই মহামহোৎসবের দুন্দুভি ধ্বনির বিরাম হয় নাই। এখনও ভারতের দিগ্‌দিগন্ত হইতে গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী রাশি ২ লোক মাঘমাসে কল্পবাস ও স্নান করিবার জন্য সমাগত

হইতেছে। সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন নাই, রাজকীয় ডিণ্ডিম নাই, অথচ চারিদিকের লোক আসিয়া প্রয়াগে ত্রিবেণীতীর ছাইয়া ফেলিল। শীত বাতে শরীর কম্পিত, তথাচ বৃদ্ধ বৃদ্ধা প্রাতঃস্নানে দৌড়িয়াছে। যাহাদের অঙ্গে বাহিরের বায়ুও স্পর্শ করিত না, আজ সেই কুলনারীগণও ত্রিবেণীর অভিমুখে ধাবিত। যে সকল লোক গৃহ প্রাচীরকেই পৃথিবীর শেষ জানিত, তাহারাও বিনা আমন্ত্রণে ত্রিবেণীতীরে পৌঁছিয়াছে। হয় তো অনেকে বলিবেন এই কৃচ্ছ্র সাধ্য তীর্থ-স্নান-বিধি যত শীঘ্র উঠিয়া যায়, ততই কল্যাণ এবং ধর্ম্ম সুখসেব্য ও আধ্যাত্মিক সাধনের সামগ্রী হওয়া উচিত। আমরা এমতের শেষাংশ টুকুর বিরোধী না হইলেও ধর্ম্মকে সুখ ও দুঃখের উভয় অবস্থারই অনুষ্ঠেয় এবং বাহ্য ও আভ্যন্তরিক উভয় বৃত্তিরই গম্য বলিয়া স্বীকার করি।

মন ইন্দ্রিয়গণের সহায়তায় সদাই বহির্জগতে বিচরণ করিতে ভাল বাসে। সর্ব্বদা সংযত ভাবে ব্রহ্মানুধ্যানে

তাহার প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং অন্তর্জগতে স্বীয় বৃত্তি নিবিষ্ট রাখা চঞ্চল মনের নিতান্ত অসম্ভব। মন যে পরমাত্মার প্রতি বিমুখ হইয়া সংসারের সমস্ত ভোগা-শয়ে আমোদ অনুভব করে, আর্য্য ঋষি গণের ব্যবস্থা-কৌশলে সেই সমস্ত ব্যাপারেই ব্রহ্মভাবের অবতারণা করা হইয়াছে। তুমি বৃক্ষ দেখ, শৃগাল দেখ, পক্ষী দেখ, তাহার মধ্যে ব্রহ্ম ভাব; তুমি গো দেখ, লোষ্ট্র দেখ, নদী দেখ, তাহার মধ্যে ব্রহ্ম ভাব; তুমি স্নান কর, ভোজন কর, বা উপবেশন কর, তাহার মধ্যে ব্রহ্ম ভাব। মন যখন এই রূপ আর্য্য ঋষিদের নির্দ্দেশে যথা তথা ও যখন তখন অন্তর্জগৎ নিহিত ব্রহ্মভাবের ন্যায় বহির্জগতেও ব্রহ্মভাব দর্শন করিতে থাকিবে, তখন মনের ভোগ-ভূমি ফুরাইয়া আসিবে। তখন সে আপনা আপনিই নিজ নিকেতনে প্রতিনিবৃত্ত হইবে—শান্তিনিকেতনে সুধারাশি পান করিতে থাকিবে। কৃচ্ছ্র সাধন ব্যতীত আমাদের অশান্ত

চিত্ত সহজে ভোগ-বিলাস হইতে বিমুখ হইতে চায়না। আবার বিষয় বিলাসে বৈরাগ্য ব্যতীতও বিমল ব্রহ্মানন্দ অনুভবের দ্বিতীয় উপায় নাই। কৃচ্ছ্র ব্রত আদি সাধন সকলকে কুসংস্কার বলিয়া মনে রাখাও একটী কুসংস্কার।

গ্রহ নক্ষত্রের লগ্ন বিশেষে পবিত্র সমাগমকে "যোগ" বলে। এই যোগোপলক্ষে গঙ্গা বা নর্ম্মদা, ত্রিবেণী আদিতে স্নান করিলে শরীর ও মনের সাত্ত্বিক সাধনানুকূল শক্তি সকলের বিকাশ ও পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে। এই জন্য ব্রহ্মসুধারস লিপ্সু আর্য্যগণ অনুকূল উপায় সকলের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ যোগ বা পর্ব্বোপলক্ষে বিশেষ২ তীর্থ স্থানে মহাসমারোহ ও উৎসব হইয়া থাকে। গৃহকর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক তীর্থস্থানে ত্রিরাত্রি বা একমাস বা চিরকাল বাসের বিধি আছে। উৎসব কালে অন্ততঃ ত্রিরাত্রিও বাস করিবে। বিষয় সম্পার্ক শূন্য পবিত্র তীর্থস্থানে যদি বিষয়ী লোক

ত্রিরাত্রিও বাস করে এবং তথায় স্নান, দান, পূঁজা, পাঠ, দেব-দর্শনাদি করিতে থাকে. তবে তাহার বৈষয়িক বৃত্তি ও ভোগ-পিপাসা যে অন্তঃকরণ হইতে অনেক অপসারিত হইয়া যায়, তাহার আর সন্দেহ কি ? বিশেষতঃ পর্ব্বো-পলক্ষে তত্তৎ স্থানে অনেক পরিব্রাজক সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। তাঁহাদিগের বিষয় বৈরাগ্য-বিস্ফারিত আদর্শ দর্শনে. তীর্থযাত্রী গণের মনে কি সাংসারিক ঔদাস্য উদয় হয় না ? তাঁহাদিগের কষ্টসহিষ্ণু প্রকৃতির কঠোর তপোনুষ্ঠানের বিচিত্র চিত্র দর্শনে কি বিষয়ীর মনে বিলাস-ভোগের প্রতি ধিক্কার হয় না ? তাঁহাদিগের স্বর্গীয় জ্যোতিঃপরিপূর্ণ মুখারবিন্দ হইতে অমৃত মাখা ভগবদ্গুণানুবাদ ও জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিলে কি নিদ্রিত বিষয়ীর হৃদয় জাগ্রত হয় না ? তাঁহাদিগের প্রেমাশ্রু পূর্ণ ধ্যানস্তিমিত নেত্র দর্শন করিলে কি অন্ধ তমসাচ্ছন্ন মানবের মনশ্চক্ষুঃ উন্মীলিত হয় না ? বস্তুতঃ সর্ব্বদা বিষয়-ভোগ-বিলাসী গৃহস্থ গণ তীর্থক্ষেত্রে আসিয়া

বিশেষ লাভবান্ হইয়া থাকে। তাহারা গাত্র-মল-মার্জ্জনের সঙ্গে২ মনোমালিন্য ধৌত করিবারও অনেক অবসর পায়। দেশ বিদেশ হইতে সমাগত বহুল লোকের সহিত সাধুভাবে মিলিতে সক্ষম হয়। ভিন্ন২ ভাষা, ভাব, রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, অনেক পরিমাণে জানিবার সুযোগ হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশ-জাত শিল্প চাতুরীর পরিচয় পাওয়া যায়।

তীর্থস্থানই আমাদের আশ্চর্য্য কৌশল-পূর্ণ-মিলন ভূমি। যদি উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম সমগ্র ভারতকে একত্র দেখিতে চাও, তবে তীর্থস্থানে গমন কর। যদি ভিন্ন২ দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে চাও, তবে তীর্থস্থান দর্শন কর। যদি দেশ দেশান্তরের পণ্যবীথিকা ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী দেখিতে চাও, তবে তীর্থ দর্শন করিতে যাত্রা কর। যদি দেশোন্নতিকর কোন গুহ্য কথা মুহূর্ত্ত মধ্যে ভারতের সর্ব্বদেশে প্রচার করিতে চাও, তবে তীর্থোৎসবে উপ-

স্থিত হইয়া তাহা ঘোষণা কর। বর্ত্তমান কালে সুশিক্ষিত লোক সকল তীর্থোৎসবে উপস্থিত থাকা কুসংস্কার মনে করেন। কিন্তু আমরা বলি তীর্থস্থান শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই গুরুতর কার্য্য সাধনের লীলা ভূমি। বক্তাগণ! পণ্ডিত গণ! দেশহিতৈষী বিচক্ষণ গণ! মন্ত্রণা নিপুণ উপদেষ্টাগণ! যদি ভারতে কোন প্রকৃত কার্য্যসাধন করিতে চাও, যদি এক ইঙ্গিতে ভারতকে উন্মত্ত করিতে চাও, যদি সমস্ত ভারত একত্র বদ্ধপরিকর হইয়া কোন কঠোর গুহ্য মন্ত্র সাধন করিতে চাও, তবে তীর্থস্থানে সমাগত হও। তীর্থোৎসবকে আর্য্যদিগের প্রতিভাকাল-সুলভ পুনর্নবীভূত করিয়া তোল। হরিহরক্ষেত্র, কাশী, প্রয়াগ, পুষ্কর, হরিদ্বার প্রভৃতি পবিত্র তীর্থ সকলে যে মধ্যে২ পর্ব্বোপলক্ষে মহামেলা হইয়া থাকে, তত্তৎকালে কোন২ গুরুতর বিষয় আন্দোলন করিবার জন্য, মহা২ সভার আহ্বান করিবার জন্য, তাহার পূর্ব্ব হইতেই সম্বাদপত্র সকলে ঘোষণা করা হউক। দেশ দেশান্তর

হইতে অশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত সকল লোক আসিয়া ধর্ম্মক্ষেত্রে সাধুভাবে সম্মিলিত হউন। পর্ব্বোৎসবের যথা বিহিত কার্য্য সমাপনান্তে সভা সকলের অধিবেশন হউক। মুহূর্ত্ত মধ্যে মহারোলে সভার গুরুতর উদ্দেশ্য ভারতের চারিদিকে বায়ুবেগে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িবে। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ, রাজা, মহারাজগণ ও সাধারণ বিষয়ী গণ আসিয়া একত্রিত হইতেন এবং ঋষিগণ সকলকে ভক্তি, জ্ঞান, ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির অনেক উপদেশ দান করিতেন এবং তদ্দ্বারা ভারতের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইত। ভারতে পুনর্ব্বার তীর্থোৎসবের ভেরী বাজিয়া আবার ভারতকে মৈত্রী-সূত্রে আবদ্ধ করুক। তীর্থোৎসব আবার ভারতের ধর্ম্ম ও নীতি-প্রচারের মহা সমারোহ ক্ষেত্র হউক। তীর্থোৎসব প্রকৃত কার্য্যভূমি হউক। তীর্থোৎসবে ভগবানের দিব্য আবির্ভাব দর্শন করিয়া সন্তপ্ত ভারতের প্রাণ পুনর্ব্বার সন্তৃপ্ত হউক।

এবমস্তু।

ধর্ম্মসাধনের প্রয়োজন কি ?

যদি প্রত্যেক মনুষ্যকে জিজ্ঞাসা করা যায়, যে তুমি আপনার সাধ্যমত যত্ন সহকারে যে সকল কার্য্য করিতেছ, যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান জন্য সদা সত্বরপদে অগ্রসর হইতেছ, যে সকল কার্য্য সম্পাদনে স্বয়ং অপারগ বিবেচনায় অপরের সহায়তা প্রার্থনা করিতেছ, যে সমুদয় কার্য্য সংসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া সংকল্প সিদ্ধ করিতে না পারিলে তোমার অবসাদের সীমা থাকে না, যে সকল কার্য্য তোমার চিত্তরঞ্জন ও ফলদায়ক বলিয়া বোধ হইতেছে ও সুযোগসংযোগে তদনুষ্ঠানে রত হইবে বাসনা করিতেছ, সেই সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য কি ? তাহা হইলে বোধ করি প্রত্যেকেই স্ব স্ব সংকল্পের মূলানুসন্ধান করত মুক্তকণ্ঠে এক বাক্যে এই বলিবেন যে, আমাদের প্রত্যেকের প্রত্যেক কার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য—সুখ, শান্তি

আনন্দ লাভ। ইহা ভিন্ন বোধ করি কেহই কোন কথা বলিতে অভিলাষ করেন না। জীবমাত্রেই সুখ চায়, শান্তি চায়, ও আনন্দ চায়। যে সকল কার্য্যে যাহার অভীপ্সিত সুখ আনন্দাদি নাই, সে কখনই তৎকার্য্যাচরণে প্রবৃত্ত হয় না। সুখ ও আনন্দলাভ-লোলুপ হইয়া বিপুল বিত্ত বিভবের উপার্জ্জনোদ্দেশে কেহ উর্ব্বরা ক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ক্রমে কর্ষণ করত প্রচুর শস্যোৎপাদন-লালসায় কৃষিকার্য্যের সমুন্নতি সাধন করিতেছেন, কেহ অর্ণবযানারোহণে একদেশ হইতে দেশান্তরে গিয়া বাণিজ্য ব্যবসা দ্বারা স্বার্থসাধনের জন্য নদনদী সাগর মহাসাগরাদি অতিক্রম করিতে নির্ভয় চিত্তে অগ্রসর হইতেছেন, কেহ প্রভুপদ পরিসেবন-পরায়ণ হইয়া দাস্যবৃত্তিকে অবলম্বন করিতেছেন, কেহ কুসীদলাভার্থে উত্তমর্ণ হইয়া কেহ বা দস্যু বৃত্তি দ্বারা ধনাহরণ করিতেছে, এইরূপ বিবিধোপায়ে ধন হইতে সুখ ও আনন্দ প্রাপ্তির আশায় অনেকেই আগ্রহ সহকারে

যত্নপর হইয়া মনঃসংকল্প সাধনের বশবর্ত্তী হইতেছেন। কেহ বা সুখী হইবার জন্য সামাজিক নানাবিধ মঙ্গলকর ও স্বীয় সম্ভ্রমসূচক ক্রিয়া কলাপ দ্বারা যশোরাশি সঞ্চয় করিতেছেন; কেহ বা আত্মপ্রশংসায় এবং জ্ঞান লাভ ও জ্ঞান প্রচার দ্বারা সুখাশা করিয়া বিবিধবিদ্যা বিশারদ হইবার মানসে দিবানিশি অধ্যয়ন-পরায়ণ থাকিয়া মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিতেছেন; কেহ বা সুখের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া সমাজসংস্কারে অবিরত রত হইতেছেন; কেহ বা সাধারণ জন সমাজে খ্যাত্যাপন্ন হইয়া অথবা পরোপকার সাধন দ্বারা পরমসুখলাভ করিবার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, রাজ পথ নির্ম্মাণ, পান্থ নিবাস প্রস্তুত, পুষ্করিণী খনন আদি বহুব্যয়সাধ্য কার্য্য কলাপে হস্তক্ষেপ করিতেছেন; কেহ বা ধন, বস্ত্র ভূমি আদি দান দ্বারা পুণ্য পুঞ্জ সঞ্চয়ে পারলৌকিক সুখের প্রত্যাশায় কাল হরণ করিতেছেন; কেহ সুখী হইবার একান্ত বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া পিতামাতা

স্ত্রী পুত্রাদি বহুপরিবারে পরিবৃত থাকিতে স্থিরসংকল্প হইয়াছেন; কেহ বা আবার সেই সুখের জন্যই লোক-সমাজ ত্যাগ করিয়া বিজন বাস বাসনা করিতেছেন। কেহ রূপলাবণ্যবতী যুবতী-সমাগমে বাঞ্ছিত সুখের আশা করিয়া নৃত্য করিতেছেন; কেহ বা কামিনী-পাণিপীড়নে বীতরাগ হইয়া চিরকৌমার্য্য ব্রতাবলম্বন দ্বারা অশেষ সুখশান্তি আনন্দের আশা করত জীবন যাপন করিতেছেন; কেহ বা সুতাদির সুকুমার বদনারবিন্দ সন্দর্শন দ্বারা সুখাশা পূর্ণ করিবার মানসে প্রফুল্ল হইতেছেন; কেহ বা কুৎসিত ইন্দ্রিয়াদি জনিত ভোগ-সুখই প্রার্থিত সুখ স্থির করিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইতেছেন; কেহ বা অঙ্গরাগ-লাবণ্য জন্য দেহের সৌকুমার্য্য ও মনোহর দৃশ্য পরম সুখকর বোধ করিতেছেন; কেহ বা বৃথা ক্রীড়ামোদ প্রমোদাদিই সুখদায়ক নিরূপণ করিয়া সদাই তাহাতে রত ও কেহ বা সাগরাম্বরা বসুন্ধরাকে স্বীয় আধিপত্যের অধীন

করিবার নিমিত্ত যমরাষ্ট্র বিবর্দ্ধন প্রচণ্ড সমরানলশিখায় শত শত জীবের জীবন আহুতি দিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এই রূপ সকলেই কোন না কোন কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা পরম পরিতোষের প্রত্যাশা করিতেছেন।

যদি এই অবকাশে সকলকেই জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তাঁহারা কিরূপ সুখ প্রার্থনা করেন। ক্ষণকাল বা কিছুদিনের জন্য? অথবা নিরবচ্ছিন্ন অনন্তকালের জন্য? তাহা হইলে বোধ হয় "ক্ষণ জন্য" একথা কাহারও বদন বিবর হইতে বিনির্গত হইবে না।

সুখ দুই প্রকার। প্রথম, বিষয়ানুগত বা কারণিক, অর্থাৎ জাত পদার্থপুঞ্জ হইতে উদিত বা লব্ধ যে সুখ, যথা পুত্রমুখ-দর্শনে সুখ, ধনলাভে সুখ, সম্মান লাভে সুখ ইত্যাদি। দ্বিতীয়, বিষয়াতীত বা অকারণিক অর্থাৎ অজাত বস্তু বিশেষ হইতে প্রাপ্ত যে, অপূর্ব্ব সুখ। প্রথম ও দ্বিতীয়বিধ সুখে প্রভেদ এই যে, যদি কোন সুখ কোন জাত বা সৃষ্টবস্তু হইতে উদয় হইয়া থাকে, তবে তাহা

ক্ষণ বা কিছু দিনের জন্য ; কেনা তাহার বিনাশ আছে। কারণ সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই বিনশ্বর সুতরাং তদনুগত সুখও বিনশ্বর ও অকিঞ্চিৎকর। যথা পুত্রমুখ-দর্শনে সুখোদয় হইলে পুত্রের মৃত্যুতে দুঃখ সম্ভাবনা, যদি ধনলাভে আনন্দ হয়, তবে ধনক্ষয়ে কখনই সুখের আশা নাই। অতএব যাবতীয় পদার্থানুগত সুখই চিরদিনের সুখ হইতে পারে না। দ্বিতীয় বিষয়াতীত ব্রহ্মানুগত পরম সুখ, এ সুখের অবচ্ছেদ বা শেষ অথবা বিনাশ হইতে পারে না, কেননা, কার্য্যকারণাতীত, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের বিচ্ছেদ, অন্ত বা বিনাশ নাই। সুতরাং ভগবদানন্দের পরম সুখকরী অবস্থাই চিরন্তন বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতেছে। ইতি পূর্ব্বে বিচার করা হইয়াছে যে অচিরস্থায়ী সুখের কেহই প্রত্যাশা করে না। অনন্ত সুখই সকলে চায়। সেই পরমানন্দই একান্ত প্রার্থনীয়, ইহাই সকলের চিরবাঞ্ছিত। এই সুখের জন্যই জীব লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা

করিতে পারেন যে,যদি সকল লোকেই সেই নিরবচ্ছিন্ন চিরন্তন সুখের আশাপথের পান্থ, তবে ক্ষণভঙ্গুর বিষয়-বিশেষে, মনোনিবেশ করিয়া সামান্য সুখ রসাস্বাদন করিতে সকলের এত আগ্রহ দেখা যায় কেন ? এতদুত্তরে এইমাত্র বলিলেই বোধ করি প্রচুর হইবে যে, যদি কোন দেশ-কলের অবস্থানভিজ্ঞ ব্যক্তি কোন দেশে অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া তাহার কোন দ্রব্যবিশেষ ক্রয় করিবার আবশ্যক হয়, অথচ সে দেশের কোন স্থানে কাহার কাছে সেই দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা না জানে, তবে হয় তো সে ব্যক্তি বহুবার এরূপ স্থানে উপস্থিত হইবে যে সেখানে সে দ্রব্য পাওয়া সুকঠিন। এখানে তাহার অনভিজ্ঞতাই সেই অপ্রয়োজনীয় স্থান সমূহ পর্য্যটন করিবার একমাত্র কারণ বলিতে হইবে। যদি কোন সদয় হৃদয় ব্যক্তি তাহাকে তাহার উদ্দিষ্ট স্থানের নিদর্শন প্রদর্শন করেন অথবা সে আপনিই বহু অনুসন্ধানের পর অভীপ্সিত স্থান ও প্রয়োজনীয়

দ্রব্য প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার পূর্ব্বগত স্থান সমূহে ভ্রমণ করা বৃথা হইয়াছে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে এবং তাহার আশার ফল-প্রাপ্তিতে অতুল সুখী হইবে। জীব মাত্রেই সেইরূপ চির প্রার্থিত পরম সুখ অনন্তকালের জন্য সম্ভোগ করিবার নিমিত্ত একান্ত অনুসন্ধিৎসু হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু ঐ বাঞ্ছিত বস্তু কোথায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহা জানিতে না পারিয়াই এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে তাহার অন্বেষণ করিতেছে। ধনেতে সেই বাঞ্ছিত সুখ পাওয়া যাইবে ভাবিয়া বিবিধ কার্য্য সংসাধন পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জনে নিরত হইল, প্রাপ্ত অর্থে মনঃসন্তোষ পাইল না; এজন্য বহু ধনের আশা বলবতী হইল, তাহাতেও মনোমত সুখ জন্মিল না, আরও ধন আবশ্যক বোধ হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে যদি কেহ ভোগ্য বস্তুর চরম সীমায় উপস্থিত হয়, তথাচ জীব তাহাতে অসীম অনন্তকাল-ব্যাপী সুখ সমাগমে সমর্থ হইতে পারে না, কারণ সৃষ্ট

বস্তু মাত্রেরই ইয়ত্তা আছে। হয় তো কেহ ভোগ্য বস্তুর সীমা না পাইয়াই কলেবর পরিহার করিল। বিবেচনা কর, যদি কোন ব্যক্তি চিরজীবীও হয়েন, তথাচ বিবিধ ভোগ্য বিষয় হইতে তাঁহার মনের মত আনন্দ লাভের সম্ভাবনা নাই. কেননা ক্রমে ক্রমে একটীর পর আর একটী, এইরূপ সকল বস্তুরই চরম সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াও কোন মতেই অভিলষিত ফল-লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। যত দিন মনের আহার ক্ষেত্র রূপ জগদ্বস্তু-পরম্পরা অনুভূত হইবে, তত দিন সেই সকল ক্রমান্বয়ে ভোগ করিতে থাকিবে এবং উপস্থিত ও প্রাপ্ত বিষয়টীতে সুখ নাই ভাবিয়া ভবিষ্যৎ অপ্রাপ্ত বিষয়ে মন চালনা করিয়া সুখী হইবার আশা করিবে। অতঃপর তাবৎ ভোগ্য বিষয়ের সীমাবসান হইলে, আর উপায় নাই, কোথায় যাইবে, এত দিন ভোগ করিয়াও কৈ আশা পূর্ণ হইল না, সুখের সন্ধান মাত্রও পাওয়া গেল না, যাহার জন্য জীবন ক্ষীণ হইল,

তাহার বিন্দু মাত্র আস্বাদ করিবার সুযোগ হইল না; কেবল লক্ষ্য বস্তুর অনুসন্ধান করিতে করিতেই কাল অতিবাহিত হইল। এক্ষণে বিচার দ্বারা উত্তম প্রতীতি জন্মিতেছে যে, আমরা জগতীয় যে কোন বস্তু হইতেই আমাদের চিরবাঞ্ছিত সুখের আশা করি না কেন, কিছুতে আমাদের চিত্তক্ষেত্র বিচিত্র পবিত্রানন্দ-পয়োধিপ্রবাহে পরিপ্লুত হইবে না, কিছুতেই আমরা কার্য্যারম্ভ-শূন্য হইতে পারিব না, কিছুতেই আমাদের মন বসন্ত বায়ুবেগে বিবিধ কুসুমকিশলয়-কলাপের ন্যায় স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট হইবে না, কিছুতেই আমরা "আর কিছুই চাহি না পূর্ণকাম হইয়াছি," একথা মুক্তকণ্ঠে উচ্চারণ করিতে পারিব না, কিছুতেই আমরা বহুভোজনান্তে উদরপূর্ত্তি হইলে যে রূপ অমৃত দিলেও "আর প্রয়োজন নাই" বলি, সে রূপ চিরস্থির থাকিতে পারিব না, কিছুতেই আমরা বিপুলানন্দলাভের বাঙ্মনোবিচারাতীত চমৎকার গতি

প্রাপ্তির আশাপাশ ছেদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিব না। তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে সেই সুখ, সেই আনন্দ ও সেই শান্তি জগদ্বস্তু বিষয়াতীত কোন অপূর্ব্ব, অদৃশ্য অচিন্ত্য পদার্থে স্থির ভাবে, সূক্ষ্ম-ভাবে, উজ্জ্বল ভাবে, নির্ম্মল ভাবে নিত্য নিরবচ্ছিন্ন অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই আধারই সত্যসুখ-শুদ্ধ-সিন্ধু। সেই সিন্ধু সলিল বিন্দু মাত্রে সেবনেই আমাদের চিরবাঞ্ছিত অশেষ ক্লেশবিশেষোপশমকারী সুখের উদয় হইতে পারে। সেই পরমানন্দ-পয়োনিধিতে অবগাহন করাই যে আমাদের জন্মজীবনের একমাত্র লক্ষ্য ইহা সহজেই উপপন্ন হইল। ধর্ম্ম সেই অসীম সাগরে যাইবার পথ স্বরূপ। যিনিই সুখসিন্ধুনীরে স্নান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকেই এই পথানুসরণ করিতে হয়। ধর্ম্মপথে না চলিলে তথায় পৌঁছিবার উপায় নাই। ধর্ম্ম দুঃখ হইতে জীবকে সুখধামের অধিকারী করে, অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যায়, অন্ধকারপূর্ণ স্থানে জ্যোতিঃ প্রকাশ করে,

এবং মর্ত্ত্য জীবকে অমৃতনিকেতন বাসের উপযুক্ত করিয়া দেয়। ধর্ম্মই একমাত্র পরম বন্ধু, মৃত্যু হইলেও জীবকে পরিত্যাগ করে না। অন্যান্য সমস্ত বস্তু শরীর নাশের সঙ্গে সঙ্গেই দূরে পলায়ন করে। সাধু চরিত্র সংগঠন দ্বারা ধর্ম্মের সহিত চির সৌহার্দ্য রক্ষা করা দেহী মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম সাধন দ্বারা জীব নিশ্চয়ই সুখ হইতে পরম সুখ প্রাপ্ত হইবে, আনন্দ হইতে পরমানন্দ-ধামে বাস করিবে। হে জীব! যদি সুখ, শান্তি, আনন্দ চাও, তবে ধর্ম্ম সাধন কর। "ধর্ম্মাৎ পরতরন্নহি" ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

ধর্ম্ম।

দুঃখের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার ইচ্ছা সকলেরই। কিরূপে সুখ লাভ করিতে পারিব তদ্বিষয়ক যত্ন করা মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ। সুখ পাই বা না পাই, সুখ পাওয়া যাইবে বলিয়া মহাদুঃখ-দুর্ব্বিপত্তির জ্বালা

মালায় প্রবেশ করিতেও অনেকে কুণ্ঠিত হয় না। কি অবস্থায় প্রকৃত সুখ হয়, তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। সুখ শব্দটী বস্তুতঃ কোন অবস্থার নাম অথবা একটী কাল্পনিক কথা, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই অবধারণ করিতে পারেন নাই। সুখের সমস্যা যেমনই কেন হউক না, সুখের আশায় নিবৃত্ত হইতে কাহাকেও এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। আপনার কল্পনার রেখায় অবস্থা বিশেষের চিত্র করিয়া লোকে সুখ অনুভব করিতে চায়, কিন্তু ললাটে জল-তিলকের ন্যায় ক্ষণ বিলম্বেই সেই সুখের সরস রেখা শুখাইয়া যায়। আমরা যখন যে অবস্থাতেই থাকিনা কেন দুঃখের দুর্গন্ধ তাহার মধ্যে কিছু থাকিবেই থাকিবে, সুতরাং চিত্ত সন্তৃপ্ত হইতে চাহে না, অবস্থান্তরকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হয়। মনের এই দুর্দ্দম্য গতি কেহ কখনও রোধ করিতে পারিয়াছেন কিনা, তাহা যোগী বা মুক্তাত্মাগণ বলিতে পারেন, আমাদের মলিন মন তাহা

কল্পনা করিতেও অসমর্থ। প্রকৃত সুখ কোন্ উদ্যানের প্রফুল্ল কুসুম, দুঃখের পরম নিবৃত্তি বস্তুতঃ কোন্ কানন আলো করিয়া আছে, মনের সম্পূর্ণ শান্তিরত্ন কোন্ সাগর-গর্ভে লুক্কায়িত, তাহা আমাদের বুদ্ধি নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হয় না।

গুরুজন-মুখে শুনিয়াছি, শাস্ত্রে পড়িয়াছি ও সংস্কার বশতঃই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, ইহাই মনে ধারণা করিয়া রাখিয়াছি যে ধর্ম্মে সুখ ও অধর্ম্মে দুঃখ হয়। সুখ দুঃখের লক্ষণ কত লোকে কত কি করিয়াছেন তাহা লইয়া এক্ষণে বিচার করিব না, তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে যাহাতে তোমার সুখ বা দুঃখ হয়, তাহাতে যে আমারও সুখ ও দুখ অনুভূত হইবে এরূপ নহে। অবস্থা, সময় ও কার্য্য-বিশেষে যেটী পরম সুখের কারণ বলিয়া বোধ হইল, সেইটীই আবার অবস্থান্তরে, সময়ান্তরে ও কার্য্যান্তরে পরম দুঃখ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। সুতরাং সুখের বা দুঃখের উপাদান চির কাল

আমার পক্ষে সমান থাকে না। আমি বালক কালে যাহাতে সুখী ছিলাম, যৌবনে বা বার্দ্ধক্যে তাহাতে সুখ পাই না। সুতরাং সুখ অন্বেষণ করিতে গেলে প্রকৃত উপাদান চিনিয়া লওয়া আমার পক্ষে ভার হইয়া উঠিল। ধর্ম্মে যে সুখ হয় তাহা কিরূপ সুখ, তাহা ধার্ম্মিকেই বলিতে পারেন। তাহাই যে প্রকৃত সুখ তাহা স্বীকার করিব কিরূপে? দুঃখের নিবৃত্তি যদি সুখ হয়, তবে ধর্ম্মানুষ্ঠানে সুখ আছে, এ কথা স্বীকার করিতে সহসা অগ্রসর নহি। "ধর্ম্মের" মর্ম্মস্থলে আমরা এক্ষণে প্রবেশ করিব না, তবে লোকে যে সকল কার্য্যকে বা আচার ব্যবহারকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে, আমরা তাহা লইয়াই বিচার করিব। শাস্ত্রে পড়িলাম, ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে পরম সুখ, শাস্ত্রে আবার পড়িলাম দীনের প্রতি দয়া করা পরম ধর্ম্ম। অমনি সুখের লোভে লালায়িত হইয়া দুঃখীর প্রতি দয়া করিতে লাগিলাম। ভাবিয়াছিলাম দয়া রূপ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে আমার

দুঃখ নিবৃত্ত হইবে; কিন্তু কপাল-গুণে ফল বিপরীত হইল। পূর্ব্বে কেবল আমি আমারই দুঃখে কাতর ছিলাম, দয়ালু হইয়া দেশের দুঃখ ভাবিতে২ পাগল হইয়া উঠিলাম। তখন আমারই মাত্র দুঃখ হইলে কাঁদিতাম, এখন তদ্ভিন্ন পরের দুঃখ দেখিয়াও কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম, অশ্রুধারার পরিমাণ বাড়িল। তখন একাকীর উদর-পূর্ত্তির জন্য ভাবিয়া আকুল হইতাম, এখন দয়ালু হইয়া লক্ষ২ দীন দুঃখীর অন্ন-কষ্ট কি রূপে দূর হইবে তাহাই ভাবিয়া ব্যাকুল হইলাম। দুঃখ দুশ্চিন্তার আবেগ পূর্ব্ব অপেক্ষা বহু পরিমাণে বাড়িল। তখন একাকীর দুঃখ সম্বরণ করিতে পারিতাম না, এখন দয়ালু হইয়া— ধার্ম্মিক হইয়া—সুখলুব্ধ হইয়া নিরাশ্রয়ের ন্যায় অকূল দুঃখের সাগরে ভাসিতে লাগিলাম। আমার সাধারণ অবস্থায় আমার দুঃখের পরিমাণ এক বিন্দুমাত্র ছিল, ধর্ম্ম সাধন করিতে গিয়া দুঃখের নদীর স্রোত বহিয়া গেল। দুঃখনিবৃত্তি যদি আমার লক্ষ্য হয়, তবে ধর্ম্মের—দয়ার

সেবা করিয়া তাহা পাইলাম কৈ ? সত্য কথা বলা পরম ধর্ম্ম। সত্য কথা বলিতে লাগিলাম, হয়তো কত স্থানে বিষম বিপদে পড়িলাম, ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম, ভয় পাইলাম, বেদনা সহ্য করিলাম। কৈ সত্যে তো সুখ পাইলাম না। ধর্ম্মাত্মারা বলিবেন এখন না হয়, পরে সুখ পাইবে, ইহ লোকে না হয় পরলোকে সুখ পাইবে। দৃষ্টার্থে যাহার ফল মিথ্যা হইল, অদৃষ্টার্থে তাহা যে সত্য হইবে তাহাতে বিশ্বাস কি ? সত্যের জয়, সত্যের জয়, এই মহা নিনাদে কর্ণকুহর বধির হইল। কিন্তু জাগ্রত চক্ষুর সম্মুখে শত সহস্র অসত্যের জয় হইয়া যাইতেছে। কালক্রমে বিজয় হইলে মনকে কি এইরূপ প্রবোধ দিয়াই সুখ অনুভব করিতে হইবে ? রাজা যুধিষ্ঠির সত্যশীলতার জন্য চির দিন যাতনা সহ্য করিলেন, পরিশেষে সত্যের জয় হইল; কিন্তু এ জয়ে লাভ কি ? এরূপ জয় কি কাহারও স্পৃহনীয় ? সমস্ত দেশ ছারখার হইল, ভারত উচ্ছেদ-সাগরে ডুবিল,

কতক গুলি বিধবা মাত্র অবশিষ্ট রহিল, এই অবস্থায় যুধিষ্ঠিরের বিজয়-ভেরী বাজিল, এরূপ ভেরী নিনাদ বাস্তবিক কি প্রকৃত জিগীষুর প্রার্থনীয় ? আর সত্য কথা কহিলেই যদি ক্লেশ ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়, তবে সুখলিপ্সু লোক কি ভরসায় সত্য কথা বলিবে ? আর অধিক দৃষ্টান্ত লইয়া আমরা বাড়াবাড়ি করিবনা। দৃষ্টান্ত দুইটীর প্রকৃতি পাঠ করিয়াই ধর্ম্মাভিমানী লোকে বলিবেন যে, প্রথমে দুঃখভোগ না করিলে সুখ অনুভব হইবে কিরূপে ? দুঃখ ভিন্ন যে সুখ লাভ করা যায় না, আমরা সে সুখ পাইবার পক্ষপাতী নহি। আমার কণ্ঠে মণি-বিজড়িত এক গাছি হার ছিল, বিস্মরণের কোপে পড়িয়া বোধ হইল যেন হার গাছটী হারাইয়াছি, চারি দিকে উদ্বিগ্ন ভাবে অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, খুঁজিতে খুঁজিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, ভাবনায় ও ভয়ে মন বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তৎপরে অকস্মাৎ একবার কণ্ডুয়ন-

চ্ছলে গ্রীবায় হাত পড়িল, দেখিলাম—হার আমার গলদেশেই লম্বমান, তখন আহ্লাদের সীমা রহিল না। রত্ন-মালা পাইয়া গদ্গদ চিত্ত হইলাম, সুখের সাগরে ভাসিতে লাগিলাম। এইরূপ সুখ কি কেহই প্রার্থনা করেন? আমরা বলি, স্মৃতিশক্তি অবিচলিত থাকিলে এ অনর্থপাত হইত না, দুঃখও আসিত না। আবার হার পাইয়া সুখীও হইতে হইত না। অতএব একটী নূতন দুঃখের সৃষ্টি করিয়া তাহার শান্তিতে সুখ বোধ করা বস্তুতঃ সুখ নহে। দ্বিতল হইতে নিজ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ লাফাইয়া পড়িলাম, পা ভাঙ্গিয়া গেল, দুঃখে কাঁদিতে লাগিলাম, চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে যাতনার শেষ হইল, উল্লাসে পুলকিত হইলাম, আবার হাঁটিতে শিখিয়া বড় সুখী হইলাম। এই রূপ নিজ কৃত দুঃখের অবসানে সুখী হওয়া কি মনুষ্যের প্রার্থনীয় সুখ? আমরা বলি—প্রথমতঃ লম্ফদানের দুর্ব্বুদ্ধি না ঘটিলে এই দুঃখ বা সুখের অভিনয় দেখিতে হইত না। স্বয়ং খাত খনন

করিলে—তাহাতে বর্ষার জল জমিল, তোমার পুত্র খেলিতে গিয়া ডুবিতে২ বাঁচিয়া গেল, তুমি তৎপর দিনই মৃত্তিকা দ্বারা খাত পূর্ণ করিয়া দিলে, বিপদের আশঙ্কা হইতে বাঁচিলে বলিয়া, এই পৌরুষে তোমার সুখ বোধ হইল। বস্তুতঃ এরূপ সুখরাশির মূল ভিত্তি দুঃখ; সুতরাং এ সুখ প্রকৃত সুখকর নহে। দয়ার কার্য্যও এই পদ্ধতির। তোমার বুদ্ধি চিকণ হইল, লোকের মতে তোমার মন নির্ম্মল হইল,অন্যের দুঃখ দেখিতে শিখিলে, করুণার উদ্রেক হইল, সেই দুঃখের একটী প্রতিকৃতি তোমার মনে পড়িল, অমনি তুমিও দুঃখী হইলে। সেই দুঃখ দূর করিরার জন্য তোমার চেষ্টাও প্রবল হইল। যদি তুমি দান করিয়া তাহার উপকার করিতে পার, তাহার মলিন মুখ প্রসন্ন করিতে পার, তাহার দুঃখাপনোদনের সঙ্গে২ তোমার অন্তঃকরণে নিপতিত তাহার দুঃখের প্রতিবিম্বটীও মুছিয়া যাইবে, তুমিও সুখী হইবে। আর মনের পাট লিখিয়া রাখিবে ও লোককে

বুঝাইতে চেষ্টা করিবে যে ধর্ম্মানুষ্ঠানে সুখ হয়। বস্তুতঃ তোমার এই সুখ কি পূর্ব্বোল্লিখিত উদাহরণ-শ্রেণীর অনুগত নহে ? বস্তুতঃ ধর্ম্মসাধনে সুখ (লোকে যাহাকে সাধারণতঃ সুখ মনে করে) হয় এ কথা কল্পনা-প্রসূত। নিজকৃত খাত-পূর্ত্তি করিতে করিতেই যদি জীবন ফুরাইয়া যায়, তবে মনুষ্য বস্তুতঃ সুখের সন্ধান করিবে কবে ?

লোক-সমাজে দুর্ভাগ্য বশতঃ যে রূপ ধর্ম্মশিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাতে পরম দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় দেখিবার অবসর অতি অল্প। বালক কালে আমাকে যত্ন করিয়া শিখাইলে, পিতা মাতা, ভাই ভগিনীকে আপনার বলিয়া বিবেচনা কর, শিক্ষার গুণে তাহাই সংস্কার হইয়া গেল। যৌবনে বিবাহ-কালে স্ত্রীকে আপনার করিতে শিখাইলে, পরে পুত্র কন্যাকে আপনার ভাবিতে বলিলে। আবার কিছু দিন বাদে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলে,

পিতা মাতা কেহ কাহারও নহে, স্ত্রী পুত্র তোমার আপনার নহে। এই সকল কথা যখন শ্রবণ করিতে লাগিলাম, তখন মনেং বড় ক্ষোভ হইল। ভাবিলাম এই কথা বালক-কালে শিখাইলেই হইত। তাহা হইলে ইহা দিগকে আপনার বলিয়া এত দৃঢ় সংস্কার জন্মিত না, তখন অনায়াসে ছাড়িতে পারিতাম। এক্ষণে যদিও বা এরূপ অবস্থায় কেহ গৃহ দ্বার ত্যাগ করিয়া যান, তিনি ভাবেন—ইহা পরম পুরস্কার সাধিত হইল, এরূপ ত্যাগের দিন তাঁহার জীবনের একটী আহ্লাদজনক ঘটনা। বস্তুতঃ এরূপ আহ্লাদও কি প্রোক্ত উদাহরণ-রাশির শ্রেণীভুক্ত নহে?

এই রূপ ভাবে সুখ সাধন করিবার জন্য ধর্ম্মের সেবা করিতে হয়. ইহা আমাদের বিশ্বাসবিরুদ্ধ। জন্ম জন্মান্তরে আমি ধারাবাহিক ক্রমে যে দুঃখ রাশি ভোগ করিয়া আসিতেছি, তাহারই পরম নিবৃত্তি

আমার প্রার্থনীয়। নূতন দুঃখ রচনা করিয়া তাহার শান্তি-সুখ অনুভব করা আমার ধর্ম্ম-জীবনের উদ্দেশ্য নহে। দয়া দ্বারা পরদুঃখ-বিমোচনে যে সুখ হয়, সেই সুখ লাভ করা দয়ার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু প্রথমে আমি যে আপনার দুঃখ ভাবিতে ছিলাম, পরের দুঃখ ভাবিতে গিয়া আমার সেই দুঃখ আর স্থান পাইল না, আমার দুঃখ নিবৃত্তি হইল, ইহাই দয়া-ধর্ম্মের পরম ফল। যে দিন দেখিবে আমার স্বীয় দুঃখের জন্য আর আমার উদ্বেগ হয় না, সে দিন অন্যের দুঃখ দেখিয়াও আমার দয়ার সঞ্চার হইবে না। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল এই রূপে অসৎপ্রবৃত্তি-রাশিকে সংহার করিয়া অবশেষে আপনারাও বিলুপ্ত হইয়া যায়। জ্ঞান যোগী গণ ধর্ম্ম সাধন দ্বারা এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া থাকেন, সুখে বা দুঃখে বিপদে বা সম্পদে আর বিচলিত হয়েন না।

এক্ষণে দেখিলাম আমাতে যে সকল ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি রহিয়াছে, তাহা পূর্ব্বসঞ্চিত দুঃখ রাশির নিবৃত্তি করিবার ও ভবিষ্যৎ দুঃখ রাশির প্রবেশ-পথ রোধ করিবার জন্য। কিন্তু ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকল যদি শৈশব হইতেই দুর্জ্জয় দুঃখ রাশির সহিত সংগ্রাম করিতে থাকে, তাহা হইলে উক্ত ধর্ম্ম-বৃত্তি নিচয় কোন কালেই নিজ নিজ কার্য্য সাধন করিতে পারিবে না। এই জন্য প্রাচীন আর্য্যগণ বালকের উপনয়ন হইলেই—কার্য্য-চেষ্টা-কাল উপস্থিত হইলেই কার্য্য-ক্ষেত্র ও লোক-সমাজ হইতে অতিদূরে গুরুর আশ্রমে রক্ষা করিতেন। সেখানে বিদ্যাভ্যাস ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকলের সুগঠন, বল ও পুষ্টি হইত। অতঃপর গার্হস্থ্য আশ্রমে—সংগ্রাম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া বর্ত্তমান কালের আমাদিগের ন্যায়—দুর্ব্বলের ন্যায় সংসারের পদ তলে বিলুণ্ঠিত ও দুষ্ক্রিয়ার তাড়নায় বিড়ম্বিত হইতে হইত না। এখন সত্য কথা

কহিয়া নির্য্যাতিত হইলে আমরা দুঃখাশ্রু বিসর্জ্জন করি, কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠির বহুক্লেশে পড়িয়াও অম্লানবদন ও অক্ষুণ্ণ চিত্ত থাকিতেন। তাঁহার সত্য-নিষ্ঠা সুগঠিত ও পূর্ণপুষ্টি-যুক্ত হইয়াছিল বলিয়া তিনি সত্যের রসাস্বাদ করিতে পারিয়াছিলেন! আমাদের অপুষ্ট, দুর্ব্বল সত্য-নিষ্ঠা লোভের সামান্য সংগ্রামে—সংসারের কটাক্ষ-তাড়নায় অভিভূত হইয়া পড়ে। তাই বলিয়া থাকি সত্যে সুখ নাই, তাই মিথ্যা কথনে প্রবৃত্তি হয়। ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকল প্রকৃত রূপে পুষ্ট হইলে আমরা সাধারণতঃ যে ক্ষুদ্র সুখের জন্য ধর্ম্মের সেবা করি, ধর্ম্ম তৎপরিবর্ত্তে আমাদের আশাতীত কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। সঞ্চিত ও অনাগত দুঃখ-নিবৃত্তির—দুঃখ-সাগর-পারের সুদৃঢ় সোপান রচনা করিয়া দেন। ধর্ম্মের প্রকৃত মহিমা বুঝিতে না পারিয়াই আমরা প্রথমতঃ ধর্ম্মের সেবা করিনা, বরং ধর্ম্মকেই আমাদের সেবায় নিযুক্ত করিয়া

রাখি। "একে আমার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল অপুষ্ট রহিল, আবার সেই দুর্ব্বল অবস্থায় আমার কার্য্য করিতে লাগিল। সুতরাং ধর্ম্ম আমাকে পরম সুখ দিবেন কোথা হইতে? আমরা যেন যথোচিত ধর্ম্মের সেবা করিতে—ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা ধর্ম্মকে পুষ্ট করিতে শিক্ষা করি। সামান্য সুখের জন্য যেন ধর্ম্মকে আমাদের সেবায় নিযুক্ত না করি। ধর্ম্ম আমাদের কল্যাণপ্রদ হউন।

আর্য্যশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম।

" ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মেণ পাপমপনুদন্তি ধর্ম্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি ধর্ম্মেণ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠং তস্মাৎ ধর্ম্মং পরমং বদন্তি ইতি শ্রুতিঃ। "

ধর্ম্মই জগতের একমাত্র আশ্রয়। ধর্ম্ম দ্বারাই অধর্ম্ম বা পাপের বিনাশ হইয়া থাকে। প্রজাপুঞ্জ ধর্ম্মাত্মা

ব্যক্তিবর্গেরই শরণাগত হয়। ধর্ম্মই সমস্ত পদার্থে সত্তার ন্যায় প্রতিষ্ঠিত, অতএব ধর্ম্মই পরম সুহৃদ্ ইহাই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।

ধর্ম্মগতপ্রাণ ঋষিগণ ধর্ম্মের স্বরূপ ও লক্ষণা ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যান করিলেও বস্তুতঃ বা কার্য্যতঃ বিশেষ মত-বৈষম্য দৃষ্ট হয় না। ভগবদ্বাণী শ্রুতির পরমর্শেই সকলে নিজ নিজ ভাব ও ভাষায় ধর্ম্ম-বিষয় লিপি বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

১। আর্য্যগুরু গুরু কহিয়াছেন " বিহিত ক্রিয়য়া সাধ্যো ধর্ম্মঃ পুংসোগুণো মতঃ "। বেদাদিশাস্ত্র-বিহিত বিধানে অনুষ্ঠিত কর্ম্মজাত সুকৃতিরই নাম ধর্ম্ম।

উক্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্ম লৌকিক ও অলৌকিক দুই ভাগে বিভক্ত। লৌকিক, যথা—ভোজন, আচ্ছাদন মৈথুন, শয়ন, গমন, শ্রবণ, ত্যাগ ইত্যাদি। অলৌকিক, যথা—বেদাদি শাস্ত্রবিহিত সন্ধ্যা বন্দন, পঞ্চ মহা যজ্ঞ, স্নান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ, তীর্থস্নান, দেবতা ও সৎব্রাহ্মণ

উদ্দেশে দান, গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কার, উপবাস, ব্রত, দেবপূজা, হোম ও যাগাদি। এই লৌকিক ও অলৌকিক ক্রিয়াও আবার শাস্ত্রানুমোদিত 'বিধি' ও 'নিষেধ' অনুসারে সময়ে সময়ে ন্যূনাধিক ফল প্রসব করিয়া থাকে। মনে করুন—স্নান ভোজনাদি লৌকিক ক্রিয়া হইয়াও 'বিধি' বিশেষ দ্বারা সময়ে সময়ে অধিকতর শুভ ফল প্রসব করিয়া থাকে। যথা—

"তুলা মকর মেষেষু প্রাতঃস্নানং বিধীয়তে।
হবিষ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মহাপাতকনাশনম্॥"

সূর্য্য তুলা, মকর ও মেষ রাশিতে গমন করিলে (বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে) প্রাতঃস্নান, হবিষ্যান্ন ভোজন ও ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান-ফলে মহাপাতকাদি বিনষ্ট হয়। আবার "অলৌকিক" ক্রিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য হইলেও শাস্ত্রানুমোদিত নিষেধ-বাক্য অবহেলা করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়। বিবেচনা করুন বেদবিহিত সন্ধ্যা বন্দন নিত্য অনুষ্ঠেয় অলৌকিক

কর্ম্ম ('অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত' ইতি শ্রুতিঃ) কিন্তু ইহার নিষেধ-বাক্যও আছে যথা—

"সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
সায়ং সন্ধ্যাং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ পিতৃহা ভবেৎ" ॥

সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী ও শ্রাদ্ধ দিনে সায়ংসন্ধ্যা করিবে না, করিলে পিতৃহত্যার পাতক হইবে।

অলৌকিক ক্রিয়াও আবার নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য, এই তিন ভাগে বিভক্ত। সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য, পুরশ্চরণাদি নৈমিত্তিক ও অগ্নিষ্টোম যাগাদি কাম্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত।

২। মহামুনি জৈমিনি ধর্ম্মাধর্ম্মের এইরূপ লক্ষণ কহিয়াছেন, যথা "চোদনা লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" অর্থাৎ বিহিত বিধি দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত ফল-সাধনই ধর্ম্ম আর নিষেধ-বিধি দ্বারা অনীপ্সিত ফল (নরক) সাধনই অধর্ম্ম।

৩। আর্য্যকুলভূষণ প্রভাকর এই রূপ লিখিয়াছেন। যথা—

যমার্য্যাঃ ক্রিয়মাণং হি শংসন্ত্যাগমবেদিভিঃ।
তং ধর্ম্মং, যং বিনিন্দন্তি তমধর্ম্মং প্রচক্ষতে ॥

বেদজ্ঞ আর্য্যগণ যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন এবং যাহা বিজ্ঞগণের নিকট প্রশংসিত হয়, মহাত্মাগণ তাহাকে "ধর্ম্ম" কহিয়াছেন এবং আর্য্যগণ যে অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে নিন্দা করিয়া থাকেন, তাহাই 'অধর্ম্ম' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৪। মহাভারতে ধর্ম্মের স্বরূপ এইরূপ কথিত হইয়াছে। যথা—

"ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মো ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম্মকঃ।
অবিরোধী তু যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মঃ (সত্যবিক্রম!)" ॥

যে ধর্ম্ম ধর্ম্মান্তরের বিরোধী, তাহা 'ধর্ম্ম' নহে, উহা অসদ্ধর্ম্ম মধ্যে গণ্য এবং যে ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের বিরোধ করে না, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম।

"অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু কর্ম্মণা মনসা গিরা।

অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ সতাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ।।”

চেষ্টা, বাক্য ও মন দ্বারা কাহারও অনিষ্ট না করা, অন্যের প্রতি সদয় ব্যবহার এবং দান, ইহাই সাধু-দিগের সনাতন ধর্ম্ম।

৫। পদ্মপুরাণে ধর্ম্মের লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

“পাত্রে দানং কৃষ্ণে মতির্ম্মাতাপিত্রোশ্চ পূজনম্।
শ্রদ্ধা, বলি গবাং গ্রাসঃ ষড়্‌বিধং ধর্ম্মলক্ষণম্ ।।”

সৎপাত্রে (বিদ্যাবান্, জ্ঞানবান্, পরোপকারী, ধর্ম্মাত্মা পীড়িত, দরিদ্র আদিকে) দান, ভগবচ্চরণারবিন্দে একান্তানুরাগ, মাতা পিতার সেবা, মহাত্মা ও দেবাদিতে শ্রদ্ধা, বলি বৈশ্যদেবকর্ম্ম, এবং গোগ্রাস প্রদান এই ছয়টী ধর্ম্মের লক্ষণ।

মনু বলিয়াছেন যথা—

“ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্ ।। ”

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, নির্ম্মল বুদ্ধি, তত্ত্ববিদ্যা, সত্য, অক্রোধ এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ।

মৎস্যপুরাণে ধর্ম্মের মূল সম্বন্ধে লিখিত আছে, যে—

"অদ্রোহশ্চাপ্যলোভশ্চ দমো ভূতদয়া তপঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং ততঃ সত্যমনুক্রোশঃ ক্ষমা ধৃতিঃ।
সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলমেতদ্দুরাসদম্॥"

অবিরোধ, অলোভ, বহিরিন্দ্রিয়-সংযম, জীবের প্রতি দয়া, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, অনুক্রোশ, ক্ষমা ও ধৃতি এই দশটী সনাতন ধর্ম্মের মূল।

পদ্মপুরাণে ধর্ম্মের অঙ্গ কথিত হইয়াছে। যথা—

"ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন তপসা চ প্রবর্ত্ততে।
দানেন নিয়মেনাপি ক্ষমা শৌচেন বল্লভ।
অহিংসয়া সুশান্ত্যা চ অস্তেয়েনাপি বর্ত্ততে।
এতৈর্দ্দশভিরঙ্গৈস্তু ধর্ম্মমেব সুসূচয়েৎ॥"

ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, তপস্যা, দান, নিয়ম, ক্ষমা, শৌচ, অহিংসা, শান্তি ও অস্তেয় এই দশবিধ অঙ্গ-সৌষ্ঠব-যুক্ত হইলে ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হয়েন।

৬। ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি জঞ্জালপূর্ণ ও ক্লেশ বিপত্তি-সঙ্কুল সংসারে সদাই নির্ভয় ও সুখী; কেননা ধর্ম্ম-সাধন বলে তাঁহারা সমাগত বিপত্তি রাশিকেও সানন্দ অন্তঃকরণে তুচ্ছ করিতে সমর্থ। শোক, তাপ, মৃত্যু আদি তাঁহারা ত্রিভুবনের এক মাত্র আশ্রয় ভগবানের চরণ-সেবায় মন, প্রাণ সমর্পণ করিয়া তাঁহার কৃপা-লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রসন্নবদন দর্শন করিলে, তাঁহাদের জ্ঞানামৃতমিশ্রিত বাণী শ্রবণ করিলে, তাঁহাদের পরহিতসাধিনী রীতি নীতি ও হৃদয়ের বল, সৎসাহসাদি স্মরণ করিলে, তাঁহাদিগকে যেন অন্য রাজ্যের প্রজা বলিয়া বোধ হয়। যখন তাঁহারা সেই সুখ-রাজ্যের সমাচার সকল লোক-সমাজে প্রচার করিতে থাকেন, তখন মূঢ়গণ তাহা ধারণা করিতে না পারিয়া পলায়ন করে, পাপাত্মাগণ উহা দুঃসহ বিবেচনা করিয়া কর্ণপাত করিতে অগ্রসর হয় না, বিশ্বাসী, ভক্ত ও সাধকগণই কেবল দলে ২ সমবেত হইয়া সেই সমা-

চারের অমৃতধারা পান করিয়া থাকেন। যিনি এই সুমধুর সুধার বিন্দুমাত্র পান করেন, তাঁহারও জীবন সফল হয়। তিনিও সেই ব্রহ্মাদিপরীক্ষিত আনন্দ-ধামে যাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পাপ, তাপ, ক্লেশ, জন্ম, জরা, মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া যিনি সুরগণ-সেবিত সুখ-নিকেতনে যাইতে চাহেন, ধর্ম্মই তাঁহার একমাত্র পথ। ধর্ম্মই মনুষ্যের চিরদিনের প্রকৃত সহায়, ধর্ম্মই মনুষ্যের প্রকৃত বন্ধু, ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলে আর কোন বিপদই ভোগ করিতে হয় না। এতদর্থে মনু কহিয়াছেন, যথা—

"নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতামাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতি ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥"

হে জীব! পিতা, মাতা, দারা, জ্ঞাতি আদি কেহই পরলোকে সহায় হয়েন না, কেবল ধর্ম্মই সহায় হইয়া থাকেন।

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।

শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥”

ধর্ম্মই মনুষ্যের একমাত্র সুহৃৎ, (কেননা যিনি বিপৎকালে সহায়তা করেন তিনিই বন্ধু। মৃত্যু অপেক্ষা জীবের আর কি মহা বিপদ্ হইবে, সে সময়ে জীবের যাতনা, ভয়াদি নিবারণ জন্য ধর্ম্ম ভিন্ন আর কে অগ্রসর হইয়া থাকে) ধর্ম্ম মৃত্যুর পরেও সহগামী হয়েন। অন্যান্য সকলই শরীরের সহিত বিনষ্ট হইয়া যায়।

“একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।

একোঽনুভুঙ্ক্তে সুকৃতমেক এব তু দুষ্কৃতং ॥”

জীব একাকীই নিজ কর্ম্মানুসারে উৎপন্ন হয়, একাকীই লয় প্রাপ্ত হয় এবং একাকীই আপনার সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল ভোগ করিয়া থাকে।

“তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াৎ শনৈঃ।

ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্ ॥”

অতএব জীব! আপনার শেষ দিনের ও চিরদিনের সহায়তার নিমিত্ত ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম নিত্য সঞ্চয় করিবে।

ধর্ম্ম সহায় থাকিলে, দুস্তর অন্ধকার (নরক যন্ত্রণাদি) উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

বিষয়-পিপাসায় উন্মত্ত হইয়া, ষড়্‌রিপুর ষড়্‌যন্ত্রে অন্ধ হইয়া, অজ্ঞানের কুচক্রান্তে আত্ম বিস্মৃত হইয়া দুর্বুদ্ধির পরামর্শে ধর্ম্মকে তুচ্ছ করিও না। মহাভারতে লিখিত আছে, যে—

"ন ধর্ম্মোঽস্তীতি মন্বানাঃ শুচীনবহসন্তি যে।
অশ্রদ্দধানা ধর্ম্মস্য তে নশ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥"

ধর্ম্ম নাই মনে করিয়া, যাহারা সাধুগণকে উপহাস ও ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তাহারা নিঃসংশয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

"যে তু ধর্ম্মানসূয়ন্তে বুদ্ধিমোহান্বিতা নরাঃ।
অপথা গচ্ছতাং তেষামনুযাতাপি পীড্যতে॥"

যে সকল মোহান্ধ ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করে; তাহারা স্বয়ং অপথগামী হয় এবং যাহারা তাহাদের অনুগমন করে তাহারাও পীড্যমান হইতে থাকে।

আর্য্যশাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণ ও শ্রুতি বারম্বার উচ্চ ও গম্ভীর নিনাদে জীবকে ধর্ম্মপথে বিচরণ করিয়া নিজ নিজ কল্যাণ লাভের জন্য সৎপরামর্শ ঘোষণা করিতেছেন, জীব! অমনোযোগী ও অশ্রদ্ধাবান্ হইয়া নিজ সুখের কণ্টক বিস্তার করিও না। বৃথা সময়ও নষ্ট করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইও না। বাল্যকালে বা যৌবনকালে ধর্ম্মসাধন না করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় করিবে, এ ভাবনা পরিত্যাগ কর। কেননা—

" ন ধর্ম্মকালঃ পুরুষস্য নিশ্চিতো
নচাপি মৃত্যুঃ পুরুষং প্রতীক্ষতে।
সদাহি ধর্ম্মস্য ক্রিয়ৈব শোভনা
যদা নরো মৃত্যুমুখেঽভিবর্ত্ততে ॥"

মৃত্যু মনুষ্যের সময়াসময় প্রতীক্ষা করে না, অতএব মনুষ্যের ধর্ম্মসাধনের কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই, মনুষ্য যখন সদাই মৃত্যুমুখে অবস্থিতি করিতেছে, তখন ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল সময়েই শোভা পায়।

এক্ষণে কোন্ জাতির কিরূপ অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ কিরূপ ধর্ম্মসাধন করিলে সকলেই কল্যাণ প্রাপ্ত হইবে, আমরা বামন পুরাণের সাহায্য লইয়া তত্তাবৎ ধার্ম্মাত্মা পাঠকগণের বিদিতার্থ ও কার্য্য-সৌকার্য্যার্থ প্রকাশ করিয়া অবসর গ্রহণ করিব। জাতীয় প্রকৃতি অনুসারে ধর্ম্ম বিভিন্ন ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এক প্রকৃতির ধর্ম্ম অন্য প্রকৃতিস্থ জীব অনুষ্ঠান করিলে, তাহাতে কোন ফললাভ হয় না, বরং তাহাতে প্রত্যবায় দৃষ্ট হয়।

দেবধর্ম্ম।

দেবানাং পরমো ধর্ম্মঃ সদা যজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
স্বাধ্যায়বেদবেত্তৃত্বং বিষ্ণুপূজারতিঃ স্মৃতঃ॥

নিরন্তর যজ্ঞাদি-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, বেদ্যাধ্যয়ন, বেদার্থ মন্ত্রের অনুধ্যান, বোধ ও অনুশীলন, বিষ্ণুপূজায় একান্ত অনুরাগ, এই কএকটী বৃন্দারকবৃন্দের পরম ধর্ম্ম।

দানব ধর্ম্ম।

দৈত্যানাং বাহুশালিত্বং মাৎসর্য্যং যুদ্ধসৎক্রিয়া।
বিন্দনং নীতিশাস্ত্রাণাং হরভক্তিরুদাহৃতা॥

বাহুযুদ্ধ, মাৎসর্য্য, যুদ্ধে সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান (সমর-নীতির বহির্ভূত অবৈধ যদ্ধ না করা) নীতি শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ এবং কৈলাশপতি মহাদেবের প্রতি ভক্তি এই কয়েকটী দৈত্যদিগের ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

সিদ্ধধর্ম্ম।

সিদ্ধানামুদিতো ধর্ম্মো যোগযুক্তিরনুত্তমা।
স্বাধ্যায়ং ব্রহ্মবিজ্ঞানং ভক্তির্দ্বাভ্যামপি স্থিরা॥

উৎকৃষ্ট যোগাদিতে স্থিরমতি, বেদাধ্যয়ন, বেদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান, হরি ও হর উভয়েতেই সমান অচলা ভক্তি এতাবৎ সিদ্ধগণের ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

গান্ধর্ব্ব ধর্ম্ম ।

উৎকৃষ্টোপাসনং জ্ঞেয়ং নৃত্যবাদ্যেষু বাদিতা ।
সরস্বত্যাং স্থিরা ভক্তি গান্ধর্ব্বো ধর্ম্ম উচ্যতে ॥

উৎকৃষ্ট রূপ নৃত্য ও বাদ্য শিক্ষা এবং সরস্বতীতে অচলা ভক্তিই গন্ধর্ব্বগণের পরম ধর্ম্ম ।

বিদ্যাধর ধর্ম্ম ।

বিদ্যাধরত্বমতুলং বিজ্ঞানং পৌরুষে মতিঃ ।
বিদ্যাধরাণাং ধর্ম্মোঽথ ভবান্যাং ভক্তিরেব চ ॥

বিদ্যা ও বিজ্ঞান-শিক্ষাতে ঐশ্বর্য্যলাভ জ্ঞান, দৈব অপেক্ষা পৌরুষেই অধিক প্রীতি এবং ভবানীতে (শক্তিতন্ত্রে) ভক্তি এই সমস্তই বিদ্যাধরদিগের ধর্ম্ম

কৈম্পুরুষ ধর্ম্ম ।

গান্ধর্ব্ব বিদ্যাবেদিত্বং ভক্তিঃ স্থানৌ তথা স্থিরা ।
কৌশল্যং সর্ব্ব শিল্পেষু ধর্ম্মঃ কৈম্পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥

গান্ধর্ব্ব বিদ্যাতে দক্ষতা, দেব-প্রতিমাদিতে অচলা ভক্তি, এবং সর্ব্বপ্রকার শিল্প নৈপুণ্য কিম্পুরুষ দিগের ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে ।

পৈতৃক ধৰ্ম্ম।

ব্রহ্মচর্য্যমমানিত্বং যোগাভ্যাসে রতির্দৃঢ়া।

সর্ব্বত্র কামচারিত্বং ধর্ম্মোঽয়ং পৈতৃকঃ স্মৃতঃ ॥

সদাশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, নিরভিমানিত্ব, যোগাভ্যাসে দৃঢ় অনুরাগ, এবং সর্ব্বত্র ইচ্ছামত আচার বা বিচরণ শক্তি এই গুলি পিতৃগণের ধৰ্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আৰ্ষ্যধৰ্ম্ম।

ব্রহ্মচর্য্যং যতাশিত্বং জপ্যজ্ঞানঞ্চ রাক্ষস।

নিয়মা ধৰ্ম্মবেদিত্বমার্ষং ধৰ্ম্মং প্রচক্ষতে ॥

ব্রহ্মচর্য্য, আহার-সংযম, জপ্য তত্ত্বের জ্ঞান, নিয়ম সকলের বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠান এবং ধৰ্ম্মজ্ঞতা, এতাবতই ঋষিগণের ধৰ্ম্ম।

মানব ধৰ্ম্ম।

স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ দানং যজনমেব চ।

অকার্পণ্যমনায়াসং দয়া হিংসা ক্ষমাদয়ঃ ॥

জিতেন্দ্রিয়ত্ব শৌচঞ্চ মাঙ্গল্যং ভক্তিরুচ্যতে।

শঙ্করে ভাস্করে দেব্যাং ধর্ম্মোঽয়ং মানবঃ স্মৃতঃ ॥

বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য বা সদা শুদ্ধাচার, উপযুক্ত ও অভাবযুক্ত ব্যক্তিকে অন্ন, বস্ত্র, অর্থ, বিদ্যা, জ্ঞানাদি দান. যাগযজ্ঞ ব্রত হোমাদির অনুষ্ঠান, অকার্পণ্য, দয়া, অহিংসা, ক্ষমা, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, বাহ্য ও আভ্যন্তরিক শৌচাচার, মাঙ্গল্য-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, শঙ্কর, ভাস্কর ও দেবীতে ভক্তি এই সমস্তই মানবদিগের পরম ধর্ম্ম।

গুহ্যক ধর্ম্ম।

ধনাতিপত্যং ভোগানি স্বাধ্যায়ং শঙ্করার্চ্চনং।
অহঙ্কারমশৌচঞ্চ ধর্ম্মোঽয়ং গুহ্যকেষ্বিতি ॥

ধনাধিপত্য, সুখসেব্য দ্রব্যাদিভোগ, বেদপাঠ, শিব পূজা, অহঙ্কার ও অশৌচ গুহ্যকগণের ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে।

রাক্ষস ধর্ম্ম।

পরদারাভিমর্ষিত্বং পরার্থেঽপিচ লোলুপা।
স্বাধ্যায়স্ত্রম্ব্যকে ভক্তির্ধর্ম্মোঽয়ং রাক্ষসঃ স্মৃতঃ ॥

পরদারাভিমর্ষণ, অন্যের জন্যই হউক বা আপনার জন্যই হউক, সকল বিষয়েই লালসা, বেদাধ্যায়ন, ও মহাদেবে ভক্তি রাক্ষসদিগের ধর্ম্ম।

পৈশাচ ধর্ম্ম।

অবিবেকস্তথাজ্ঞানং শৌচহানিরসত্যতা।
পিশাচানাময়ং ধর্ম্মঃ সদাচামিষগৃধ্নুতা॥

অবিবেকতা, অজ্ঞান, শৌচহীনতা, অসত্যতা, এবং সদা আমিষ ভক্ষণে একান্ত তৃষ্ণা এইগুলি পৈশাচ ধর্ম্মের লক্ষণ।

এক গঙ্গাই যেমন গঙ্গোত্রী, গোমুখী, হরিদ্বার, ত্রিবেণী আদিতে ভিন্ন ২ মাহাত্ম্যযুক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ এক ধর্ম্মই দেব, দানব, মানবাদির দেহ ও প্রকৃতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে।

ধর্ম্ম সমস্ত জগতের মঙ্গল বিধান ও কুশল রক্ষা করুন।

একটী সার কথা।

কোন নব্য সভ্য নৌকারোহণে গমন করিতেছিলেন। তিনি নভোমার্গে নেত্রপাত করিয়া নাবিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, নাবিক! তুমি জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিদিত আছ? নাবিক বলিল, মহাশয় আমি উহার নামও জানিনা। এতবচ্ছ্রবণে বাবু বলিলেন তবে তোমার জীবনের এক চতুর্থাংর্শ বৃথা ব্যয়িত হইয়াছে। নদীর উভয় তীরে হরিদ্বর্ণ শস্য ক্ষেত্রের শোভা সন্দর্শন করিয়া বাবু পুনঃপ্রফুল্ল মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, নাবিক! তুমি উদ্ভিদ্ বিদ্যা জান? নাবিক উত্তর করিল, না মহাশয়! তাহাতে বাবু বলিলেন, তবে তোমার জীবনের আর এক চতুর্থাংশ বৃথা বিনষ্ট হইয়াছে। ক্ষণ বিলম্বে নদীর প্রবল বেগবতীগতি দর্শনে বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, নাবিক তুমি গণিত জান? নাবিক বলিল, আমি কোন শাস্ত্রই জানি না। ইহা শুনিয়া বাবু বলিলেন, তবে তোমার জীবনের চারি ভাগের তিন

ভাগ অনর্থক ক্ষয় হইয়াছে। এই রূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে একটী প্রবল ঝড় উঠিল, নৌকা জল-মগ্ন-প্রায়, নাবিক জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল ও সাঁতার দিতে দিতে বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি সাঁতার জান কি? বাবু বলিলেন, না। নাবিক বলিল তবে দেখিতেছি, তোমার সমস্ত জীবনই বৃথা বুঝি বিনষ্ট হইল। তুমি শীঘ্রই ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত হও।

যে সকল বিদ্যা মনুষ্যকে মৃত্যু-যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিতে পারে না, তাহা শিক্ষা করিয়া অভিমান ও অহঙ্কার করা বৃথা ও মূর্খতা মাত্র। যে পরা বিদ্যা অভ্যাস পূর্ব্বক সাধু গণ সন্তরণ দ্বারা অগাধ গম্ভীর ভব-নদীর প্রবল স্রোত অতিক্রম করিয়া পাপ-তাপ, শোক, রোগ মৃত্যু আদি হইতে নিস্তার পান, তাহা সকলের শিক্ষণীয়া।

ভারতোদ্ধার।

সোনার ভারত মলিন হইল ! উৎসব-পূর্ণ গৃহ আজ আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল! ভারতের বিজয়-পতাকা প্রবল বায়ুতাড়নায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, এক্ষণে তাহার চিহ্নও আর দেখা যায় না । নির্ম্মল নীল নভোমণ্ডলে বিদ্যুদ্বল্লীবিজৃম্ভিত ঘন ঘোর মেঘমালা উদয় হইয়া ভারতকে ভয়াকুল করিয়া তুলিল । পরিমলামোদিত কুসুম-কাননে পূতিগন্ধকর পতঙ্গ-পুঞ্জ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। রাজ-প্রাসাদ প্রেত মণ্ডলীর উপদ্রবে বিঘ্নসংকুল হইয়া উঠিল। তরুণ অরুণ প্রভা-প্রফুল্লিত উষা দেবীর বিকশিত বদন-কুজ্ঝটিকায় বিবর্ণ করিয়া ফেলিল। বিশ্ব-মনোহর পূর্ণ শশধর রাহুগ্রস্ত হইল, অভ্রভেদীবিন্ধ্যাচল শিখর ভূমিতে অবনত হইয়া রহিল । ভারত বীরদর্পে নিজবিজয়-শঙ্খ বাজাইয়া জগৎকে জাগ্রত করিতেছিল, কোন্ অলক্ষিত দিক্ হইতে ভারতের বিশাল বক্ষে একটা বিষমুক্ষিত বাণ

আসিয়া বিদ্ধ হইল, ভারত অকস্মাৎ অবসন্ন মুচ্ছিত ও মৃতবৎ ভূমিতে পতিত হইল। ভারতের কণ্ঠরোধ ও হস্তপদ প্রসারণ সঙ্কোচনাদি শক্তি তিরোহিত হইয়া গেল। নেত্র নিমীলিত, শরীর স্পন্দন শূন্য; নিশ্চেষ্ট ও অসাড় ভারত স্তম্ভিত হইয়া তুমুল বিপ্লব সঙ্কুল সংসারারণ্যে ধরায় শয়ন করিয়া রহিল। ধমনীতে এখনও রক্ত সঞ্চলিত হইতেছে, শ্বাস-বায়ু এখনও নাসারন্ধ্রে যাতায়াত করিতেছে, প্রাণ বহির্গত হয় নাই, জীবনের আশাত্যাগ করিবার এখনও সময় হয় নাই। ভারতের মরণাশঙ্কা নাই। আর্য্য ঋষিগণ ভারতকে অমৃতপান করাইয়া অমর করিয়া গিয়াছেন, ভারতের প্রাণ মজ্জাগত হইয়া আছে, ভারত মূর্চ্ছিত হইয়াছে, মৃত হয় নাই। কিঞ্চিৎ শুশ্রূষা করিলেই ও উপযুক্ত ঔষধ দান করিলেই ভারত আবার সংজ্ঞালাভ করিবে, ভারত আবার পূর্ব্ববৎ বীরবেশে দণ্ডায়মান হইয়া সমস্ত জগৎকে নিজগুণে অবাক্ ও বিমোহিত করিতে পারিবে। অহো! বৃদ্ধ মুমূর্ষু ভারতের

কি কেহ শুশ্রূষু সন্তান জীবিত নাই! চিরমঙ্গল-কোলাহল কূজিত ভারত নিকেতন কি আজ জনশূন্য হইয়াছে! ভারতের কৃতজ্ঞ সন্তানগণ কি এক্ষণে ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন! আহা! ভারতের এই বিপত্তি-সাগরের কাণ্ডারী হরি এক্ষণে কোথায়! দেখ দেখ নাথ! তোমার চিরসেবক ভারত আজি নিরাশ্রয় নিঃসহায় হইয়া ধরাতলে পড়িয়া রহিয়াছে। ভারতের মণিমুক্তামণ্ডিত মুকুট আজ্ ধূলায় ধুসরিত, অভেদ্য বর্ম্ম অঙ্গস্খলিত, অসীচর্ম্ম করকমলচ্যুত হইয়াছে, কটিবন্ধন খুলিয়া পড়িয়াছে। এ সময়ে হরি! তুমি ভিন্ন আর কে ভারতের জীবন রক্ষা করিবে। তুমিই এই বিপদ্ কালে কৃপাবলে ভারতের উদ্ধার কর। দেখ নাথ! প্রতাপশীল ভারতের এই দুদ্দশা দেখিয়া ভারতলক্ষ্মী একাকিনী বিজনবনে বসিয়া সকরুণস্বরে রোদন করিতেছেন। ইঁহার সে বেশ, সে ভূষণ, সে লাবণ্য, সে মাধুর্য্য নাই। ইঁহার কটাক্ষ মাত্রেই ত্রিভুবন মোহিত হইত, আজ সেই

ভারতলক্ষ্মীর রোদন-ধ্বনি কি কাহারও কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে না! ইঁহার নয়নাশ্রু মোচন করিবার কি একটিও উপযুক্ত সন্তান নাই! শ্রেণীবদ্ধ হইয়া কৃতবিদ্য যুবকবৃন্দ ব্যাকুল ভাবে ভারতোদ্ধারে যত্ন করিতে যাইতেছ, যাও! তোমাদের উদ্যম দেখিয়া অনেক আশা হইতেছে, কিন্তু দেখো যেন তোমরা নিজ নিজ জ্ঞান ও বিদ্যাভিমানে অভিভূত হইয়া ভারত-শুশ্রূষু আর্য্যগণের উপদেশ রাশি অবহেলা করিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইও না, তাহা হইলে তোমাদের আশা পূর্ণ হওয়া সুকঠিন হইবে। বিচক্ষণ পরিণাম বিবেকী বর্গের পরামর্শ না লইয়া কোন বিষয়ে অকস্মাৎ হস্তক্ষেপ করিও না। অনেক বিষয় তোমাদের আশু-প্রীতিকর বোধ হইবে, কিন্তু যদি তাহার পরিণাম শুভফলপ্রসূ না হয়, তবে ক্লেশ হইলেও তাহা অবিলম্বে পরিত্যাগ করিবে। যদি মুমূর্ষু ভারতের মঙ্গল চাও; তবে শান্ত, ধীর, বিচারশীল হও, দেশকাল পাত্রের অবস্থা পর্য্যা-

লোচনা কর। শুষ্ককণ্ঠে একেবারে অধিক জল দান করিও না, অকস্মাৎ বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা। আর্য্যগণের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কর, তাঁহারা তোমাদিগকে ভারতোদ্ধারের উপায় বলিয়া দিবেন।

আর্য্যশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত মহাশয়গণ ! আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া কি ভাবিতেছেন! ভারতের বিপৎপাত কি আপনাদিগের হৃদগত হয় নাই, ভারতলক্ষ্মীর কাতর কণ্ঠস্বর কি আপনাদিগের শ্রুতিবিবরে এখনও প্রবেশ করে নাই! ভারতের দুর্দ্দশা কি আপনাদিগের চক্ষুর্গোচর হইতেছে না! বাল্মিকী, ব্যাস, বশিষ্ট, জৈমিনি, জাবালি, জনক, ভৃগু, ভার্গব ভরদ্বাজ, মনু, মার্কণ্ডেয়, কপিল, কশ্যপ, কণাদ, শুক, সমীক, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহামনাগণ যে ভারতের কল্যাণ জন্য বিবিধ শাস্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, আপনারাই তত্তাবতের অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহারা যে উদ্দেশ্য সাধনজন্য এতাবতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আপনারাও তাঁহাদের মুখ্য লক্ষ্য

সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, জ্ঞান আদি সাধারণ্যে প্রচার দ্বারা ভারতের কল্যাণ বিধান করুন। কেবল মাত্র কয়েকটী ছাত্রকে ব্যাকরণের ছল, আভিধানিক কূটার্থ, "ঘটত্ব" "পটত্ব" ইত্যাদি বুঝাইয়া ক্ষান্ত হইলেই চলিবে না। আর্য্যগণ আপনাদিগকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদিগের অমূল্য রত্ন রাশিরূপ শাস্ত্রজ্ঞানের পূর্ণাধিকারী করিয়াছেন। দেখিবেন যেন আপনারা আলস্য বা ঔদাস্য বশতঃ তাঁহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির কোনরূপ ত্রুটী করিয়া ভারতের কল্যাণ হানি করতঃ ভারতের পরম পূজনীয় আর্য্যগণের সম্মান লাভে বঞ্চিত না হন। তাহা হইলে পরম পবিত্র আর্য্যনামে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে। যাহাতে দেশে দেশে, ভারতের একসীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত নীতি ধর্ম্ম ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রতিগৃহ নিবিষ্টচিত্ত হয়, তাহারই যত্ন ও চেষ্টা করিয়া ভারতোদ্ধারের উপায় বিধান করুন।

ভূপালবর্গ! আপনাদিগকে আর অধিক কি বলিব, আপনারাই রাজ্য ও ধর্ম্মের উপযুক্ত রক্ষয়িতা, নারায়ণ যুগে যুগে ভূপতিগণের হস্তে ধর্ম্মরক্ষার ভারার্পণ করিয়া অবনীমণ্ডলের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। আপনাদিগের মনোযোগ উৎসাহ, উদ্যম না থাকিলে ভারতে ধর্ম্ম প্রচারের ও ভারতীয় কল্যাণ সাধনের অত্যন্ত বিঘ্ন হইবে। অর্থাদি দান দ্বারা ধর্ম্ম প্রচারাদি-কার্য্যের পথ পরিষ্কার করুন, নীতি প্রচার দ্বারা প্রত্যেক প্রজার অন্তঃকরণে বিশুদ্ধভাব আরোপণ করিয়া দিন। আর্য্যগণ রাজাকে নারায়ণাংশজ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, অতএব আপনাদিগের যত্নের উপরই ভারতের ভাবী মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। এই দুরবস্থ ভারতের মুখের দিকে যদি একবার আপনারা না চাহিবেন, তবে আর কে এই বিপদে সহায় হইবে। বিধিমতে সহায়তা করিয়া ভারত-লক্ষ্মীর অশ্রুমোচন করুন। ভারতলক্ষ্মীকে আবার ভারতের রত্ন সিংহাসনে

বসাইয়া সেবা, শুশ্রূষা করিয়া ভারতকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করুন।

শুভাশুভ কর্ম্ম।

মনুষ্য মাত্রেই কর্ম্ম-প্রিয়। প্রগাঢ় নিদ্রিতাবস্থা ভিন্ন আমরা কর্ম্ম পাশ ছেদ করিতে পারি না। কায়া দ্বারা ও বাক্য দ্বারা যখন কোন কার্য্য করি, তখনই অন্যে আমাদিগকে ক্রিয়াশীল দেখিতে পায় অন্যথা বা অলস-ভাবে বসিয়া থাকিলে নিষ্কর্ম্মা বলিয়া থাকে, কিন্তু তখনও আমরা বস্তুতঃ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি না। সে সময় সংকল্প জাল বিস্তার পূর্ব্বক মনে মনে শত শত কার্য্য করি, তাহা গণনা করা যায় না। মনুষ্যের মন যখন নির্ম্মল ও ব্রহ্মভাবে সমাহিত হয়, তখনই কেবল ক্রিয়াশূন্য হইতে পারে।

আমরা যখন যে কোন কার্য্য করি, তন্মধ্যে কোনটী

তপ, যজ্ঞ ও তীর্থযাত্রাদি এই সকল চিত্ত শুদ্ধি-
জনক কার্য্য করিবেন।

শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অশুভ কর্ম্ম রাশিকে বিনা
করিয়া অবশেষে শুভ কর্ম্মেও বীতরাগ হইতে হইবে।
যেমন একখানি জ্বলন্ত অঙ্গার একখানি গৃহকে ভস্ম
করিয়া অবশেষে আপনিও ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ শু
কর্ম্ম অশুভ কর্ম্মকে বিনাশ করিয়া আপনিও বিলু
হইয়া যায়।

"যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভাঞ্চাশুভমেব বা।
তাবন্নজায়তে মোক্ষোনৃণাং কল্পশতৈরপি।
যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তাবদ্বদ্ধোভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চ শুভাশুভৈঃ॥"

শতকল্প পর্য্যন্ত মনুষ্য দেহ ধারণ করিলেও,যে পর্য্য
শুভ ও অশুভ এতদুভয় কর্ম্মই ক্ষয় না হইবে ত
দিন মনুষ্যের মোক্ষ হইবে না। অশুভ কর্ম্ম লৌহম
ও শুভকর্ম্ম কাঞ্চনময় পাশ স্বরূপ, কিন্তু এ উভয়

জীবের বন্ধন স্বরূপ। তপস্যা দ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় হইলেই জীব বন্ধনমুক্ত হইয়া পূর্ণানন্দ স্বরূপে বিরাজ করিবে। কর্ম্মক্ষয়ে মনোনাশ ও মনোনাশই মুক্তির কারণ।

এই স্থানে একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপন্যাস লিখিতে বাধ্য হইলাম। একটি প্রেত একটি মনুষ্যের রূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক এক মহাজনের নিকট আসিয়া কহিল যে মহাশয়! আমি বিনা বেতনে আপনার দাসত্ব করিতে ইচ্ছা করি, আমাকে নিযুক্ত করুন, কিন্তু আমার পণ এই যে আমি ক্ষণ জন্যও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিব না, সর্ব্বদাই কর্ম্ম চাই; যে সময়ে আপনি আমাকে কোন কর্ম্ম দিতে না পারিবেন তখনই আমি আপনার অনিষ্ট করিব, আর আমি নিজে কর্ম্ম ত্যাগ না করিলে আমাকে কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবেন না। মহাজন বিনা বেতনে তদ্রূপ কর্ম্মঠ দাস প্রাপ্তি একটী পরম লাভ মনে করিয়া তাহাকে নিয়োগ করিলেন। কিন্তু প্রেত অলৌকিক শক্তি প্রভাবে বিলম্ব-সাধ্য কর্ম্মও ক্ষণ মধ্যে নিষ্পাদন

করে। ৬ মাসের পথের কোন সমাচার আনিতে হইলে, তৎক্ষণাৎ আনিয়া দেয়। মহাজনের আবশ্যকীয় তাবৎ কার্য্যই সে আজ্ঞা মাত্রেই সাধন করিতে লাগিল। মহাজন তাহার ক্ষিপ্রকারিতা দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং আর কর্ম্ম যোগাইতে পারেন না বলিয়া প্রেতের পণানুসারে তৎকর্ত্তৃক উপদ্রবগ্রস্ত হইতে লাগিলেন। একদিন একান্তে বসিয়া এই দুর্ব্বিপাক চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় একজন আগন্তুক আসিয়া তাঁহার মনোগ্লানির বিষয় জিজ্ঞাসা করায়, তিনি তাবদ্বিবরণ বলিলেন। তখন ঐ ব্যক্তি মহাজনকে এইরূপ উপদেশ দিলেন যে—তুমি গৃহ মধ্যে একটা বাঁশ পুঁতিয়া রাখ, যখন তাহাকে অন্য কোন কর্ম্ম না দিতে পারিবে, তখনই তাহাকে সেই "বাঁশটীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত উঠিবে ও আবার নিম্নে নামিবে" এইরূপ আদেশ করিও। আবশ্যক মত অন্য কর্ম্ম করিতে দিবে! মহাজন এই চতুর বুদ্ধি ব্যক্তির পরামর্শানুসারে কার্য্য করিলেন

প্রেত গৃহস্থের প্রয়োজনীয় কার্য্য করিয়া অনবরত বাঁশে উঠিতে ও নামিতে হয় দেখিয়া ভাবিল যে আমার আর উপদ্রব করিবার সময় বা উপায় নাই। তখন অগত্যা মহাজনকে কহিল, মহাশয়! আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি। মহাজনও কহিলেন, আমিও বাঁচিলাম। এই উপাখ্যানটীর তাৎপর্য্য এই যে—মনোরূপী প্রেত, জীবরূপ মহাজনের নিকট নিযুক্ত হইল। সংকল্প দ্বারা তাবৎ কার্য্যই ক্ষণ-মধ্যে সাধন করিয়া অবশিষ্ট সময় জীবকে অকল্যাণ-কর দুশ্চিন্তা দ্বারা খেদগ্রস্ত করে। জীবের অনুতাপ উদয় হইলে গুরুরূপী আগন্তুক আসিয়া "অবকাশ পাইলেই মনকে পরমাত্ম-চিন্তনরূপ বাঁশ অবলম্বন করিতে দিবে," তাহাকে এইরূপ শিক্ষা দেন। মন তখন আত্মাভিপ্রায়-সিদ্ধির বিঘ্ন দর্শনে কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক আত্ম-সত্তায় বিলীন হইয়া যায়। অতঃপর আর জীবকে

শুভ ও অশুভরূপ কর্ম্মময় ভবসাগরে সুখ দুঃখ রূপ তরঙ্গে আকুলিত হইতে হয় না।

করিলাম কি !

একান্ত স্থানে শান্ত হৃদয়ে এক ভয়ঙ্কর তরঙ্গ উঠিল। কোথায় ছিলাম, কোথায়ই বা আসিলাম, কি জন্যই বা আসিলাম, আসিয়াই বা করিলাম কি !। এখানে আমাকে কে আনিলেন ! কেনই বা আনিলেন কিরূপেই বা আনিলেন এবং যে জন্য আনিলেন, তাহারই বা করিলাম কি !। এখানে আসিয়া কত কিই দেখিলাম, কত কিই শুনিলাম, কত কিই বলিলাম, কত কিই ভাবিলাম, কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়াই বা করিলাম কি !। এখানে পিতা মাতা পাইলাম, ভাই ভগ্নি পাইলাম, স্ত্রী. পুত্র পাইলাম, (?) বন্ধু, বান্ধব পাইলাম, ধনজন পাইলাম, সুখ সম্পদ পাইলাম, পাইয়াই বা করিলাম কি !। নানা ভাষা শিখিলাম, নানা

দেশ বেড়াইলাম, নানা বস্তু দেখিলাম, নানা লোকের সঙ্গে রহিলাম, নানা গ্রন্থ পড়িলাম, নানা তর্ক বিতর্কে দিন কাটাইলাম, অবশেষে করিলাম কি ! । শরীর সবল হইল, ইন্দ্রিয়গণ প্রবল হইয়া কার্য্য করিতে লাগিল, মন বুদ্ধির প্রণয় জন্মিল, সংশয়-সিদ্ধান্তের প্রচণ্ড দ্বন্দ্ববায়ু বহিল, বিবেক বিচার বিষয়বিকারাদি সহ তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বিবাদ লাগিল, সংসার-সমুদ্রে প্রলয়-তুফান উঠিল, কিন্তু আমি করিলাম কি ! । যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই সাম্প্রদায়িক গণের বষম মতভেদ, ক্রিয়াভেদ—কেহ রাজনীতি, কেহ সমাজনীতি কেহ সমরনীতি, কেহ বা ধর্ম্মনীতি লইয়া ব্যস্ত ; কেহ বলিতেছে, কেহ শুনিতেছে, কেহ বুঝাইতেছে, কেহ স্তব্ধ রহিয়াছে, কেহ আন্দোলন করিতেছে ; কেহ শাসন করিতেছে, কেহ দ্বৈরদসিংহাসনে, কেহ বা ধরাসনে বসিয়াছে ; কেহ কাঁদিতেছে, কেহ হাঁসিতেছে, কেহ বা অবাক্

হইয়া রহিয়াছে—সংসারহট্টে সকলেই ঘুরিতেছে ও চীৎকার করিতেছে, সকলেই গোলমালের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, কিন্তু হা! আমি করিলাম কি!। কেহ ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করিয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হইতেছে, কেহ গার্হস্থনীতি বুঝিতে না পারিয়া কর্ত্তব্য পালনে অপারগতা বশতঃ বৃথা গৃহী হইয়াই নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছে, কেহ সন্ন্যাসী কেহ বা যোগী হইয়া, ভগবানের সন্নিকর্ষানুভব করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন, কেহ শাস্ত্রাধ্যাপন দ্বারা দেশে দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, কেহ ভক্তি-সরোবরের আনন্দ-সরোজ-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, কেহ ভগবৎসত্ত্বানুভূতিরূপ গভীরসমুদ্রে মগ্ন হইয়া যাইতেছেন, কিন্তু হা! আমি করিলাম কি!। আমি রক্তের তেজে নাস্তিক হইয়া, মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক বলি "ভগবান্ নাই", বিষম বিষয়-বিষপানে-বিহ্বল হইয়া, অসৎসঙ্গে থাকিয়া সাধুহৃদয়গণেরও সাংসারিক ক্লেশ ও দুর্নীতিপরায়ণ পাপাত্মাগণেরও বৈষয়িক উন্নতি দেখিয়া

সময়ে সময়ে বলি "ভগবান্ নাই", দুঃখে পড়িয়া বলি, "ভগবান্ নাই," আমার পাপ চক্ষে তাঁহাকে দেখিতে পাই না বলিয়া বলি, " ভগবান্ নাই, " দুরাত্মা দুরাচারগণের তদ্দণ্ডেই কোন বিষম ঐশী দণ্ড বিধান হইল না দেখিয়া "বলি," ভগবান্ নাই, কিন্তু তাঁহার অনন্ত সৃষ্টি রুষ্ট হইয়া বজ্রনিনাদে তিরস্কার পূর্ব্বক আমাকে বলিল, রে পাপ ! তুই সামান্য ধুলিকণামাত্র, তোর এত কি সাহস, এত কি সামার্থ্য, যে তুই বলিস্ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধিনায়ক অনাদি অনন্তস্বরূপ ভগবান্ নাই। তুই জানিস্ না যে তোর মত কোটী কোটী জীব মুহুর্মুহুঃ তিনি সৃষ্টি করিতেছেন আবার পলকমাত্রে প্রলয়-পয়োধি-প্রবাহে ভাসাইয়া ক্রীড়া করিতেছেন ! তখন কম্পিতকলেবরে ভয়ে ভাবিলাম, হায় হায় ! আমি করিলাম কি ! ! তরু, লতা গুল্ম, ফুল, ফল, আদি যাঁহার সত্তার সাক্ষ্য দান করিতেছে, হিমালয় উন্নত মস্তকে যাঁহার কীর্ত্তি ও জয় ঘোষণা করিতেছে, সমুদ্র যাঁহাকে

দর্শন করিবে বলিয়া উত্তাল-তরঙ্গ-মালায় পৃথিবীময় নৃত্য করিতেছে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র আদি দলে ২ যাঁহার যশঃকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না,হায়! তবে আমি করিলাম কি!। গুরু যাঁহাকে চিনিবার জন্য উপদেশ দান করিলেন, চতুর্দ্দশ ভুবন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে যাঁহার অন্বেষণ করিতেছে, যিনি অন্তরে, বাহিরে, পশ্চাতে ও সম্মুখে থাকিতেও কেহ ধরিতে পারিতেছে না অথচ যিনি সমস্ত ধারণ করিয়া আছেন, সেই সার সুধানিধিকে আমি আলিঙ্গন করিতে পারিলাম না, তবে আমি করিলাম কি!। বিজ্ঞান-শাস্ত্র আলোচনা করিয়া সমস্ত বস্তুরই পরিচয় লইতেছি, কিন্তু "আমি কে" তাহার পরিচয় লইলাম না, "আমার কে" তাহাও বুঝিলাম না, "তুমি" "আমি" "তিনি" আদি শব্দে কাহাকে নির্দ্দেশ করি, তাহার তত্ত্ব বিদিত হইলাম না, হা! দেহ-ধারণ করিয়া তবে আমি করিলাম কি!। যাঁহার

যাঁহার সংসার, সর্ব্বস্ব, যাঁহার "আমি", তাঁহাকে সমস্ত সমর্পণ না করিয়া দেহাভিমানী "আমি কর্ত্তা" হইয়া বসিলাম, উঃ, এই দুষ্ক্রিয়া বশতঃ ঐ যে যম দশনে অধর নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক আমাকে শাসন করিবার নিমিত্ত মৃত্যু-দণ্ড-হস্তে আগমন করিতেছে. হায় হায়! আমি তাহা না বুঝিয়া করিলাম কি! যাঁহার নাম করিলে আনন্দসিন্ধু উথলিয়া উঠে, যাঁহাকে ভাবিলে ভয় ভাবনা দূরে পলায়ন করে, যাঁহাকে স্মরণ মাত্র বিপদ সম্পদ সমান হয়. যাঁহার চরণে প্রণত হইলে জন্ম মরণ যন্ত্রণা জীবকে স্পর্শও করে না, হা! হৃদয়মন্দিরে তাঁহার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্থাপন করিতে পারিলাম না, তবে দুর্লভ মানব জন্ম পাইয়া আমি করিলাম কি!।

গুরুদেব! অবোধ শিষ্যের প্রতি কৃপা বিতরণ কর, তুমিই আমার গতি; আত্ম-মন্ত্রে যাঁহার ইঙ্গিত করিয়াছ, আশীর্ব্বাদ কর, যেন তাঁহার পূর্ণ সত্তায় নিজ-সত্তা বিসর্জ্জন দিতে পারি। যদি তাহাই না পারিলাম,

তবে তোমার অভয়-চরণে শরণাপন্ন হইয়াই বা করিলাম কি!!।

হে ত্রিজগদ্‌গুরো! সকল বস্তুর মূলে তোমার সত্তা, "অস্তি" শব্দ তোমারই জীবন্ত ও জ্বলন্ত সত্তাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, তুমি স্বীয় সত্তায় জগৎ প্রকাশিত করিয়াছ, " আমার " সত্তাও দেখাইয়া দাও! যদি তোমার কৃপায় আমার "আমিত্বই" বুঝিতে না পারিলাম, তবে তোমার কৃপা-কল্পতরুতলে থাকিয়াই বা করিলাম কি!!!।

মনুষ্য! সচেতন হও, নিজ জীবনী সমালোচনা কর, আর একান্তে বসিয়া মনঃ-প্রাণে ঐক্য করত আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা কর, " এত দিন আমি করিলাম কি "!!!।

কামিনীকুলের কলঙ্কভঞ্জন।

আর্য্য শাস্ত্রপ্রণেতৃগণ যখন প্রত্যেক জীবের অধিকার,

চরিত্র, কার্য্যকলাপ ব্যাখ্যান দ্বারা জগতের হিতসাধনে প্রবৃত্ত ছিলেন, যে সময়ে লোকসমাজের সুশৃঙ্খলা ও সৌষ্ঠব রক্ষা করা তাঁহাদের সাধু ভাবের প্রধান অঙ্গ ছিল, যে সময়ে মানবগণকে ধরাধামে একমাত্র ধর্ম্মাধিকারী ও সকল প্রাণীর প্রধান বলিয়া প্রতীতি করিয়াছিলেন, যে সময়ে দেখিলেন যে ললনাগণের স্নেহ, যত্ন ও সাহায্য ব্যতীত শিশু উত্তমাঙ্গ ও সভাব লাভ করিতে পরে না, সে সময়ে তাঁহারা স্ত্রী জাতিকে কুলাভরণ বলিয়া শাস্ত্রাদিতে প্রচার করিয়াছেন। যে সময়ে দেখিলেন স্ত্রী ও পুরুষ এতদুভয়ের পরস্পর সাহচর্য্য ভিন্ন গার্হস্থ্যাশ্রমের অনেক কার্য্য অপূর্ণাঙ্গ থাকিয়া যায়; যখন দেখিলেন ধার্ম্মিক গৃহীর একটী কোমল প্রকৃতির আদর্শ ও সহধর্ম্মিণী আবশ্যক এবং যখন বিবেচনা করিলেন, স্ত্রীজাতি মানবধর্ম্মের অঙ্গ পূরণে অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ, তখন তাঁহারা স্ত্রীজাতিকে গৃহস্থগণের ভূসণ স্বরূপ বলিয়া সমাদর করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ যখন ত্যাগী সন্ন্যাসী

পরিব্রাজকগণের তীব্র উপদেশের প্রতি গৃহীগণের কর্ণ ধাবিত হইল, যখন গৃহীগণ নিজোচিত উপদেশ অবহেলা করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম ও বৈরাগ্যাশ্রম উৎকৃষ্ট বলিয়া মান্য করিতে লাগিল, এবং সন্ন্যাস-ধর্ম্মের কথা মধুর ও চমৎকার বলিয়া গৃহীগণ যখন তাঁহাদেরই গ্রন্থ পাঠে ও চরিত্র সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল, সেই সময় হইতেই ভোগীগণ যোগীগণের ন্যায় স্ত্রীজাতিকে নিন্দা অনাস্থা পূর্ব্বক, বন্ধনের কারণ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল। কেবল অবহেলা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিল না, বরং তাহাদের উপর অনেক দোষারোপ ও গ্লানি করিতেও প্রবৃত্ত হইল। এবং যাহারা শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম, তাহারাও ধর্ম্ম-সাধনের সহচারিণী কামিনীকে শাস্ত্র বাক্যানুসারে ঘৃণা করিতে লাগিল। স্ত্রীগণের সম্বন্ধে যে কতকগুলি অপকলঙ্ক প্রচারিত আছে, শাস্ত্র বাক্যের দ্বারা আমরা তাহারই যথাযথ ব্যাখ্যান করিবার চেষ্টা করিব। পুরুষবর্গ কামিনীগণকে সদ্ভাবাঞ্জনানুরঞ্জিত নেত্রে

অবলোকন করেন ইহাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

"আহারং দ্বিগুণং প্রোক্তং বুদ্ধিস্তস্যাশ্চতুর্গুণাঃ।
ব্যবসায়ঃ ষড়্গুণঃ প্রোক্তঃ কামাশ্চাষ্টাগুণাঃস্মৃতা॥

স্ত্রীজাতি আহারে পুরুষাপেক্ষা দ্বিগুণ, বুদ্ধিতে চতুর্গুণ, ব্যবসায়ে (কার্য্য, ব্যাপারাদিতে) ছয় গুণ ও কামে অষ্ট গুণ। এই শ্লোকটী জন সাধারণের উন্মীলিত নয়ন সমক্ষে স্ত্রীদিগকে উপহাস, অনাস্থা ও ঘৃণার দ্রব্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। আমরা এক্ষণে ইহার তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা না করিয়া কামিনীগণের প্রতি বৃথা দোষারোপ করিতে চাহিনা।

পুরুষগণ দুই বেলাই উদরপূর্ত্তি করিয়া ভোজন ও সময়ানুসারে মিষ্টান্নাদিও পৃথক্ খাইয়া থাকেন। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে স্ত্রীগণ প্রায় সচরাচর দুই বেলা ভোজন করে মাত্র, কিন্তু নিয়মিত জল খাওয়া সকলের ভাগ্যেই ঘটে না—বিধবাগণের দিবসে একবার মাত্র হবিষ্যাশন ও সধবাগণের গর্ভাবস্থাতে অল্পাহার

হইয়া থাকে। জীবনের পরিমাণে পুরুষগণের অপেক্ষা স্ত্রীজাতি দ্বিগুণ দূরে থাকুক, অল্প ভিন্ন অধিক ভোজন করে না। নারীর বুদ্ধি চতুর্গুণ, একথাটী নিতান্ত প্রলাপ বলিলেও হয়। কয়জন স্ত্রী ব্রহ্মা, বাল্মিকী, ব্যাস, মহর্ষি শেষাবতার, কপিল, আসুরি, গোতমের ন্যায় বুদ্ধি লাভ করিয়াছে? কয়জন স্ত্রী. কণাদ, যাস্ক বাৎস্যায়ন ঋষি, শঙ্করাচার্য্য, পাণিনি, জৈমিনি, মুনি কাত্যায়ন আদির ন্যায় ধীশক্তি সপন্ন হইয়াছে? কয়টী স্ত্রীর কীর্ত্তিস্তম্ভ ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? উক্ত মহাত্মা আদির কীর্ত্তি কলাপ ভারতে দেদীপ্যমান থাকিতে নারী-বুদ্ধি চতুর্গুণ বলা কি সুধীগণের যোগ্য? যদি বুদ্ধি ক্ষুদ্র মানিতে হয় তবে ব্যবসায়ে (বুদ্ধির ব্যাপারে) নারী কিরূপে ষড়্ গুণ হইবে? স্ত্রীগণের কাম পুরুষাপেক্ষা অষ্ট গুণ। এটী বলিতেও লজ্জা হয়। পুরুষগণ বহু বিবাহে আসক্ত, স্ত্রীগণ একমাত্র পতিলাভে সন্তুষ্ট। স্ত্রীহীন পুরুষ পুনর্ব্বিবাহে প্রবৃত্ত, বিধবা ব্রহ্মচর্য্য-

পরায়ণা। অতএব নারীবৈরীগণ অকারণে নারীমনে-মর্ম্মান্তিক বেদনা দিয়া থাকে। এইক্ষণে প্রোক্ত শ্লোকের মর্ম্মার্থ তাৎপর্য্য কহিব।

নর ও নারীর প্রকৃত অর্থ পুরুষ ও প্রকৃতি। আহারার্থ ভোজন নহে, এখানে প্রবৃত্তি স্বরূপ বুঝিতে হইবে। পুরুষের একমাত্র প্রবৃত্তি আছে—যদ্দারা জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে; প্রকৃতির আহার বা প্রবৃত্তি দ্বিবিধ, ভোগ ও অপবর্গ। বাস্তবিক ভোজনে দ্বিগুণ নহে। পুরুষাপেক্ষা প্রকৃতিতে বুদ্ধি চতুর্গুণ আছে। পুরুষের স্বরূপ-চৈতন্যই এক মাত্র বুদ্ধি কিন্তু প্রকৃতিতে লৌকিকী সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই বুদ্ধি চতুষ্টয় রহিয়াছে। আনন্দোপভোগই পুরুষের একমাত্র ব্যবসায় কিন্তু দর্শনশাস্ত্রে সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য "ভগ" শব্দবাচ্য এই ছয়টী প্রকৃতির ব্যবসায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং পুরুষাপেক্ষা প্রকৃতির ব্যবসায় ষড় গুণ। আবার কাম শব্দে রিপু

রতিপতি নহে, কামের ন্যায়দর্শন-সঙ্গত যথার্থ অর্থ কামনা। দ্বৈতবাদীরা বলেন পুরুষের একমাত্র ইচ্ছা মুক্তিলাভ, কিন্তু প্রকৃতি অণিমা, মহিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রাপ্তি প্রকাম্য, ঈশিতা ও বশিতা এতৎ অষ্ট সিদ্ধির কামনা করেন। এইরূপ পুরুষাপেক্ষা শরীর (প্রকৃতির) অষ্ট-গুণ কাম প্রসিদ্ধ হইল। এক্ষণে উত্তম প্রতীতি হইতেছে সাধারণের কলুষিত চক্ষু স্ত্রীজাতিকে ভ্রম বশতঃ কলঙ্কিত দেখিতেছে, বাস্তবিক তাহা নহে। স্ত্রীজাতি কোমল প্রকৃতি, এবং স্নেহ, মমতা ও প্রীতির আধার স্বরূপ বলিতে হইবে। পুরুষগণের বিলাস-কৌতুক-কলুষিত নেত্রে কামিনী কুলের প্রকৃতিতে যে কলঙ্ক দেখিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কামিনী কুল পুরুষগণের সদ্ভাব-বর্দ্ধিনী হইলে ভারতের কল্যাণ হইবে। ভগবদ্ভাবাঞ্জনে ভারতীয় নর নারীর চক্ষু অনুরঞ্জিত হউক।

রাজা ও সাধু।

কোন সময়ে জনৈক রাজা বন মধ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। তিনি একটী মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং একটী বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে দেখিলেন, যে একজন তপস্বী প্রেমাশ্রু-পূর্ণ লোচনে ভগবদ্‌গুণানুবাদ গান করিতেছেন। রাজা তাঁহার নিকটে গিয়া প্রণাম পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাত্মন্! আপনি একাকী এই বিজন বনে কিরূপে বাস করেন? তপস্বী বলিলেন, রাজন্ আমি ক্ষণ জন্যও একাকী থাকিনা, সর্ব্বসামর্থ্যশীল পরমেশ্বর নিরন্তর আমার সঙ্গে রহিয়াছেন।

রা। সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সর্পাদি সাক্ষাৎ কাল স্বরূপ ভীষণ জন্তু গণ এখানে সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে, ইহাদিগকে দেখিয়া কি আপনার ভয় হয়না?

ত । আমি আপনার ন্যায় ধনুর্ব্বাণ লইয়া কখনও উহাদিগকে বধ করিবার চেষ্টা করিনা। আমার মনেও কখন তাহাদের প্রতি বৈরভাব উদয় হয়না, তবে উহারা কেন আমার শত্রুতাচরণ করিবে? বরং সর্ব্বত্র আত্ম-দৃষ্টি বশতঃ আমি তাহাদিগকে মিত্রভাবে প্রেম করিয়া থাকি, তাহাতে উহারা আমার রক্ষণাবেক্ষণই করিয়া থাকে।

রা। এখানে তো অন্য কোন মনুষ্য নাই, তবে আপনার ভোজনাদির কিরূপ ব্যবস্থা হয়?

ত। লোকালয়ে যিনি ভোজন দান করেন, তিনি এখানেও নিত্য বিরাজমান। তাঁহার আজ্ঞানুসারে বৃক্ষ সমূহ আমার আবশ্যক মত সুরস ফল, পত্র, কন্দ আদি প্রস্তুত রাখে।

রা। আপনি একজন মহাত্মা। আপনার বিশেষ পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি।

ত। গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া নিজ পরিচয়

জানিয়া লউন, তৎপরে আমার পরিচয় জানিতে আর বিলম্ব হইবে না।

রা। আপনিই প্রকৃত ত্যাগী পুরুষ।

ত। আমি না আপনি? আমি নিত্য অমূল্য পরম পদার্থ লাভের জন্য তুচ্ছ সংসার মাত্র ত্যাগ করিয়াছি, যাহা বাস্তবিক কিছুই নয় বলিলেও হয়। আর আপনি কিঞ্চিৎ স্বপ্নবৎ সুখেই তৃপ্ত হইয়া অমূল্য পদার্থের দিকে চাহিয়াও দেখেন না। আমি সর্ব্বোত্তমের জন্য বৃথা পদার্থ ত্যাগ করিয়াছি মাত্র, কিন্তু আপনি তুচ্ছ সংসারের নিমিত্ত সর্ব্ব স্বরূপ পরম পদার্থকে ত্যাগ করিয়াছেন, অতএব আপনিই সর্ব্বত্যাগী!!!

রা। (লজ্জিত হইয়া) মহাত্মন্! আমি দিবাতে রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করি, রাত্রিতে সুকোমল শয্যায় শুইয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করি, অতএব অধিক সুখী কে, আপনি কি আমি?

ত। আমি। কেননা আপনি সমস্ত দিন রাজকীয়

চিন্তায় ব্যাকুল, ও সদাই শত্রুভয়ে ভীত; আমি সমস্ত দিন পরমাত্ম-সত্তায় নিমগ্ন থাকিয়া অতুল আনন্দ রস পান করি। রাত্রিতে নিদ্রিত হইলে আপনারও কোমল শয্যা স্মরণ থাকেনা, আমারও বৃক্ষতল মনে পড়েনা। সুতরাং তখন উভয়ের অবস্থাই এক। বরং মধ্যে ২ স্বপ্ন জন্য আপনার সুখ-নিদ্রার ব্যাঘাত হয়; অতএব আপনার সুখ কোথায়?

রাজা সাধু অপেক্ষা নিজ অবস্থা হীন বুঝিতে পারিয়া সাধুকে বারম্বার প্রণাম পূর্ব্বক মনে ২ তত্ত্বাবৎ বিচার করিতে ২ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

পাপের কথা শুনিলে লোকে চমকিয়া উঠে। লোকে পাপ হইতে দূরে থাকিতে চায় ও পাপকে বড় ভয় করে। ধর্ম্মরাজ্য পাপের নামে টলমল করিয়া উঠে। সকল ধর্ম্মপুস্তকেই পাপের বড় বীভৎস চিত্র

অঙ্কিত হইয়াছে। পাপের সঙ্গে জ্বলন্ত নরকাগ্নির, পাপের সঙ্গে শূল, শেল ও অঙ্কুশাঘাতের, পাপের সঙ্গে কৃমিকীট-পূর্ণ বিষ্ঠা, পূয, শোণিত কুণ্ডের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ চিত্রিত হইয়াছে। পাপ মানবের সুখরাজ্যের পরম শত্রু, ইহা চিরদিন জগতে বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে। যাহাকে আমরা শত্রু বলিয়া দূরে রাখিতে চাই, তাহাকে, না ডাকিতেও আমার কাছে সে আসে কেন? আমি যাহাকে আদৌ ভাল বাসিনা, সে আমার সঙ্গ ছাড়ে না কেন? এ প্রহেলিকার গূঢ় রহস্য ভেদ করা বড় কঠিন। পাপ পদার্থটা কি, তাহার একবার পরিচয় লওয়া আবশ্যক। তুমি বলিবে, ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করার নাম পাপ। আমি বলি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। ঈশ্বরের "ইচ্ছা" প্রকৃতির নামান্তর মাত্র। প্রকৃতির গতিকে রোধ করিতে কেহই সমর্থ নহে। কিন্তু ঈশ্বরের "ইচ্ছা" অর্থাৎ প্রকৃতির গতি বুঝিতে না পারিয়া যে নিজ

কল্যাণানুকূল পথ পরিহার করিয়া যায়, সেই পাপী। পাপের ফল পরলোকেই ভোগ করিতে হয়, তাহা নহে। পাপের প্রকৃতি অনুসারে কতক ইহলোকে, কতক পরলোকেও ভোগ হইয়া থাকে। প্রকৃতি ন্যায়ের দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি পাপের জন্য কাহাকেও ক্ষমা করেন না। তুমি অজ্ঞানী হও—অসমর্থ হও, পাপের জন্য তোমার ফল ভোগ করিতেই হইবে। তুমি অজ্ঞানী. প্রকৃতির নিয়ম অবগত নও, অগ্নিতে হাত দিলে দগ্ধ হয়, ইহা তুমি জাননা; জান বা নাই জান, অগ্নিতে হস্ত দিলেই অগ্নির প্রকৃতি তোমাকে দগ্ধ করিবে। তুমি শিশু, অজ্ঞান বলিয়া ক্ষমা করিবেন না। এই প্রকৃতির নিয়ম না বুঝিয়া যে কাজ করিল, সে পাপের ফল হাতে হাতে পাইল। জীব এই রূপ পাপ নিরন্তর করিতেছে, ফলও যথা সময়ে পাইতেছে। এই রূপ সামাজিক বা রাজনৈতিক যখন যাহার নিরূপিত নিয়ম প্রতিপালন করিতে না পারিবে,

তখনই দণ্ডিত হইবে। কিন্তু আমরা যে পাপের কথা পূর্ব্বে বলিতেছিলাম, তাহা আধ্যাত্মিক। অসত্যকথন, পরস্বাপহরণ, পরদারাভিমর্ষণ প্রভৃতি শাস্ত্র-কথিত পাপ গুলি আধ্যাত্মিক রাজ্যের। তুমি হয়ত শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম অবগত না হইয়া বলিবে—মিথ্যা "বলা" পাপ, চুরি "করা" পাপ, পরনারীতে "অভিগমন" করা পাপ। বস্তুতঃ এ গুলিকে পাপ বলেনা। মিথ্যা "কহিলে", চুরি "করিলে," পরদার "গমন করিলে" যে "ফলের" উদয় হয়, অর্থাৎ অন্তঃকরণে যে একটী "সংস্কার" রূপ দাগ পড়ে, তাহারই নাম পাপ। কুকার্য্য পাপ নহে, কিন্তু কু কার্য্যে প্রবৃত্তিই পাপ এবং কু কার্য্য জনিত সংস্কারই পাপ। মনু বলিয়াছেন—

"ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।"

তুমি হয়তো ইহার অর্থ করিবে, যে মাংস-ভোজনে, মদ্য-সেবনে ও মৈথুনে পাপ নাই, কেননা ইহাই

জীবগণের সাধারণ প্রবৃত্তি। তবে এতাবৎ হইতে নিবৃত্ত হইলে মহা ফল হয়। বস্তুতঃ তোমার এ অর্থ ভ্রমসঙ্কুল। প্রকৃতার্থ এই যে মাংস "ভোজন," মদ্য "সেবন" এবং পরনারী "গমন" রূপ "ক্রিয়াতে" দোষ বা পাপ নাই, কিন্তু এতাবৎ অনুষ্ঠানের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিই পাপ এবং ঈদৃশী বাসনার নিবৃত্তিই পরম ফলদায়িকা। অনেক সময় জীব পুণ্য কার্য্য করিতে গিয়া পাপ ভোগ করিয়া থাকে। মনে কর তুমি "দান" করা পুণ্য ভাবিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিলে, কিন্তু দান করিবার সময় "আমি দাতা"! "সকলে আমার যশোগান করিবে" এই গর্ব্বের উদয় হইল—এই দানে তোমার পুণ্য না হইয়া পাপ ভোগ করিতে হইল। কেননা দানের শুভ সঙ্কল্প তোমার মনে স্থান পাইল না, কিন্তু গর্ব্বের কলঙ্ক-রেখা মনে গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া গেল। এই জন্যই নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠাতাগণ শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াও তাহার ফল-ভাগী হয়েন না। এই জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে

লীলা করিয়াও নিষ্পাপ ও নির্ম্মল বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন।

শুভাশুভ কর্ম্ম জন্য যাঁহাদের অন্তঃকরণে আদৌ দাগ লাগেনা, সেই মহানুভব গণের কথা আন্দোলন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কার্য্য করিলেই কর্ত্তৃত্বাভিমান বশতঃ যে মানবগণের অন্তঃকরণে সংস্কার রূপ দাগ লাগে, তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? পাপের প্রায়শ্চিত্ত নানা স্থানে নানারূপ বিহিত হইয়াছে। নানা কৃচ্ছ্র সাধন, তপশ্চর্য্যা, যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি পাপের প্রায়শ্চিত্ত রূপে ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কোথাও তীর্থ-পর্য্যটন, কোথাও কোনরূপ মন্ত্রজপ, ইত্যাদি ব্যবস্থা হইয়াছে। একই পাপের প্রায়শ্চিত্ত নানা স্থানে নানারূপে বিহিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বস্তুতঃ কোন্ প্রায়শ্চিত্তটী করিলে পাপের শান্তি হয়, তাহাই বিবেচ্য। শাস্ত্রে লিখিত আছে, গঙ্গাস্নান করিলে সমস্ত পাপের ক্ষয় হয় ও হরিনাম করিলে সমস্ত পাপের শান্তি হয়।

পরদাররতো বাপি পরাপকৃতিকারকঃ।

স শুদ্ধো মুক্তিমাপ্নোতি হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥

মৎস্যপুরাণং।

পরদার-নিরত, পরানিষ্টকারী পাতকী হরিনাম-কীর্ত্তনে নিষ্পাপ হইয়া মুক্তি লাভ করে। তুমি হয় তো বলিবে, শাস্ত্রের এই শ্লোক গুলি রোচক মাত্র, বস্তুতঃ সত্য নহে। ইহাতে শাস্ত্রের প্রতি নিতান্ত দোষারোপ করা হইল। মনের মলিনতা ও চির দিনের সংস্কার বশতঃ পাপকে যত বিশাল ও ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ আছে, হরিতে তোমার তাদৃশ বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা নাই। পাপকে তোমার বিশাল বোধ হইল, হরির নাম তাহা অপেক্ষা যে সুবিশাল নহে তাহা তোমাকে কে বলিল? অন্ধকার দেখিতে দিগ্ব্যাপী ও অত্যন্ত বিশাল—দেখিলে বোধ হয়, উহাকে দূর করা বড় কঠিন। কিন্তু ক্ষুদ্র দীপ-বর্ত্তিকা প্রজ্জ্বলিত হইলেই গৃহের অন্ধকার কোথায় পলায়ন করে, তাহার নিদর্শন থাকে না। তুমি পাপকে যে রূপ প্রকাণ্ড দেখ, পাপ-হন্তাকেও সেইরূপ একটা

প্রকাণ্ড আকারে দেখিতে চাও। একজন রোগী জ্বর-বিকারে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, তুমি মনে কর, আধ ঘণ্টা অন্তর আধ ছটাক করিয়া ডাক্তারের কটু কষায় ঔষধ সেবন করাইলেই উপযুক্ত চিকিৎসা হইল। কবিরাজের ক্ষুদ্র সূচিকাভরণও তাহার যে মহৌষধ, হোমিও-প্যাথিকের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বটিকাও বিকার-বিঘ্ন বিঘাতনে যে সমর্থ, ইহা তোমার সহসা বিশ্বাস হয় না। দেখিতে ক্ষুদ্র হইলে কি হইবে, তাহার শক্তি প্রবল। বহু দিন ধরিয়া যোগ যাগ করিলে তোমার মনে হয়—বহু দিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। কিন্তু একবার হরি বলিলেই, একবার গঙ্গাস্নান করিলেই যে সমস্ত পাপের ক্ষয় হয়, ইহা স্বীকার করিলে না কেন? তুমি বলিবে, গঙ্গা-স্নানে, হরি নামে আমার পাপ গেল কৈ? আমি যেমন ছিলাম তেমনই তো আছি। তোমার মনের দুর্ব্বলতাই ইহার কারণ। হরি নাম বা গঙ্গা স্নানের দোষ নাই। তুমি রজ্জু-দর্শনে সর্প ভ্রম করিয়া চীৎকার করিয়া

উঠিলে, তোমার শরীর কাঁপিয়া উঠিল, মুখ মলিন হইয়া গেল, বুক ধড়ধড় করিতে লাগিল। তোমার পিতা প্রদীপ আনিয়া দেখাইলেন—উহা সর্প নহে, রজ্জু। তুমি বলবান্ হইলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত উদ্বেগ কাটিয়া যাইত, কিন্তু তুমি দুর্ব্বল বলিয়া, সর্প-ভ্রম দূর হইলেও তোমার বুকের ধড় ধড়ানি শীঘ্র বন্ধ হইল না। যদি বিশ্বাসের দ্বারা চিত্তের বল বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাও, স্ফুলিঙ্গ মাত্র অগ্নিতে ক্ষণ মধ্যে তৃণ-স্তূপ দাহনের ন্যায় হরি নামাদিতে তোমার সমস্ত পাপের ক্ষয় হইয়া থাকে। যিনি রোগের নিরূপণ করিয়াছেন, তিনিই ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে শাস্ত্র পাপের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই শাস্ত্রই হরিনাম কীর্ত্তনাদি তাহার প্রায়শ্চিত্ত, ইহা লিখিয়াছেন তবে অবিশ্বাস কেন ?

একটা বেশ্যা চিরদিন ভ্রূণহত্যা, ব্রহ্মহত্যাদি নানা পাপাচার করিয়া পরিশেষে পরিতপ্ত ও পারলৌকিক

যাতনার ভয়ে ভীত হইয়া পণ্ডিতের নিকট প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিল। পণ্ডিত বলিলেন, তোমার ন্যায় পাতকিনীর পতিতপাবনী গঙ্গাতে স্নান ভিন্ন আর কোন প্রায়শ্চিত্তেই উদ্ধার দেখিতেছিনা। তুষানলেও তোমার সদ্গতি হওয়া অসম্ভব। তবে সর্ব্বপাপ-সংহর্ত্রী জাহ্নবীর দয়ায় উদ্ধার হইতে পার। বেশ্যা প্রত্যহ প্রাতঃস্নান আরম্ভ করিল। স্নানান্তে "মা! যদি সত্য হয়, তবে সবই সত্য, আর যদি মিথ্যা হয় তবে সবই মিথ্যা" এই বলিয়া গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া গৃহে আসিত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি শাস্ত্র বাক্যানুসারে আমার পাপ সত্য হয়, তবে তোমার মহিমাও সত্য, অতএব আমি পাপ-মুক্ত হইলাম। আর যদি শাস্ত্র-লিখিতানুরূপ তোমার মহিমা মিথ্যা হয়, তবে সেই শাস্ত্রেরই লেখা আমার পাপই কেবল সত্য হইবে কেন? উহাও মিথ্যা। তাহা হইলেও আমি পাপশূন্য, কেননা শাস্ত্রের একটা কথা সত্য, অপরটা মিথ্যা হইতে

পারে না। এইরূপ শাস্ত্র-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া বেশ্যা কিছু দিনের মধ্যে পরম ভক্তিমতী ও নিষ্পাপ হইয়া শান্তি লাভ করিল। অজামিলের জীবনীও ইহার সাক্ষ্য-দান করিতেছে।

দেখিয়া থাকিবে সামান্য একটী তৃণ মূলের দ্বারা অতি কঠিন পীড়াও আরোগ্য হইয়া থাকে। রোগী পাছে সামান্য গাছের নাম শুনিলে ঔষধে অনাস্থা বা অশ্রদ্ধা করে, সেই জন্য চিকিৎসক তৃণমূলটী অন্য একটী পদার্থের সহিত মিশাইয়া রোগীকে দুর্ম্মূল্য ঔষধ বলিয়া সেবন করিতে দেন। রোগী তৎসেবনে রোগমুক্ত হইয়া থাকে। গঙ্গাস্নান, হরি নাম-কীর্ত্তনাদি বাস্তবিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত; কিন্তু ভব রোগাক্রান্ত অবিশ্বাসী, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির জন্যই যোগ যাগ, ব্রত, নিয়ম কৃচ্ছ্র আদির সহিত উহা মিশাইয়া সেবন করিতে দেওয়া হইয়াছে। হরিনাম-কীর্ত্তন গঙ্গাস্নানাদি দ্বারা যে যে স্থলে পাপ মোচনের কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,

তত্তাবৎ সর্ব্বথা প্রকৃত বলিতে হইবে। রোচক নহে।

যোগ যাগ করিয়াই হউক, তীর্থ সেবা বা কৃচ্ছ্র-সাধন করিয়াই হউক, হরিনাম বা গঙ্গাস্নান করিয়াই হউক, যাহাতে তোমার মনের সংস্কারটী মুছিয়া যাইবে, তাহাই তোমার প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্তের এটী উৎকৃষ্ট ও অপরটী অপকৃষ্ট মনে করিও না। মনের প্রকৃতি ও বিশ্বাসানুরূপ ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে। মনের পাপ মনের তেজে দগ্ধীভূত হয়। আবশ্যক বোধে এই স্থানে একটী পৌরাণিকী কথার অবতারণা করিতেছি। ভগবতী পার্ব্বতী এক সময়ে লোক-গুরু শ্রীমন্মহাদেবকে বলিয়াছিলেন যে হে নাথ! তুমি গঙ্গাস্নানের যে মহিমা ঘোষণা করিয়াছ, তাহাতে লোকে আর ব্রত, তপ, পূজা, যাগ, যজ্ঞ করিবেনা। যদি গঙ্গাস্নানেই সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়, তবে এত শ্রম ও যত্ন-সাধ্য কার্য্যে লোকে প্রবৃত্ত হইবে কেন? তাহাতে ভগবান্ ত্রিলোকনাথ উত্তর করিয়াছিলেন, দেবি!

পাপ-নিরসনার্থ আমার সমস্ত ব্যবস্থারই মূল্য সমান। যোগ, যাগ, পূজা, পাঠ ও গঙ্গাস্নান আদিতে কিছু মাত্র তারতম্য নাই। সকলের ধাতু, সকলের প্রকৃতি সমান নহে। কেহ যোগে, কেহ যজ্ঞে, কেহ তীর্থে, কেহ গঙ্গা স্নানে নিজ ২ নিষ্ঠানুসারে পাপ হইতে উদ্ধার পাইবে। সকল গুলিতেই সকল লোকের নিষ্ঠা নাই। যাহার যাহাতে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা হইবে, সে তাহাতেই নিষ্পাপ হইয়া মুক্তি লাভ করিবে। প্রকৃত প্রস্তাবে নিষ্ঠাসহ গঙ্গাস্নান করিলে নিশ্চয়ই পাপের বিমোচন হইবে। তাহাতে ভগবতী বলিলেন, প্রত্যহ সহস্র ২ লোক যে গঙ্গাস্নান করিতেছে, তাহারা তো সকলেই মুক্ত হইবে ? তাহাতে ভগবান্ বলিলেন, লক্ষ লক্ষ গঙ্গাস্নাত লোকের মধ্যে কদাচ দুই এক জনকে প্রকৃততঃ গঙ্গাস্নান করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার গূঢ় রহস্য কল্য তোমাকে দেখাইব। রহস্য-ভেদের সমস্ত পরামর্শ স্থির হইল।

অলোকসামান্য রূপ লাবণ্যে দিক্ বিভাসিত করিয়া ভগবতী ষোড়শী যুবতী রূপে তৎপর দিন প্রাতে গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট। মহাদেব কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত বৃদ্ধ, তাঁহার উরুদেশে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া মৃতাবস্থায় রহিলেন। প্রাতে স্ত্রী, পুরুষ, বাল, বৃদ্ধ, যুবা সহস্র ২ লোক গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেছে, স্নান পূজা করিয়া চতুর্ব্বর্ণের কতলোক কাতারে ২ দাঁড়াইয়া মায়ারূপিণীকে তাঁহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ভগবতী শোক-বিকলকণ্ঠে বলিলেন, আমার স্বামীর তো এই দুর্দ্দশা দেখিতেছ, আমি একাকিনী। যদি তোমাদের মধ্যে কাহারও জ্ঞান ও অজ্ঞান কৃত সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে, তবে দয়া করিয়া ইঁহার মৃত দেহ গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দাও, আমাকে নিস্তার কর; কিন্তু পাপ থাকিতে যদি কেহ ইঁহাকে স্পর্শ করে, তবে তাহারও ইঁহার ন্যায় অবস্থা হইবে। ভগবতীর অনুরোধ রক্ষায় প্রায় সকলেই ইচ্ছা হইল:

কিন্তু "আমি নিষ্পাপী" এরূপ বিশ্বাস কাহারও না থাকায় কেহই মৃত দেহ স্পর্শ করিতে সাহস করিল না। ভগবতী বলিলেন, তোমাদের মধ্যে অনেককেই পূজা পাঠ-নিষ্ঠ ও গঙ্গাস্নাত দেখিতেছি, তবে কেন তোমরা আমার সহায়তা করিতেছ না? সকলেই নিরুত্তর,—নীরব রহিল। দেখিতে ২ বেলা প্রহরাতীত হয়। একজন যুবা গঙ্গাস্নানে আসিল। রাত্রিতে বেশ্যালয়ে থাকিয়া মদ্য পানাদি করিয়াছে, তাহার চিহ্ন এখনও লক্ষিত হইতেছে। সে জনাকীর্ণ মণ্ডলী দেখিয়া তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, এবং পার্ব্বতীর অপূর্ব্ব রূপে মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? কি চাও? ভগবতী সমস্ত বৃত্তান্ত পূর্ব্ববৎ প্রকাশ করিলেন। তাহাতে যুবক বলিল, যদি নিষ্পাপ হইলেই তোমার এই উপকার করিতে পারা যায়, তবে কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর, আমিই তোমার উপকার সাধন করিব। একজন মদ্যপায়ী বেশ্যাসক্তের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সকল লোকে হাঁসিয়া উঠিল। যুবক

সকলের উপহাসকে উপেক্ষা করিয়া নিষ্পাপী হইবার জন্য গাত্র-বস্ত্রাদি উন্মোচন পূর্ব্বক গঙ্গাস্নান করিতে নামিল। এই অবকাশে গৌরী ও শঙ্কর উভয়েই অন্তর্হিত হইলেন এবং মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিলেন, দেখ লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে এই ব্যক্তিই গঙ্গাস্নান করিল। ইহারই অন্তঃকরণ হইতে পাপ ধৌত হইয়া গেল। অন্যান্য সকলের গাত্র মার্জ্জনা হইল মাত্র। মদুক্ত গঙ্গামহিমায় ইহারই স্থির বিশ্বাস। ইহার মনের বিচিত্র বলে জন্ম জন্মার্জ্জিত পাপ হইতে রক্ষা পাইল।

বস্তুতঃ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত যে প্রায়শ্চিত্তটী তোমার মনঃপূত হয়, তাহাই তোমার উপকারী হইবে। স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা তোমার পাপক্ষয় হয় না, তাহা নহে; কদনুষ্ঠান জন্য নরকাদির আশঙ্কা রাশি তদ্দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়। শাস্ত্রবিহিত স্নান, ব্রত, উপবাস, পবিত্র শুদ্ধিকর পদার্থাদির সেবন, মন্ত্রাদির জপ প্রভৃতির দ্বারা শরীরের অশৌচ ভাব

বিদূরিত ও তত্তদনুষ্ঠানের প্রকৃতিনিহিত শক্তি-কৌশলে মনের তেজ, বল ও পবিত্রতার বৃদ্ধি হওয়ায় মানস-পটে অঙ্কিত পাপের অপবিত্র ছায়া রূপ মলিন চিহ্ন গুলি তিরোহিত হইয়া যায়। তাহাতেও যদি মনে কর, মনের কালিমা দূর হইল না, তবে দৃঢ় মনে "পাপক্ষয়-কাম" হইয়া সাধু "সংকল্প" পূর্ব্বক একবার গঙ্গাস্নান করিয়া দেখ, একবার ভক্তিসহ প্রাণ ভরিয়া "হরি" বলিয়া ডাকিয়া দেখ; দেখ, তাহাতে তোমার মন বিগলিত হয় কি না। অগ্নি-তাপে বিগলিত হইলেই যেমন স্বর্ণকুণ্ডলাদিতে আর কোন চিত্র বা চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই রূপ বিশ্বাস, ঐকান্তিকতা ও ভক্তিতে চিত্ত বিগলিত হইলে অন্তঃকরণে অঙ্কিত অশুভ কর্ম্মের ফলরূপ পাপের মলিন চিহ্ন গুলি-বিলুপ্ত হইয়া যায়। সৎসঙ্কল্প ও একান্ত ভক্তি-প্রবাহই মানস পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত।

দুর্গোৎসব ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

"তত্ত্ববোধিনী" বঙ্গদেশের প্রাচীনতম ধর্ম্ম-প্রচারিকা পত্রিকা। ইহার উৎপত্তি কাল হইতে এ পর্য্যন্ত সময়ে ২ যে অতি উপাদেয় ও উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা বঙ্গীয় পাঠক গণ ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অনেক গূঢ় কথা অবগত হইয়া যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আমাদিগের চক্ষে সম্মান ও আদরের বস্তু। ইহার লিপি-নৈপুণ্যে ও অভিজ্ঞতার গুণে অনেকেই এতৎ পত্রিকার প্রবন্ধ গুলিকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না। ভগবানের কাছে আমরাও প্রার্থনা করি যে তত্ত্ববোধিনীর এই উচ্চ অধিকার অবিচলিত থাকুক।

কিন্তু কার্ত্তিক মাসের (শকাব্দা ১৮০৭) তত্ত্ববোধিনীতে দুর্গোৎসব শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া

নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। ইহাতে লিখিত হইয়াছে যে "এ দেশের আবাল বৃদ্ধের সংস্কার এই যে অযোধ্যাপতি রাম দুর্গাদেবীর আরাধনা করিয়া রাবণ-বধে কৃতকার্য্য হন। কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণে ইহার কোন উল্লেখ নাই", কিন্তু ইহাও স্বীকার করিয়াছেন "কালিকা পুরাণে এই রাবণ-বধের পূর্ব্বে রামের দুর্গা মূর্ত্তির পূজার উল্লেখ আছে।" দুর্গাপূজা যে রাম কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নহে, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য লিখিয়াছেন "কিন্তু যাহা অবলম্বন করিয়া রামের চরিত্র নির্ণীত হয় এবং যাহা রামের জীবদ্দশায় রচিত, সেই বাল্মীকীয় রামায়ণে এই দুর্গোৎসবের কোনও উল্লেখ করেন নাই। ইহা রামায়ণ রচনার অনেক পশ্চাৎ পৌরাণিক কবিরা কল্পনা করিয়া যান, হিন্দুর মধ্যে তাহাই দুর্গোৎসব।" তত্ত্ববোধিনীতে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ হইবে ইহা আমাদিগের আশা-বহির্ভূত। লেখক রামায়ণের প্রামাণিকতাকে বলবতী রাখিয়া কালিকা পুরাণের প্রমাণকে উপেক্ষা ও

অবহেলা করিলেন কোন্ সাহসে ? যদি বুঝিতাম রামায়ণের উক্তির সহিত কালিকা পুরাণের উক্তির কিছু বিরুদ্ধতা আছে, তাহা হইলেও একদিন বিবেচনার স্থল ছিল। কিন্তু স্পষ্টতঃ দেখিতেছি, রামায়ণ ও কালিকা পুরাণে বিরুদ্ধতা আদৌ নাই, কেবল কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে মাত্র। রাবণ-বধের পূর্ব্বে রামায়ণের রামচন্দ্র ব্রহ্মের স্তব বা ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছিলেন। কালিকা পুরাণের রামচন্দ্র সেই সময়ে দুর্গা মূর্ত্তি পূজা করিয়াছিলেন। রামায়ণে দুর্গামূর্ত্তির উল্লেখ নাই, অতএব রামের দুর্গাপূজা মিথ্যা ইহা প্রমাণিত হয় না। রামায়ণ দেখিয়া রাম-চরিত্র নিশ্চিত হয় এবং কালিকা-পুরাণের রাম চরিত্র অপ্রামাণিক ইহা তাঁহাকে কে বলিল? হিন্দুর চক্ষে রামায়ণ ও কালিকা পুরাণ উভয়ই সমান সম্মান ও আদরের সামগ্রী। উভয়ই আর্য্য গ্রন্থ, সুতরাং প্রমাণ-মূলক। রামায়ণ রামচন্দ্রের জীবদ্দশায় রচিত হইয়াছিল বলিয়া রাম-চরিত্রের সকল কথাই

যে উহাতে লিখিত ছিল, তাহার প্রমাণ কি ? বাল্মীকি যদি দুই একটী কথার উল্লেখ না করিয়া থাকেন, তাহাতে শাস্ত্র-বৈষম্য-দোষ ঘটে না। দেখা গিয়াছে অনেক লোকের জীবন-চরিত জীবদ্দশায় ও মরণান্তে রচিত হইয়া সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়। জীবদ্দশায় গ্রন্থ খানিতে হয় তো যে কথার আদৌ উল্লেখ ছিলনা, তাহার মরণান্তকালের ইতিহাস-লেখক বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা তাঁহার জীবনের অনেক নূতন সত্য ঘটনা সকল প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ লিখিত গ্রন্থ দ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া কথিত হয় না। এবং প্রথম খানি প্রমাণ-মূলক ও দ্বিতীয় খানি অপ্রামাণিক ইহাও কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিশ্বাস করেন না। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিলে রাধিকার নামোল্লেখ পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত-পুরাণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মায়িক গোপলীলার বহু বিস্তার বর্ণনা আছে। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠেই শ্রীকৃষ্ণের

চরিত্র নির্ণীত হইয়া থাকে ; তবে কি ব্রহ্ম বৈবর্ত্তের সমস্ত রচনা মিথ্যা প্রমাণিত হইবে ? কৃষ্ণ জীবনীর প্রধান বিজ্ঞাপনী শ্রীমদ্ভাগবতে মহাভারতোক্ত "ভগবদ্গীতা" অমূল্য উপদেশ-মালার আদৌ উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, অতএব তজ্জন্য গীতা কি অমূলক হইবে ! না, হিন্দুর সমক্ষে নহে। শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও মহাভারত এ সমস্ত হিন্দুর পরম প্রামাণিক গ্রন্থ। এক খানি গ্রন্থকে মান্য করা এবং অন্যকে তুচ্ছ ও অপ্রামাণিক বোধ করা মনুষ্যের স্বেচ্ছাধীন, কিন্তু শাস্ত্র-বিচারাধীন নহে। রামায়ণে যাহা লিখিত আছে, তাহাই সত্য এবং পৌরাণিক কথা "কল্পনা" এই কথা গুলি মনে করিতেও হাস্যোদয় হয়। যদি তত্ত্ববোধিনীর স্বরে কেহ পুরাণকে প্রমাণ-মূলক মনে করিয়া রামায়ণকে কল্পনার ফুৎকারে উড়াইয়া দেয়, তাহাতে তিনি কি করিতে পারেন ? পৌরাণিকদিগের লেখাকে "কবির কল্পনা" বলিয়া অবহেলা করা বর্ত্তমান ভারতের একটী

বিষম রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এরোগের ঔষধ কি !

রাম রাবণবধের পূর্ব্বে ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছিলেন। দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন বলিলে কি তাহাতে কিছু বাধা ঘটে? দুর্গাপূজা কি ব্রহ্মোপাসনা হইতে স্বতন্ত্র সামগ্রী? লিখিত হইয়াছে " বস্তুতঃ আদিত্য-হৃদয় " ব্রহ্ম স্তোত্র " (ইহাই রামায়ণের রামচন্দ্র রাবণ-বধের পূর্ব্বে উচ্চারণ করিয়াছিলেন) ইহার প্রত্যেক অক্ষর ব্রহ্মকেই প্রমাণ করিতেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, দুর্গাপূজার প্রত্যেক অক্ষর কি বাঁশ, দড়ী, মাটী, রং ও রাংতা প্রকাশ করিতেছে? দুর্গা বলিলে তো হিন্দুরা ইহাই বুঝেন, যে—

নারায়ণী বিষ্ণুমায়া পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপিণী।
ব্রহ্মাদি দেবৈর্মুনিভির্মনুভিঃ পূজিতা স্তুতা॥
সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী দেবী সা সর্ব্বরূপা সনাতনী।
ধর্ম্মসত্যপুণ্য কীর্ত্তি যশোমঙ্গলদায়িনী॥
সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধরূপা সিদ্ধিদা সিদ্ধিদেশ্বরী।

বুদ্ধি নিদ্রা ক্ষুৎপিপাসা ছায়াতন্দ্রাদয়াস্মৃতিঃ ॥

কৈ এতৎ পাঠে তো দুর্গাকে ব্রহ্ম হইতে কোন স্বতন্ত্র সামগ্রী বলিয়া বুঝিলাম না। তবে আপত্তি হইতে পারে, মূর্ত্তিপূজা কেন? এ কথার তুমুল আন্দোলন এখন তুলিবার আমাদিগের অবকাশ নাই, তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি, যে মূর্ত্তি গুলি আধ্যাত্মিক শক্তি সমূহের আধিভৌতিক প্রকাশ বা রূপ মাত্র। মনুষ্য যখন নামরূপময় জগতের—পাঞ্চভৌতিক দেহের—প্রপঞ্চ অবিদ্যা মায়ার স্থূল বিদ্যমানতা অতিক্রম করিয়া স্বতন্ত্র ও সূক্ষ্ম আত্মাকে স্বরূপতঃ অনুভব করিতে শিখিবে, সেই দিন নাম, রূপ, মূর্ত্তি পূজার সমস্ত গোল মিটিয়া যাইবে।

সম্পাদক লিখিয়াছেন "দাক্ষিণাত্য ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে প্রকাণ্ড হিন্দু সম্প্রদায় আছে, তাহাদের মধ্যে এই দুর্গোৎসব এখনও হয় না, তবে "নব রাত্রি" নামে এই সময়ে একটা জাতীয় উৎসব হইয়া থাকে।

কোথাও মূর্ত্তি পূজার বাহুল্য আর কোথাও বা যৎস্বল্প, কেন এরূপ ? ” লেখক নব রাত্রির মেলাকে বাঙ্গালা দেশের দুর্গোৎসব হইতে “ যৎস্বল্প ” মনে করিয়াছেন, ইহা বড় আশ্চর্য্যের কথা। দুর্গোৎসবেও দেবীর পূজা এবং নব রাত্রিতেও সেইরূপ দেবীর পূজা হইয়া থাকে। যে যে স্থানে প্রাচীন কাল হইতে দেবীর স্থান প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানকার লোকে আর স্বতন্ত্র মূর্ত্তি গঠন করিয়া নিজ গৃহে পূজা করিবার আবশ্যকতা মনে করেন না। সকলে সেই দেবীস্থানে গিয়াই পুষ্প বিল্বদল নৈবেদ্যাদি দ্বারা দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। বারাণসীর দুর্গা-বাড়িতে নবরাত্রির নয়দিন ধরিয়া রাত্রি আড়াইটা হইতে বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত যেরূপ লোকের ভীড় হয়, সেরূপ ভীড় বঙ্গদেশের দুর্গোৎ-সবেও হয় কিনা সন্দেহস্থল। নব রাত্রির মেলা কি “ যৎ স্বল্প ” ! ! তত্ত্ববোধিনীর সংস্কার এই যে ভারতের বঙ্গদেশ ভিন্ন পশ্চিমোত্তর দেশাদিতে “ বৈদান্তিক

ধর্ম্ম, একেশ্বরবাদ অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া আছে।” লেখক বাঙ্গালা দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় রীতি নীতি প্রকৃতি ও শাস্ত্র আলোচনা করিয়া কি এতদিনে স্থির করিলেন যে বাঙ্গালীরা বহু-ঈশ্বর-বাদী ? বঙ্গবাসী গণ কি ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির অনন্ত মহিমার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপাসনা ও স্তুতি করিবার জন্য ভিন্ন ২ মূর্ত্তির ভিন্ন২ মন্ত্রে উপাসনা করেন না ? পশ্চিমোত্তর দেশাদিতে রাম, কৃষ্ণ, শিব লিঙ্গাদির বহুল প্রচার সত্ত্বেও তদ্দেশবাসীগণ একেশ্বরবাদী, ও দুর্গা, কালী জগদ্ধাত্রী পূজা করিয়াই বঙ্গবাসী গণ মূর্ত্তির উপাসক, এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত নূতন ও বিচিত্র। আমরা বলি, পশ্চিম দেশে, কেন, ভারতের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এক ঈশ্বরেরই পূজা হইয়া থাকে। বহুমূর্ত্তিতে উপাসনা হয় বলিয়া বহু ঈশ্বরের উপাসনা হয় না। যদি বৈদান্তিক ধর্ম্ম-প্রভাবেই পশ্চিমোত্তর দেশাদিতে একেশ্বর বাদ প্রচলিত হইয়া থাকে, তবে

সেই বৈদান্তিক " সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম " এই মহাসত্যের প্রভাবে কি বঙ্গীয় দুর্গার খড়, মাটী, রং রাংতা প্রত্যেক অণু পরমাণু ব্রহ্মময় হইয়া একেশ্বরবাদের উচ্চধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেনা ?

তত্ত্ববোধিনীর ইহাও সংস্কার, যে বঙ্গবাসীগণ স্থানীয় জল বায়ুর গুণে নিতান্ত " আমোদ প্রিয়। সম্ভবতঃ এই কারণেই মূর্ত্তি পূজা এতদ্দেশে বাহুল্য রূপে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে।" ধন্য সিদ্ধান্ত! বঙ্গবাসিগণ! শুনিয়া রাখুন, তত্ত্বোবোধিনী স্থির করিলেন, যে আমোদের জন্যই আপনারা পূজা করিয়া থাকেন। তত্ত্ব-বোধিনীর এই কথাতে আমরা নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলাম। তিনি কি বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর হৃদয় খুলিয়া পাঠ করিতে শিখেন নাই? হইতে পারে, আধুনিক কতিপয় আমোদ-প্রিয় ব্যক্তি দুর্গোৎসবাদির উপলক্ষে কুৎসিত নৃত্য গীতাদি আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিস্তৃত বঙ্গ-ক্ষেত্রে যে সহস্র ২

হিন্দুহৃদয় ভক্তি ও প্রেমে, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া জগন্মাতার চরণে জবা বিল্বদল গঙ্গাজল অর্পণ করিবে বলিয়া দুর্গোৎসবের কতদিন পূর্ব্ব হইতে উন্মত্ত হইয়া উঠে, তাহা কি তাঁহার চক্ষু দেখিতে পায় না? কত পুরুষ ও কত কুলাঙ্গনা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রেমাশ্রুবিগলিত নেত্রে গললগ্নীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলি-পুটে মায়ের পবিত্র উজ্জ্বল মূর্ত্তি ও পূজা দর্শন করিয়া এবং জীবনের কল্যাণার্থ কামনা করিয়া থাকেন, তাহা কি তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই? কত পূজা-বাড়ীতে যে এই উপলক্ষে পণ্ডিত দিগের বিদায়, সাধু ব্রাহ্মণাদির সৎকার ও বহুল পরিমাণে দীন দুঃখী অনাথ ও আতুর গণকে অবারিত অন্ন দানাদি হইয়া থাকে, তত্ত্ববোধিনী কি তাহা দেখিতে বিস্মৃত হইয়াছেন? কিছু দিন পূর্ব্বেও অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত প্রায় অধিকাংশ বঙ্গীয় গৃহস্থগণ ভক্তিযুক্ত চিত্তে পূজা করিতেন, অথবা যে পর্য্যন্ত আজ কালকার আমোদের

রস তরঙ্গ উথলিয়া না উঠিয়াছিল, সে পর্য্যন্ত বঙ্গের নগরে নগরে গ্রামে ২ দুর্গা পূজা, কালী পূজা, জগদ্ধাত্রী-পূজার প্রচার " বাহুল্য " ছিল। এখন দিন দিন যেমন ধর্ম্ম-বিশ্বাসের হ্রাস, ভক্তির অভাব ও আমোদের " বাহুল্য " হইতেছে, তেমনি দিন ২ গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে পূজার সংখ্যা কমিয়াই আসিতেছে। যদি আমোদার্থে মূর্ত্তিপূজার " বাহুল্য " প্রচার হইত, তবে আজ কাল অপেক্ষাকৃত অধিক দুর্গোৎসবাদির প্রচার দেখিতে পাইতাম।

যাঁহারা বঙ্গবাসীর মূর্ত্তি পূজাকে আমোদ মূলক বলিয়া স্থির করেন, বোধ হয় আমাদের দুরদৃষ্ট বশতঃ তাঁহারা বাঙ্গালির হৃদয় হারাইয়াছেন। দুর্গোৎসব বাঙ্গালীর আমোদের উৎসব নহে, উহা সাধু হৃদয়ের মহামহোৎসব, উহা ভক্ত জীবনের সাম্বৎসরিক দিব্য পূর্ণোৎসব, উহা ভারতবাসী আর্য্য দিগের সমস্ত উৎসবের মধ্যে প্রধান উৎসব। এই উৎসবে পাষাণ হৃদয় গলিতে দৃষ্ট হয়,

শোকার্ত্তের হৃদয়েও আনন্দের চিহ্ন দেখা যায়, শত্রু মিত্রে প্রেমালিঙ্গন করিতে বাধ্য হয়। ভগবান্ এই দুর্গোৎসবকে প্রতিগৃহের উৎসব করিয়া রাখুন।

মূর্ত্তিপূজা লইয়াই তত্ত্ববোধিনীর বিষম বিরোধ। লিখিয়াছেন "অমূর্ত্তের রূপ নাই, সুতরাং রূপে বা মূর্ত্তিতে তাঁহাকে দেখা প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা হইতে পারেনা", কিন্তু আমরা বলি, রূপে, নামে, ভাবে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, ভিতরে, বাহিরে, অগ্রে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে, নিম্নে, ঊর্দ্ধে, যথা তথা সর্ব্বথা তাঁহাকে দেখাই প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা। ব্রহ্মোপাসনা বলিলেই সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা বুঝিতে হইবে, ইহা আর্য্য শাস্ত্রের চিরন্তন সিদ্ধান্ত। "নেদং যদিদমুপাসতে" কেনোপনিষদুক্ত এই মন্ত্রাংশ টুকু উদ্ধৃত করিবার সময় তত্ত্ববোধিনী কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই তাঁহার মনের গোল মিটিয়া যাইত। উক্ত উপনিষদের চতুর্থ হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত শ্লোক পাঁচটি নিগুর্ণ ব্রহ্ম-প্রতি-

পাদক।" নেদং যদিদমুপাসতে" "নাম রূপে যাহা উপাসনা কর, তাহা ব্রহ্ম নহে" তত্ত্ববোধিনী এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আর্য্যাচার্য্য গণ বলেন "ইহা (নির্গুণ) ব্রহ্ম নহে, যাহাকে লোকে উপাসনা করে। অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম "উপাসনার" বিষয়ীভূত নহে। তিনি অনির্ব্বচনীয়, মনোবুদ্ধির অগোচর এবং ইন্দ্রিয়গণের বহির্ভূত। হস্তপদাদিবিশিষ্ট জড় পিণ্ডই কেবল প্রতিমা নহে, মনোবুদ্ধির গম্য, জ্ঞানের ও ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ীভূত রূপ, নাম বা ভাব, যাহারই তুমি উপাসনা কর, তাহাই "প্রতিমা"। এই প্রতিমা-পূজা অনাদি কাল হইতে জগতে প্রচলিত। কঠোর তপস্যা দ্বারা মনের বিনাশ (মনোলয়) সাধন করিতে না পারিলে এই মূর্ত্তি-পূজার হস্ত হইতে কাহারও এড়াইবার যো নাই। ইহাতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি কাহারও হাত নাই। আদিত্যের জ্যোতির মধ্যে ব্রহ্মদর্শন করা আর ত্রিনয়না দশ ভুজার মৃন্ময়ী-প্রতিমাতে ত্রিকাল-

দর্শিনী দশদিগ্ ব্যাপিনী অনন্ত ব্রহ্মরূপিণীকে দর্শন করা একই কথা। উভয়ই সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা, উভয়ই প্রতিমা-পূজা। প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, রামায়ণ ও কালিকা পুরাণে, কিছু মাত্র “প্রাণ গত বিরোধ” নাই, কেবল কিঞ্চিদ্ বিভিন্নতা আছে মাত্র।

তত্ত্ববোধিনী বলিয়াছেন যে উপনিষদ্ উপাসনা-কাণ্ডের চরম সীমা এবং পুরাণ ও তন্ত্র উপাসনা কাণ্ডের অবনতির ফল। আমরা বলি উপনিষদ্ উপাসনা কাণ্ডের উর্দ্ধ সীমা এবং পুরাণ ও তন্ত্র উপসনার বিস্তার ও বিকাশ। বেদ বেদান্তে যাহা বীজভূত ছিল, পুরাণ ও তন্ত্রে তাহাই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র।

পশ্চিমোত্তর দেশাদির হিন্দু অধিবাসি গণ প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত স্থান বিশেষে বা মন্দির বিশেষে গিয়া যে মূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকেন ও বঙ্গবাসি গণ গৃহে প্রতিমা গঠন পূর্ব্বক যে মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকেন,

পৌত্তলিকতার সংস্কারে এই উভয় মধ্যে তত্ত্ববোধিনী যে কি তারতম্য ও প্রভেদ দেখিলেন, কিসে পশ্চিমোত্তর-দেশ-বাসি গণ বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম-জ্ঞান-সম্পন্ন, ও কিসে যে, বঙ্গবাসি গণ পৌত্তলিক, বুঝিলেন, ইহাতো আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তবে এই মাত্র বলিতে পারেন, যে বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা পশ্চিমোত্তর দেশে বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা অধিক। কিন্তু উপাসনা কালে উভয়ই সমান। মহাত্মা রামমোহন রায় ভারতবর্ষের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া তত্ত্ববোধিনীর সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন। আমরাও ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়াই আমাদের কথিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। কৈ আমরাতো পশ্চিমোত্তর দেশাদির কোন স্থানে দলে দলে শমদমাদি-সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন লোক দেখিতে পাইলাম না। দেখিলাম, সুসজ্জিত মুর্ত্তিতে বাঙ্গালির নেত্রের যেমন তৃপ্তি—পশ্চিমোত্তর, পঞ্জাব, রাজপুতানাদিবাসীরও

তেমনই তৃপ্তি ! সুমধুর বাদ্য বাঙ্গালির যেমন ভাল লাগে, তাহাদিগেরও তেমনি ভাল লাগে এবং প্রসাদ-ভক্ষণে উভয় রসনারই সমান উল্লাস। সুতরাং উপাসনা-রাজ্যে ভারতের সকল দেশই সমান। শমদমাদি সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন হইতে হইলে যে কষ্টসহিষ্ণুতার প্রয়োজন, তাহা মুষ্টিমাত্র চণক বা শক্তুমাত্র সেবন পূর্ব্বক দিন কাটাইলেই সিদ্ধ হয় না। উহাতে মনোবেগ-সহিষ্ণুতা বা বিষয়-বিরাগাদির প্রয়োজন। ইহাতেও বাঙ্গালা ও পশ্চিমোত্তর দেশ সমান অধিকারী। বাঙ্গালা দেশে আমোদের অংশ অধিক, ও ভারতের অন্যত্র কম, ইহাতো প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে পারিলাম না।

গুরু ও শিষ্য।

শিক্ষা-গুরু ও দীক্ষা-গুরু ভেদে গুরু দ্বিবিধ। গুরুর উপদেশ ব্যতীত একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তৃণেরও ভালরূপ

পরিচয় সহজে জানিতে পারা যায়না। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় আদি কেহই আর একটি প্রবল শক্তি কর্ত্তৃক উত্তেজিত, আকৃষ্ট বা পরিচালিত না হইলে কোন কার্য্যই করিতে পারেনা। যে শক্তির দ্বারা আমরা উৎকর্ষের দিকে অগ্রসর হই, সেই শক্তি আমাদের গুরু। দুই শক্তির একত্র সংঘর্ষণ ব্যতীত কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয়না; এই দুই শক্তির মধ্যে যে শক্তি প্রবল, তাহাই অপরের গুরু। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি যাঁহার শক্তির ইঙ্গিতে স্ব স্ব কার্য্যে প্রতিনিয়ত ধাবিত হইতেছে, তিনিই জগদ্-গুরু। এই জগদ্গুরুকে জানিবার জন্য জীবের মনঃপ্রাণ ব্যাকুল হইলে যিনি তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দ্বারা জীবের কল্যাণ-পথ পরিষ্কার ও সুগম করিয়া দেন তিনিই দীক্ষা-গুরু। আর জগদ্গুরুর মায়া-বিজৃম্ভন স্বরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্বের পরমাণু হইতে বিরাট বিশ্ব ব্যাপার পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বাহ্যাভ্যন্তর তত্ত্ব যিনি বুঝাইয়া দেন, তিনি শিক্ষাগুরু। একটি কীট হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সকলেই

শিক্ষাগুরু হইতে পারেন। বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী আদি সকলেই কত সময়ে কত শিক্ষা দেয়, তাহা গুণগ্রাহী শিক্ষিত গণের অবিদিত নাই। একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু অথবা ব্যভিচারিণী বারাঙ্গনাও কত সময়ে কত লোকের শিক্ষা-গুরু হইয়া থাকে। শিখিব বলিয়া যেখানেই গমন কর, সেই খানেই কিছু না কিছু শিখিবার বিষয় দেখিতে পাইবে। যে শিক্ষার দ্বারা জীবের পরমাত্ম-দৃষ্টি-পথে যাইবার আনুকূল্য হয়, তাহাই সুশিক্ষা। আজ কাল সুশিক্ষার অভাবে অশিক্ষার স্বভাবে ও কুশিক্ষার প্রভাবে শিক্ষার পবিত্র ক্ষেত্র কিছু মলিন হইয়া গিয়াছে, শিক্ষা-গুরু গণ জীবের অবশ্যগন্তব্য পথের কথা বিস্মৃত হইয়া যথেচ্ছাগমনের পথ মুক্ত করিয়া দিতেছেন। সূক্ষ্ম-তত্ত্ব লাভ করিবার জন্য শিক্ষা প্রথম সোপান, ও দীক্ষা দ্বিতীয় বা চরম সোপান। শিক্ষা দীক্ষার অনুকূল হওয়া চাই। শিক্ষা বিধি পূর্ব্বক না হইলে দীক্ষা সহজে ফলবতী হয় না।

এই জন্য শিক্ষা দিবার সময়ে সুশিক্ষিত ও দীক্ষিত সদ্‌গুরুর আবশ্যক। যিনি শিক্ষা-তত্ত্ব ও দীক্ষা-তত্ত্বকে পৃথক্ করিয়া বিবেচনা করেন, তিনি শিষ্যকে বিশেষ রূপে সুশিক্ষিত করিতে পারেননা। শিক্ষা যদি দীক্ষার অনুগামিনী না হয়, তবে সে শিক্ষা কুশিক্ষা ও জীবের অকল্যাণকারিণী। আমাদের ভাগ্যদোষে বর্ত্তমান ভারতে এই শিক্ষারই বিস্তার অধিক। যেমন শৈশব যৌবনের এবং যৌবন বার্দ্ধক্যের পূর্ব্বাবস্থা, সেই রূপ শিক্ষা দীক্ষার পূর্ব্বাবস্থা। যিনি শৈশবে সুপথে চলেন, যৌবনে তিনি সুখী হয়েন ও যিনি যৌবনে সুপথে চলেন, তিনি বার্দ্ধক্যে সুখ ভোগ করেন। সেইরূপ শিক্ষা-কালে যিনি সুপরিচালিত হয়েন, দীক্ষাকালে তাঁহার স্বাত্মানুভূতি পরিমার্জ্জিত হয়। শিক্ষার দ্বারা মন সংশয় বর্জ্জিত পরিষ্কৃত ও দিব্য দৃষ্টিযুক্ত হয়, ও দীক্ষার দ্বারা জীবনের পরমারাধ্য পরম দেবতাকে দর্শন করিয়া জীব কৃতার্থ হয়। উপযুক্ত গুরু ব্যতীত শিক্ষা ও দীক্ষা দিবার অধি-

কারী কেহই নহে। যিনি সদ্‌গুরু-প্রসাদাৎ শিক্ষিত হইয়া দীক্ষিত হয়েন, তিনিই ধন্যজন্মা ও তাঁহারই জীবন সার্থক।

আমরা এ স্থানে শিক্ষাগুরুকে লইয়া অধিক কালক্ষেপ করিতে পারিতেছিনা। দীক্ষাগুরুই এ প্রস্তাবের লক্ষ্য। গুরু বলিলেই প্রায় লোকে দীক্ষা-গুরু বুঝিয়া থাকে। গুরুকে মনে করিলেই তাঁহাকে যেন জগৎ ছাড়া কোন স্বর্গীয় পুরুষ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাকে আমাদিগের ন্যায় মনুষ্য বলিয়া মনে করিতে ভয় হয়—তাঁহার সহিত একাসনে বসিতে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে—তাঁহার বাক্য বেদ বাণী, তাঁহার আজ্ঞা অনুল্-লঙ্ঘনীয়, তাঁহার পাদ-ধৌত জল অমৃত, তাঁহার দর্শনে জীবন সফল হয়। তিনি অপার সংসার-সমুদ্রে বিচক্ষণ কর্ণধার। গুরু শ্রদ্ধা ও চিরসম্মানের সামগ্রী।

কিন্তু এ পবিত্র দীক্ষা-গুরুর পদে বরণ করি কাহাকে? আমাদিগের দেশে যাঁহারা আজ কাল

গুরুগিরি ব্যবসা করিয়া থাকেন, দীক্ষাদান যাঁহাদের পণ্য, শিষ্যগণ যাঁহাদের গ্রাহক, গুরু-দক্ষিণা-লাভ যাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহাদিগকে তো সদ্‌গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস করা যায় না, ইচ্ছাও হয়না। কুলগুরু ত্যাগ করিতে নাই এই সংস্কারই আমাদের দেশের গুরুগণকে এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছে। আমরা এই খানে অবশ্যই স্বীকার করি যে অনেক কুলগুরু সুশিক্ষিত, ব্রহ্মনিষ্ঠ আছেন. তাঁহারা অবশ্যই সদ্‌গুরু বলিয়া পরিগণিত, আমরা সেই কুলগুরু গণকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। কিন্তু যাহারা অশিক্ষিত, নিরক্ষর, অসচ্চরিত্র, সাধনা বর্জ্জিত, তাহাদের দীক্ষা দিবার কি অধিকার আছে? শিষ্য যখন বলিবেন—

"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

তখন একথার সার্থকতা হইবে কিরূপে? তিনি তো নিজেই অবিদ্যা-মায়ান্ধকারে অন্ধীভূত, জ্ঞানাঞ্জনে

তাঁহারই চক্ষু উন্মীলিত হয় নাই, তিনি অন্যের চক্ষু "উন্মীলিত" করিতে গিয়া হয় তো শলাকাতে শিষ্যের চক্ষু "উৎপাটিত" করিয়া বসেন। যখন শিষ্য গুরুকে প্রণাম করিবার সময় বলিবেন—

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

কৈ গুরুগিরিধারিন্! তুমি তো শিষ্যকে চরাচর-ব্যাপী অখণ্ড মণ্ডলাকার পুরুষকে দেখাইতে পার নাই, (তুমি নিজেই দেখ নাই তো অন্যকে কোথা হইতে দেখাইবে!) তবে সদ্গুরুর প্রাপ্য প্রণামটা তুমি চুপি চুপি চুরি করিতেছ কেন?

গুরু ঠাকুর! তোমাদের ন্যায় গুরু গিরিধারীগণকে স্মরণ করিয়াই সর্ব্বলোকবন্দনীয় দেবাদিদেব মহাদেব পার্ব্বতীকে বড় দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন—

"গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্ল্লভঃ সদ্গুরুর্দ্দেবি! শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥"

শিষ্যের মাথায় পা দিয়া পয়সা লইবার গুরু অনেক, কিন্তু শিষ্যের ত্রিতাপহারী শান্তিবিধাতা সদ্গুরু বড়ই দুর্ল্লভ।

পৈতৃক বাগ বাগিচা গৃহ সম্পত্তির ন্যায় তুমি শিষ্য ঘরটা অধিকার করিয়া বসিয়াছ। একবারও কি মনে ভাব না, যে মন্ত্র-দীক্ষা তামাশা নহে, ক্রীড়া নহে, শিষ্যকে সংসার-সিন্ধু পার করিবার গুরু ভার তোমার উপর ন্যস্ত, ভগবানের সম্মুখে তুমি শিষ্যের জন্য দায়ী। কিছু না জানিয়া শুনিয়া কোন্ সাহসে এই জ্বলন্ত অগ্নি শিখায় হাত দাও, তাহা জানিনা। হিন্দু হইয়া শাস্ত্র মানিয়া কেমন করিয়া অশাস্ত্রীয় কার্য্য কর, তাহা বলিতে পারি না। "গুং রোধয়তীতি গুরুঃ" যিনি অবিদ্যান্ধকার-নিবারণে সক্ষম, তিনিই তো গুরু। পুনর্ব্বার বলি, ঠাকুর মহাশয়! একবার গুরুর লক্ষণটা পড়িয়া দেখুন।

" সর্ব্বশাস্ত্রপরোদক্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ সদা।

সুবচঃ সুন্দরঃ স্বঙ্গঃ কুলীনঃ শুভদর্শনঃ ॥

জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রাহ্মণঃ শান্তমানসঃ।
পিতৃমাতৃহিতে যুক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মপরায়ণঃ ॥
আশ্রমী দেশবাসী চ গুরুরেবং বিধীয়তে ॥”

যিনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী কার্য্যদক্ষ, শাস্ত্রের যথার্থ অর্থবেত্তা, সুভাষী, সুরূপ অবিকলাঙ্গ, কুলীন, যাঁহার দর্শনে লোকের কল্যাণ হয় এবং যিনি জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী ব্রাহ্মণ্যশীল ব্রাহ্মণ, শান্তচিত্ত, পিতৃমাতৃহিত-নিরত, সর্ব্বকর্ত্তব্যানুষ্ঠানশীল, আশ্রমী ও দেশবাসী, তাঁহাকেই গুরু পদে বরণ করিবে। এই রূপ গুণ যুক্ত হইয়া শিষ্যকে দীক্ষা দান করিলে উভয়েরই কল্যাণ। আজ কাল গুরুগিরি, চাকরি, বাণিজ্য আদির ন্যায় অর্থোপার্জ্জনের উপায় মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কর্ম্মদোষে লোকে গুরুপদকে লঘু করিয়া ফেলিয়াছে।

মন্ত্র-দীক্ষার পূর্ব্বে গুরু শিষ্যে অন্ততঃ ৬ মাস বা বর্ষকাল একত্রে বাস করিবেন। পরস্পর প্রীতিযুক্ত ও উপযুক্ত বোধ করিয়া শিষ্য গুরুর নিকট জ্ঞান ভিক্ষা

করিবেন ও গুরু কৃপা পূর্ব্বক শিষ্যের ভব-যন্ত্রণা-নিস্তারের উপায় স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দীক্ষা দান করিবেন। অনেক সময়ে শিষ্যের অনভিমতে গুরুগণ দীক্ষা দেন শুনিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত হই। বল বা ছল পূর্ব্বক মন্ত্র দীক্ষা দেওয়া মহাপাপ। গুরু স্বয়ং উপযাচক হইয়া মন্ত্র দিতে যান কেন? বোধ হয় পয়সার প্রত্যাশায়। শিষ্য করযোড়ে প্রার্থনা না করিলে কোন সদ্গুরু মন্ত্র দীক্ষা দিবেন না, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। তুমি মন্ত্র জপ কর কিনা, তুমি ধর্ম্ম সাধন করিতেছ কিনা, সাধনে কোন বিঘ্ন হইতেছে কিনা, গুরু ঠাকুরের এ সকল তত্ত্ব লইবার অবকাশ নাই। কিন্তু তুমি কত টাকা বেতন পাও, আর মাসে মাসে কিছু উপরি পাওনা আছে কিনা, এ সংবাদটী গুরু প্রথমেই লইয়া থাকেন। ধনলুব্ধ গুরুর দ্বারা শিষ্যের পুনরাবৃত্তি নিবৃত্তি হওয়া সুকঠিন। "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" অন্ধে যেমন অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে

পারেনা, সেই রূপ কাম ক্রোধ লোভাদিতে অন্ধীভূত গুরু শিষ্যকে সংসার সিন্ধুপার করিতে পারেন না। মহর্ষিগণ! আচার্য্যগণ! একবার ভারতের দিকে তাকাইয়া দেখ, তোমরা যে সিদ্ধ গুরুর আসনে বসিয়া শিষ্য গণকে পরমানন্দ-ধামের অধিকার দান করিতে, আজ সেইখানে বসিয়া গুরুগিরিধারী ব্যাপারী গণ বণিগ্‌বৃত্তি আরম্ভ করিয়াছে!!

অনেক লোক আজ কাল কুলগুরু গণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া দীক্ষা লইতেও পরাঙ্‌মুখ হইয়াছেন। তাঁহারা যোগ্য গুরু পাইলে মন্ত্র লইতে সম্মত আছেন। গুরু অন্বেষণ করিলে হাটে বাজারে পথে ঘাটে গুরু পাওয়া যায়না। ভগবানের জন্য একান্ত কাতর হইয়া উঠিলে ভগবৎ-কৃপাতেই সদ্‌গুরুর দর্শন পাওয়া যায়। ধ্রুব পদ্মপলাশলোচন ভগবান্‌কে পাইবার জন্য একান্ত মনে কাঁদিতে লাগিলেন, ভগবান্ অমনি দয়া করিয়া দেবর্ষি নারদকে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মশাপ-সন্তপ্ত

মহারাজ পরীক্ষিত আসন্ন মৃত্যু জানিয়া ভগবদ্দর্শন-বিরহে কাঁদিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন, ভগবান্ অমনি কুরুজাঙ্গল হইতে শুকদেবকে প্রেরণ করিলেন। তুমি ভগবদ্বিরহে কাতর হও সদ্গুরুর দর্শন পাইবেই পাইবে। সদ্গুরু যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ সৎশিষ্য হওয়া আবশ্যক; নতুবা তুমিও যেমন শিষ্য, তোমার গুরুও তেমনি জুটিবে। শিষ্যের লক্ষণ যথা—

অলুব্ধঃ স্থিরগাত্রশ্চ আজ্ঞাকারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আস্তিকো দৃঢ় ভক্তিশ্চ গুরৌ মন্ত্রেচ দৈবতে।
এবম্বিধো ভবেৎ শিষ্য ইতরো দুঃখকৃদ্গুরোঃ॥

নির্লোভ, স্থির দেহ, গুরুর আজ্ঞাকারী, জিতেন্দ্রিয়, আস্তিক, এবং গুরু, মন্ত্র ও দেবতাদিতে দৃঢ়ভক্তিযুক্ত যিনি, তিনিই সদ্গুরুর উপযুক্ত শিষ্য; অন্যথা শিষ্য কেবল গুরুর দুঃখদায়ী হইয়া থাকে। বস্তুতঃ স্বয়ং উত্তমাধিকারী না হইলে সদ্গুরু পাওয়াও দুর্লভ।

উপসংহার কালে আবার ইহাও বলি যে শিষ্য যদি গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হন্, দীক্ষামন্ত্রে ও ভগবানে যদি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে, তবে গুরু যেমনই কেন হউন না, শিষ্য পরম ধামের অধিকারী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ত্রিগুণ।

" ত্রি " এই মায়া-কুহক-জড়িত সংখ্যাকে ভিত্তি করিয়া আর্য্য ঋষিগণ শাস্ত্রে অনেক গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। অনাদ্যনন্ত শক্তির গুহ্য প্রহেলিকা ভেদ করিতে বসিয়া আর্য্যঋষি গণ বেদের নিভৃত গুহা হইতে এই "ত্রি" সংখ্যাকে উদ্ধার করিয়া লইয়াছেন। পুরুষের অনাদি শক্তি প্রভাবে প্রথমতঃ ত্রিগুণময়ী (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) মায়া বিস্ফুরিত হইয়া এই অনন্ত জগৎ প্রসব করিয়াছেন। এই ত্রিগুণই মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রাকৃতিক কার্য্য কুশল রক্ষণার্থ ব্রহ্মা,

বিষ্ণু, ও মহেশ রূপে জগতের সৃজন, পালন ও সংহার এই তিন কার্য্যে ব্রতী হইলেন। নির্ম্মল সত্ত্বগুণে (ব্রহ্মার হৃদয়ে) বেদও প্রধানতঃ ত্রয়ী রূপে (যজুঃ, ঋক্ ও সাম) প্রতিবিম্বিত হইল। এই বেদ আবার ত্রিবর্ণাত্মক (অ+উ+ম) অনাহত ধ্বনি প্রণব হইতেই উৎসারিত ও কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এই তিন ভাগে পল্লবিত হইয়া ভূ ভূর্বঃ স্বঃ নামক ত্রিলোককে পবিত্র করিয়াছেন। এই গুণ ত্রয়েরই ইঙ্গিতে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন শরীরের বিকাশ; এতৎ প্রভাবেই জীব আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন দুঃসহ তাপে সন্তপ্ত; জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয়ও ইহার অধীন। এমন কি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালও ইহার প্রচণ্ড শাসনকে অতিক্রম করিতে পারেনা। এই তিনই ত্রিপুরাসুরের জনয়িতা। এই তিন পুর ভেদ করিয়া পরম পুরুষের সাক্ষাৎকার জন্য ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন

যোগাধিগম্যা নাড়ির সাহায্যে পূরক, কুম্ভক ও রেচক এই তিন যোগ-বিধির পর সমাধি-শিক্ষা করিতে হয়। এই তিনই ত্রিশূল। এই ত্রিশূলের উপরে বা ঊর্দ্ধতন স্থানে বারাণসী—জ্ঞানভূমি স্থাপিত রহিয়াছে। বায়ু পিত্ত, কফ, এই তিনের বিকারে বিমুগ্ধ না হইয়া যিনি তৎ, ত্বং, অহং এই তিন ভেদ-দৃষ্টি ছাড়িতে সমর্থ, তিনিই চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি এই তিনের জ্যোতির জ্যোতিঃ-স্বরূপ হইয়া ত্রিকাল এক অবস্থায় আনন্দধামের অধিকারী হইতে পারেন। আলস্য, ঔদাস্য ও উপেক্ষা—শত্রুতা, মিত্রতা ও অনবধান—আসক্তি, বিরক্তি ও মুক্তি আদি আর তাঁহাকে উদ্বেজিত করিতে পারিবে না। মনু লিখিয়াছেন—

সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব ত্রীন্ বিদ্যাদাত্মনো গুণং।
যৈর্ব্যাপ্যেমান্ স্থিতো ভাবান্ মহান্ সর্ব্বানশেষতঃ॥

সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই তিন মহত্তত্ত্ব রূপ আত্মার গুণ। এতত্ত্রিগুণময় মহত্তত্ত্ব সকল পদার্থে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকেন।

যো যদৈষাং গুণোদেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে।
স তদা তদ্‌গুণ প্রায়ং তং করোতি শরীরিণং॥

দেহিমাত্রেই এই তিন গুণযুক্ত। কিন্তু ইহার মধ্যে যে গুণ যে শরীরে অধিক, সে দেহী তদ্‌গুণ-লক্ষণাক্রান্ত হয়। যে ব্যক্তি সত্ত্ব গুণ প্রধান, তিনি জ্ঞান ও প্রীতিযুক্ত, যিনি রজোগুণ-প্রধান তিনি বিষয়াভিলাষ ও দুঃখের সন্তাপে পরিতপ্ত ও যে ব্যক্তির শরীরে তমোগুণ অধিক, বিষাদ ও মোহ তাহাকে সর্ব্বদা আশ্রয় করিয়া থাকে।

সত্ত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতং।
এতদ্ব্যাপ্তিমদেতেষাং সর্ব্বভূতাশ্রিতং বপুঃ॥

সত্ত্ব গুণের লক্ষণ জ্ঞান, রজোগুণের রাগদ্বেষ, ও তমোগুণের লক্ষণ অজ্ঞান ইত্যাদি। ত্রিগুণের এতাবৎ লক্ষণ সমস্ত প্রাণীকেই আশ্রয় করিয়া বিশ্ব চরাচর ক্রীড়া করিতেছে।

তত্র যৎ প্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চিদাত্মনি লক্ষয়েৎ।

প্রশান্তমিব শুদ্ধাভং সত্ত্বং তদুপধারয়েৎ ॥

আত্মাতে একান্তানুরাগ প্রকাশ স্বরূপ যে নির্ম্মল প্রশান্ত ভাব অনুভূত হয়, তাহাই সত্ত্বগণ বলিয়া অবধারণ করিবে।

যত্তু দুঃখসমাযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ।
তদ্রজঃ প্রতিধং বিদ্যাৎ সততং হারিদেহিনাং ॥

যাহার দ্বারা অন্তঃকরণে দুঃখ, ক্লেশ ও অপ্রীতি আসিয়া উপস্থিত হয় এবং বিষয়-বাসনার বেগ মনকে উদ্বেজিত করিতে থাকে, তাহাই রজোগুণ।

যত্তু স্যান্মোহ সংযুক্তমব্যক্তং বিষয়াত্মকং।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ ॥

যাহা দ্বারা মোহ আসিয়া জীবকে আচ্ছন্ন করে এবং অব্যক্ত বিচার বোধের অতীত দুর্জ্ঞেয় বিষয়াত্মিকা বুদ্ধির উদয় হয়, তাহারই নাম তমোগুণ।

বেদাভ্যাস স্তপোজ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধর্ম্ম ক্রিয়াত্মচিন্তা চ সাত্ত্বিকং গুণ লক্ষণং ॥

শ্রদ্ধা পূর্ব্বক বেদাভ্যাস, প্রাজাপত্যাদির অনুষ্ঠান, শাস্ত্রার্থ অবধারণ পূর্ব্বক জ্ঞান লাভ, মৃৎ, জল আদির দ্বারা শরীর-শুদ্ধি, ইন্দ্রিয় গণের সংযম, সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান ও আত্ম চিন্তা, এতাবৎ সত্ত্ব গুণের কার্য্য।

আরম্ভরুচিতা ধৈর্য্যমসৎকার্য্য পরিগ্রহঃ।
বিষয়োপসেবা চাজস্রং রাজসং গুণ লক্ষণং ॥

ফলের কামনা করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মের আচরণ, অল্প অর্থ প্রাপ্তেই মনের বিকলতা, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং অজস্র বিষয়োপভোগ এতৎ সমুদয় রজোগুণের কার্য্য।

লোভঃ স্বপ্নোহধৃতিঃ ক্রৌর্য্যং নাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিতা।
যাচিষ্ণুতা প্রমাদশ্চ তামসং গুণ লক্ষণং ॥

বহু ধনের লালসা, নিদ্রালুতা, অল্প ধনে অসন্তুষ্টি, পরোক্ষে পরদোষ-ঘোষণা, পর লোকে অবিশ্বাস, আচার ভ্রষ্টতা, ধনসত্ত্বেও যাচ্ঞা, ধর্ম্ম কর্ম্মে অনবধান, এ সমুদয় তমোগুণের লক্ষণ।

যৎ সর্ব্বেণেচ্ছতি জ্ঞাতুং যন্ন লজ্জতি চাচরন্।

যেন তুষ্যতি চাত্মাস্য তৎ সত্ত্বগুণ লক্ষণম্॥

জ্ঞানার্থে কর্ম্মের অনুষ্ঠান, সর্ব্ব প্রকার প্রযত্নের সহিত জানিতে ইচ্ছা করা, কার্য্য কালে লজ্জাস্পদ না হওয়া ও কার্য্য করিয়া আত্ম-তুষ্টি লাভ, এতাবৎ সত্ত্ব গুণের লক্ষণ।

যেনাস্মিন্ কর্ম্মণা লোকে খ্যাতিমিচ্ছতি পুষ্কলাং।

নচ শোচত্যসম্পত্তৌ তদ্বিজ্ঞেয়ন্তু রাজসং॥

পারলৌকিক সুখ ভোগ বিসর্জ্জন দিয়া ইহ লোকেই যশোলাভের জন্য ব্যগ্রতা, কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া উক্ত বিধ ফল না পাইলেও দুঃখানুভব আদি না হওয়া রজোগুণের লক্ষণ।

যৎ কর্ম্ম কৃত্বা কুর্ব্বংশ্চ করিষ্যংশ্চৈব লজ্জতি।

তজ্জ্ঞেয়ং বিদুষা সর্ব্বং তামসং গুণ লক্ষণং॥

যে কার্য্য সম্পাদন করিলে পর, যে কার্য্য অনুষ্ঠান করিবার সময় ও যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া গেলে লজ্জা বোধ হয়, তত্তাবৎতমোগুণের লক্ষণ।

তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্ম্মঃ শ্রৈষ্ঠ্যমেষাং যথোত্তরং॥

কাম-প্রধানতা তমোগুণের লক্ষণ, অর্থনিষ্ঠতা রজোগুণের ও ধর্ম্ম প্রাধান্য সত্ত্বগুণের লক্ষণ। ইহাদিগের মধ্যে ক্রমোত্তর শ্রেষ্ঠ জানিবে। অর্থাৎ কাম হইতে অর্থ ও অর্থ হইতে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ জানিবে। কাম হইতে অর্থ লব্ধ হয় এবং অর্থ হইতে ধর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়।

দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্য্যক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ॥

সত্ত্ব গুণ বৃত্তিতে অবস্থিত পুরুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, রজোগুণ বৃত্তিতে অবস্থিত পুরুষ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তমোগুণ বৃত্তিতে অবস্থিত পুরুষ পশু পক্ষী আদি যোনি লাভ করে।

ত্রিবিধা ত্রিবিধৈষা তু বিজ্ঞেয়া গৌণিকী গতিঃ।
অধমা মধ্যমাগ্র্যাচ কর্ম্মবিদ্যা বিশেষতঃ॥

সত্ত্বাদি গুণ বৃত্তি যুক্ত ব্যক্তি দিগের যে তিন প্রকার

গতি উক্ত হইল, এতাবৎ আবার দেশ কালাদি ভেদে এবং সংসার হেতু কর্ম্মের ভেদে উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন প্রকার।

স্থাবরাঃ কৃমিকীটাশ্চ মৎস্যাঃ সর্পাঃ সকচ্ছপাঃ।
পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব জঘন্যা তামসী গতিঃ॥

বৃক্ষাদি স্থাবর, কৃমি, কীট, মৎস্য, সর্প, কুর্ম্ম, পশু, মৃগ এতাবৎ তমোগুণ-প্রভাবে জঘন্য গতিবিশিষ্ট।

হস্তিনশ্চ তুরঙ্গাশ্চ শূদ্রা ম্লেচ্ছাশ্চ গর্হিতাঃ।
সিংহা ব্যাঘ্রা বরাহাশ্চ মধ্যমা তামসী গতিঃ॥

হস্তী, ঘোটক, শূদ্র ও ম্লেচ্ছ, সিংহ, ব্যাঘ্র, শূকর, এ সকল তমোগুণ নিমিত্ত মধ্যম গতিবিশিষ্ট।

চারণাশ্চ সুপর্ণাশ্চ পুরুষাশ্চৈব দাম্ভিকাঃ।
রক্ষাংসিচ পিশাচাশ্চ তামসীষূত্তমা গতিঃ॥

নট আদি মানব গণ, পক্ষী, ছল পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ প্রবৃত্ত পুরুষ গণ, রাক্ষস, পিশাচ আদি বিগ্রহ ধারণ তমোগুণজ উত্তমা গতি।

ঝল্লা মল্লা নটাশ্চৈব পুরুষাঃ শস্ত্রবৃত্তয়ঃ।

দ্যূতপান প্রশক্তাশ্চ জঘন্যা রাজসী গতিঃ॥

ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন ঝল্ল নামক জাতি (যাহারা লগুড় দ্বারা যুদ্ধ করে) এবং মল্ল জাতি (যাহারা বাহু দ্বারা যুদ্ধ করে,) নট, শস্ত্র জীবী, দ্যূতক্রীড়াসক্ত ও মদ্যাদি পান পরায়ণ হওয়া রজোগুণজ অধমা গতি জানিবে।

রাজানঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব রাজ্ঞশ্চৈব পুরোহিতাঃ।

বাদযুদ্ধ প্রধানাশ্চ মধ্যমা রাজসী গতিঃ॥

অভিষিক্ত রাজা, জনপদের শাসন কর্ত্তা, এবং ক্ষত্রিয় জাতি মাত্র, রাজ পুরোহিত, শাস্ত্রার্থ কলহ প্রিয় হওয়া রজোগণজাত মধ্যমা গতি জানিবে।

গন্ধর্ব্বা গুহ্যকা যক্ষা বিবুধানুচরাশ্চ যে।

তথৈবাপ্সরসঃ সর্ব্বা রাজসী উত্তমা গতিঃ॥

গন্ধর্ব্ব ও গুহ্যক অর্থাৎ যক্ষগণ, বিদ্যাধর গণ এবং অপ্সর গণ রজোগুণ জন্য উত্তমা গতি জানিবে।

তাপসা যতয়ো বিপ্রা যেচ বৈমানিকা গণাঃ।
নক্ষত্রাণিচ দৈত্যাশ্চ প্রথমা সাত্ত্বিকী গতিঃ ॥

বানপ্রস্থ, যতি, ব্রাহ্মণ, পুষ্পকাদি বিমানচারিগণ, নক্ষত্র মণ্ডলী, ও দৈত্য দেহ লাভ সত্ত্বগণ জন্য উত্তমা গতির ফল।

যজ্বানোমুনয়ো দেবা বেদা জ্যোতিংষিবৎসরাঃ।
পিতরশ্চৈব সাধ্যাশ্চ দ্বিতীয়া সাত্ত্বিকী গতিঃ ॥

যাগশীল, ঋষি, বেদাদি বিগ্রহ বিশিষ্ঠ দেবতা, ধ্রুব প্রভৃত্তি জ্যোতির্গণ, বৎসর, সোমপ প্রভৃতি পিতৃগণ, সাধ্যগণ আদি সত্ত্ব গুণজ মধ্যমা গতির ফল।

ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেবচ।
উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্মনীষিণঃ ॥

ব্রহ্মা ও মরীচ্যাদি সৃষ্টিকর্ত্তা, ধর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, মহত্তত্ত্ব ও অব্যক্ত, এতাবৎ সত্ত্ব গুণের উত্তমা গত্তি জানিবে।

মনু প্রোক্ত এই গুণ ত্রয়ের ক্রিয়া, গুণ ও লক্ষণ

দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, যে এই তিন গুণেই বিশ্ব সংসারের সমস্ত কার্য্যই সাধিত হইতেছে মানসিক, বাচনিক ও দৈহিক সাধন সমস্তই এই তিন গুণের শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। তমঃ ও রজ এই গুণদ্বয়কে ক্ষীণ করিয়া যাহাতে সত্ত্বগুণের প্রভাব অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, তাহারই যত্ন কর্ত্তব্য। সত্ত্বগুণ উদ্রেক না হইলে মনুষ্যের পরম সুখ লাভের আশা নাই। সত্ত্ব গুণ নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় হইয়া মনুষ্যকে আত্মার যথার্থ প্রতিকৃতি অনুভবে সমর্থ করিয়া দেয়। সত্ত্ব গুণ উদয় হইলে দুঃখ, তাপ, চিন্তা, ক্লেশ বিদূরিত হইয়া যায়। মনুষ্য যে সুখের পিপাসু হইয়া দিগ্বিদিগ্-জ্ঞান-শূন্য হৃদয়ে সর্ব্বথা কার্য্য-কারণ-ঘটনার তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছে, সত্ত্ব গুণের যথাযথ বিকাশ ভিন্ন সেই সুখের আস্বাদনে কখনই সামর্থ্য হইবেনা। অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা হইলেই চিৎ জ্যোৎস্না প্রকাশিত হয়, সেই নির্ম্মল কিরণেই ত্রিতাপ সন্তপ্ত জীবকে সুশীতল

করিতে পারে।, তাহা দ্বারাই জীব সংসারের জ্বালা-মালার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মানব জন্মের সার্থকতা সাধন করিতে পারে। অতএব গুণ-বিশুদ্ধিই মনুষ্যের যত্নতঃ লাভ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা মানব দেবত্ব পাইয়া থাকে।

আসন।

নির্ম্মলনীর নির্ঝরে, সরোবরে বা পুণ্যতোয় তীর্থ-কুণ্ডে অবগাহন করিলে এবং কোমল ও পবিত্র কৌষেয় পট্টবাসাদি পরিধান করিলে যেমন শরীর স্বচ্ছন্দ ও মন একাগ্র হইয়া থাকে, সেইরূপ সাধক সাধনোপযোগী আসনে উপবেশন করিলে ভগবচ্চিন্তায় যথোচিত সাহায্য পাইয়া থাকেন। আসনের গুণেই সাধক অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির ভাবে আত্ম-সমাধি করিতে সমর্থ হয়েন। আসন দ্বিবিধ। ১ম—হস্ত পদাদির বিশেষ বিশেষ সংস্থানে যোগীগণ আসন রচনা করেন; যথা—সিদ্ধাসন, পদ্মাসন

বদ্ধপদ্মাসন ভদ্রাসন, মুক্তাসন, বজ্রাসন, স্বস্তিকাসন, সিংহাসন, গোমুখাসন, বীরাসন, ধনুষাসন, মৃতাসন, গুপ্তাসন, মাৎস্যাসন, মাৎস্যেন্দ্রাসন, গোরক্ষাসন, পশ্চিমাত্তানাসন, উৎকটাসন, সংকটাসন, ময়ূরাসন, কুক্কুটাসন, কূর্ম্মাসন, উত্তানকূর্ম্মাসন, উত্তান মাণ্ডুকাসন, বৃক্ষাসন, মাণ্ডুকাসন, গরুড়াসন, বৃষাসন, শলভাসন, মকরাসন, উষ্ট্রাসন, ভুজঙ্গাসন, যোগাসন, আদি চতুরশীতি প্রকার আসন সাধকগণের সাধনাঙ্গের প্রকার-ভেদে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ২য়—কুশাসন, রোমজাসন আদি, যাহার উপরে বসিয়া সাধক গণ মন্ত্রোপাসনাদি করিয়া থাকেন। আমরা প্রথম প্রকার আসনের কথা অদ্য বলিব না, দ্বিতীয় প্রকার আসন-তত্ত্বই বর্ত্তমান প্রস্তাবের আলোচ্য।

সকল পদার্থেরই বহুবিধ গুণ বা শক্তি আছে। তদনুসারে যে যে দ্রব্যে আসন গুলি বিরচিত হয়, সেই দ্রব্যের শক্তি তদুপদিষ্ট সাধক শরীরের শক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া সাধকের শরীরে ও অন্তঃকরণে

ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া, উৎপাদন করিয়া থাকে। সাধনের গুণে সকল সাধকের শরীরে ও অন্তঃকরণে একং প্রকার ভাব থাকে। সাধনা করিতে করিতে যাঁহার যেমন শক্তি জন্মিয়াছে—যাঁহার যেমন অধিকার হইয়াছে, তাঁহার তেমনি আসনও নিরূপিত আছে। গৃহী ও সন্ন্যাসীর অধিকার এক নহে, শরীর ও অন্তঃকরণের অবস্থা এক নহে, সুতরাং উভয়ের পক্ষে এক প্রকার আসন উপকারীও নহে। তবে সাধারণতঃ যাহাতে বসিলে শরীর ক্লিষ্ট হয়, অধিক ক্ষণ সুখ পূর্ব্বক বসিতে পারা যায় না, সেরূপ আসনে সাধক বসিবেন না। তাহাতে মন স্থৈর্য্যচ্যুত হইয়া যায় ও সাধনার ব্যাঘাত জন্মে। এই জন্য কাষ্ঠাসন, ধরাসন, শৈলাসন, পল্লবাসন আদি শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং কুশাসন, রোমজাসন আদি প্রসিদ্ধ কল্পে গৃহীত হইয়াছে। কুশাসনে বসিলে জ্ঞানবৃদ্ধি ও সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ হয়, কম্বলাসনে অভীষ্ট-সিদ্ধি হয়, মৃগরোমজাসনে শুভ ফল পাওয়া যায়, ব্যাঘ্র

চর্ম্মাসনে সাধনা করিলে মোক্ষ লাভ হয়, কিন্তু ইহাতে অদীক্ষিত বা গৃহস্থের বসিবার অধিকার নাই। ব্যাঘ্র চর্ম্মে বসিলে অত্যুগ্র তেজের সঞ্চার হয়, তাহাতে অনিদ্রা, বীর্য্য শক্তির হানি আদি গৃহস্থের প্রতিকূল অবস্থা রাশি আসিয়া উপস্থিত হয়। কৃষ্ণাজিন ও যতি, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষুক ব্যতীত গৃহীগণ ব্যবহার করিবেন না, ইহাতে বহির্ব্ব্যাপার-শক্তি চেষ্টা, উদ্যম আদি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তৃণাসনে বসিলে দরিদ্রতার সঞ্চার হয়, পল্লবাসনে বসিতে নাই, কেননা উহাতে চিত্ত-বিভ্রম হয়, কাষ্ঠাসনে পূজা করিলে পূজা ব্যর্থ হয়, দৌর্ভাগ্য দেখা দেয় ও রোগের সঞ্চার হয়। পাষাণাসনে রোগ ও বাগ্ রোধের আশঙ্কা, ধরাসন — দুর্গতি, দুঃখ ও শোক জনক সুতরাং উহা ধীমানের অকর্ত্তব্য। কেবল বস্ত্রের আসন রচনা করিয়াও বসিবে না, উহা তপস্যার হানিকারক ও দরিদ্রতার সূচক। বংশাসনে বসিলে বংশক্ষয় হইয়া থাকে। আম্র, নিম্ব,

কদম্ব প্রভৃতি নির্ম্মিত আসনে সর্ব্বনাশ হয়, বকুল, কিংশুক, এবং পনশাসনে সাধক হতশ্রী হইয়া পড়েন, কেবল গম্ভারী অশুভ দায়ক নহে। যথা—

পাদ্মোত্তরখণ্ডে।

উপবিশ্যাসনে রম্যে কৃষ্ণাজিনকুশোত্তরে।
রাঙ্কবে কম্বলে বাপি কাশাদৌ ব্যাঘ্রচর্ম্মণি॥
ন কুর্য্যাদর্চ্চনং বিষ্ণোঃ শিবে কাষ্ঠাসনাদিষু।
কাষ্ঠাসনে বৃথা পূজা পাষাণে রোগসম্ভবঃ॥
ভূম্যাসনে গতির্নাস্তি বস্ত্রাসনে দরিদ্রতা।
কুশাসনে জ্ঞানবৃদ্ধিঃ কম্বলে সিদ্ধিরুত্তমা॥
কৃষ্ণাজিনে ধনী পুত্রী মোক্ষঃ স্যাদ্ব্যাঘ্রচর্ম্মণি।
মন্ত্রযোগং প্রকুর্ব্বীত ভোগার্থং সুখমাসনে॥

গান্ধর্ব্বে।

ধরণ্যাং দুঃখসম্ভূতির্দৌর্ভাগ্যং দারুজাসনে।
আম্রনিম্বকদম্বনাগাসনে সর্ব্বনাশনং॥
বকুলে কিংশুকে চৈব পনসেষু হতাঃ শ্রিয়ঃ।
গাম্ভারীনির্ম্মিতং শস্তং নান্যদারুময়ং শুভং॥

কামাখ্যাকল্পে।

ত্রিপুরায়াশ্চ রুদ্রস্য বিষ্ণোশ্চাপি কুশাসনং।
যথোক্তমাসনং কার্য্যাং সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কং॥
ন যথেষ্টাসনোভূয়াৎ পূজা কর্ম্মণি সাধকঃ।
বংশস্থ ধরণীদারুতৃণপল্লবনির্ম্মিতং॥
বর্জ্জয়েদাসনং ধীমান্ দারিদ্র্যব্যাধিদুঃখদং।
কাষ্ঠাসনে ভবেদ্রোগী বংশে বংশক্ষয়ো ভবেৎ।
শৈলাসনেচ বাগ্রোধঃ পল্লবে চিত্তবিভ্রমঃ।
ধরণ্যাং শোকসংযুক্তঃ অতস্ত্যজ্যং বিচক্ষণৈঃ॥

তন্ত্রান্তরে।

জপধ্যানতপোহানিং বস্ত্রাসনং করোতি হি॥

গন্ধোত্তরে।

ন দীক্ষিতোবিশেজ্জাতু কৃষ্ণসারাজিনে গৃহী।
বিশেদ্যতির্ব্বনস্থশ্চ ব্রহ্মচারী চ ভিক্ষুকঃ॥

আসন দ্বি হস্তের অধিক দীর্ঘ, দেড় হস্তের অধিক প্রশস্ত ও তিন অঙ্গুলি অপেক্ষা উচ্চ না হয়। অতি নীচ বা অত্যুচ্চ না হয়।

নৈতদ্দ্বিহস্তত্তোদীৰ্ঘং সাৰ্দ্ধ হস্তান্ন বিস্তৃতং।
নত্র্যঙ্গুলাৎ সমুচ্ছায়ং পূজা কৰ্ম্মণি সংগ্রহে ॥
আসনঞ্চ ততঃ কুৰ্য্যান্নাতিনীচং ন চোচ্ছ্রিতং ॥

সম্মোহন তন্ত্র।

গৃহস্থগণের পক্ষে কুশাসন সৰ্ব্বাপেক্ষা সুলভ ও উপকারী। আমরা অনেককে নদীতটে বা পুষ্করিণীর বাঁধাঘাটে প্রস্তর বা ইষ্টক-নিৰ্ম্মিত সিঁড়ীর উপর বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক পূজা করিতে দেখিয়া বড় দুঃখিত হই, অনেকে স্নান করিয়া বাটী আসিতে ২ পথে ঐ কাজটী সারিয়া লয়েন। জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, মনুষ্যত্বের একমাত্র পরিপোষক ভগবদারাধনা রূপ পরম পবিত্র কাৰ্য্যটি একটু স্থির হইয়া বসিয়া করিলে ভাল হয়। বাটীর পরিষ্কৃত নিভৃত কক্ষে প্রথমতঃ এক খানি স্থূল কুশাসন, তদুপরি এক খানি স্থূল রোমজাসন পাতিয়া বস্ত্রাচ্ছাদন পূৰ্ব্বক তদুপরি বসিবেন; তদনন্তর যথাবিধি সন্ধ্যাহ্নিকাদি করিয়া দেখিবেন, মনটি কেমন

থাকে, তপস্তেজ বৃদ্ধি হয় কিনা ? শরীর স্বচ্ছন্দ—মন পবিত্র হইবে। যোগগ্রন্থে তো কুশাসনের যথেষ্ট সুফল লিখিত আছেই, একবার আয়ুর্ব্বেদেও কি লিখিত আছে, তাহা পাঠ করুন।

"কুশোদর্ভস্তথা বর্হিঃ সূচ্যগ্রী যজ্ঞভূষণঃ।
ততোঽন্যো দীর্ঘপত্রঃ স্যাৎ ক্ষুরপত্রস্তথৈবচ॥
দর্ভদ্বয়ং ত্রিদোষঘ্নং মধুরং তুবরং হিমম্।
মূত্রকৃচ্ছাশ্মরীতৃষ্ণাবস্তিরুক্ প্রদরাস্রজিৎ॥"

ভাবপ্রকাশ।

কুশ দ্বিবিধ। কুশ, দর্ভ, বর্হি, সুচ্যগ্রী, যজ্ঞভূষণ। একজাতীয় কুশ এই সকল নামে অভিহিত হয়, অন্য প্রকারের নাম দীর্ঘপত্র ক্ষুরপত্র। এই দ্বিবিধ কুশই বায়ু পিত্ত কফ নাশক, মধুর কষায় এবং স্নিগ্ধকর। দীর্ঘ কাল উপবেশন করিয়া ইন্দ্রিয়সংযমন পূর্ব্বক মহত্তর উচ্চতর পদার্থ চিন্তনে নিযুক্ত থাকিলে যে সকল উৎকট পীড়া উপস্থিত হইতে পারে, কুশ তাহারই

অব্যর্থ ঔষধ। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃষ্ণা, বস্তি-রোগ এবং প্রদর পীড়া আরোগ্য হয়।

ন্যায়বান্ ঈশ্বরের উপাসনা।

আমরা এক এক সময়ে এক এক জনের ধর্ম্ম মতের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া যাই। কোন্ আসুরিকী মায়া আসিয়া মনুষ্যের হৃদয়কে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে, তাহা সহসা বুঝিবার সাধ্য নাই। মনুষ্য যেন নটের পুত্তলির ন্যায় নিত্য নূতন নাচ দেখাইতে ভাল বাসে। বস্তুতঃ তাহাতে কল্যাণ বা অহিত হইবে, সে চিন্তা আদৌ হয় না। অভিমান মনুষ্যকে আপনার চক্ষে সকল অপেক্ষা মহান্ ও বুদ্ধিমান্ করিয়া তুলে। তাই মনুষ্য নিজের মতকে সকলের অবলম্বনীয় করিতে চাহে। যে বিষয়ে যাহার পূর্ণ প্রবেশ-শক্তি আছে, সে তাহার গুহ্য প্রহেলিকা ভেদ করিতে অধিকারী ও ক্ষমবান্। কিন্তু কেবল কল্পনার বেশায়

রাজ্যের সীমা বাঁধিয়া অন্যকে তাচ্ছিল্য করিলে শোভা পাইবে কেন ? আজ কাল প্রকৃত ধর্ম্মার্থবক্তা অতি বিরল হওয়ায়, সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া যেখানে একটু প্রভুত্ব আছে, সেই স্থানেই নিজ অগাধ বুদ্ধির পরিচয় দিয়া আর্য্য ঋষি দিগের পৃষ্ঠে কষাঘাত করিতে চায়।

পত্র দ্বারা জ্ঞাত হইলাম, একজন নাকি সম্প্রতি বেহার অঞ্চলে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বালবৎশিখি সম্প্রদায় ভুক্ত। তিনি সম্প্রদায়ের মত বা নিজ মত প্রচার করিতেছেন, তাহা খুলিয়া বলেন না। সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি আমাদের অনাদর নাই, সুতরাং সম্প্রদায়ের দিকে কটাক্ষ করিব না। কিন্তু তিনি যে বালবৎ ভাষণ করিয়া লোক সকলকে ভ্রষ্ট করিতে চাহেন, তাহা আমাদের উপেক্ষা-যোগ্য বলিয়া বোধ হইল না। তিনি বলেন " ঈশ্বর সর্ব্বদাই ন্যায়বান্ এবং মনুষ্যের শুভাশুভ কর্ম্মের ফল অবশ্যই

ভোগ করিতে হইবে ; কারণ ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে তাঁহার ন্যায়পরতার ব্যতিক্রম ঘটে, অতএব ঈশ্বরের উপাসনা, আরাধনা করা "হে পরমেশ্বর! পাপ হইতে আমাকে মুক্ত কর", বলা বাতুলতা। ইহাতে পাপ বৈ পুণ্য নাই, কারণ তুমি প্রার্থনা ও আরাধনা রূপ উৎকোচ দ্বারা তাঁহাকে ন্যায়-পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছ। উপাসনা আরাধনা করিতে হয়, ক্ষিত্যপ্‌তেজঃ আদির কর, অন্যান্য দ্রব্যের কর, তাহারা তোমার কার্য্যে আসিবে ইত্যাদি"। ধর্ম্মান্দোলনের বর্ত্তমান অনুকূল সময়ে এই বিকট ধ্বনিতে সাধু হৃদয় অবশ্যই চকিত হইয়া উঠিতেছে। এই অসার মত নিতান্ত নির্ম্মূল ও বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। "ঈশ্বর ন্যায়বান্," কি বিচারবান্, ক্ষমাবান্, কি দয়াবান্ " বা সর্ব্ব শক্তিমান্ " তাহা তাঁহাকে কে বলিল ? তিনি কি বক্তার কর্ণ আকর্ষণ করিয়া গোপনে বলিয়াছেন, বাপু, আমার "ন্যায়" ভিন্ন অপর অনন্ত ভাব আমি হারাইয়া

ফেলিয়াছি"। "ন্যায়বান্" শব্দে বিশাল বক্তার বিষম বুদ্ধি যাহা বুঝিয়াছে তাহা নহে। মনুষ্য "ন্যায়" বলিলে যাহা বুঝে, ঈশ্বর "ন্যায়" অর্থে তাহাই গ্রহণ করেন; তাহা কে বলিল? মনুষ্যের ন্যায় "ন্যায়বান্" হইলে ঈশ্বর বিধি নিষেধের বিচারক মাজিষ্ট্রেট সাহেব হইয়া বসিতেন। তিনি নিয়ম নিষেধের দাস নহেন, কিন্তু নিয়ম নিষেধই তাঁহার অনুল্লঙ্ঘনীয় আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে। তাঁহার "ন্যায়" শক্তি অনন্ত ধারায় প্রবাহিত ও জীবের ভাব-প্রবাহের সহিত মিলিত হইয়া ফল বিধান করিয়া থাকে। আমি দুষ্কর্ম্ম করিলে তাঁহার "ন্যায়" শক্তি আমার শাসন করিবে সন্দেহ নাই। আমি পরক্ষণেই নিজ ত্রুটী বুঝিতে পারিয়া প্রাণ ভরিয়া ভক্তির সহিত পাপ হইতে অব্যাহতি বা মুক্তির প্রার্থনা করিলাম। "ন্যায়বান্" পরমেশ্বর আমার প্রার্থনা কি উপেক্ষা করিবেন? তবে তাঁহার ন্যায়পরতা কোথায়? "দুষ্কর্ম্মও" যেমন একটী কার্য্য, তন্মুক্তির "প্রার্থনাও"

কি একটী তাদৃশ কার্য্য নহে ? যিনি প্রথমটীর ফলবিধানে "ন্যায়বান্," তিনি দ্বিতীয়টীর ফল দান না করিলে কি ন্যায়-পথ-ভ্রষ্ট হইবেন না ? আইন-লিপির ন্যায় তাঁহার " ন্যায় " নহে। তাঁহার সূত্রে সূত্রে " ন্যায় " গাঁথা রহিয়াছে । কুকর্ম্মীর দণ্ড দান যেমন " ন্যায় ", উপাসকের কামনা পূর্ণ করাও তেমনই " ন্যায় " । উপাসক উৎকোচ দ্বারা তাঁহাকে ভুলাইতে চাহেন না। কিন্তু নিজ " ভক্তি " শক্তির বেগে অনন্ত শক্তির আধার ভূমি হইতে নিজ আবশ্যকীয় শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসেন। ভক্তির ভাষায় ইহারই নাম " ঈশ্বরের কৃপা দৃষ্টি " । অভাব ভাবকে আহ্বান করে, পূর্ণতা শূন্য স্থানকে অধিকার করে ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম । ঈশ্বর পূর্ণ স্বরূপ, জীব অপূর্ণ—অভাবযুক্ত, যখনই জীব আপনার অভাব বুঝিয়া ভাব-রাজ্যকে প্রগাঢ় মনন করিবে, তখনই, অল্প তড়িৎ যুক্ত মেঘে অধিক তড়িদ্বান্ মেঘের সন্নিকর্ষ জন্য তড়িৎ-সামঞ্জস্যের

ন্যায় সাধকের অভাব পরিপূর্ণ হইবে; ভক্তির ভাষায় ইহারই নাম "ভগবান্ দয়া করিয়া আমার পাপ তাপ দূর করিলেন।" উপাসকের মনোরথ পূর্ণ করিলে "ন্যায়-বান্" ন্যায়-ভ্রষ্ট হয়েন না। তাঁহার প্রাকৃতিক ন্যায়-বিধিই তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে।

একটী লোষ্ট্র নিজগুরুত্ব ও পৃথিবীর আকর্ষণ আদি শক্তি প্রভাবে দুই মাইল উপর হইতে বেগে ভূতলাভিমুখে নামিতেছে, ইহা ঈশ্বরের যেমন "ন্যায়" বিচার, এক জন লোক নিজ হস্ত দ্বারা তাহার গতিরোধ করিল, ভূমিতে পড়িতে দিল না, তাহাও তাঁহার তেমনই "ন্যায়" বিচার। যে প্রাকৃতিক নিয়ম-গুণে একটী শক্তি অব্যাহত কার্য্য করিতেছে, সেই প্রাকৃতিক নিয়মেই আবার সেই শক্তি-প্রবাহ অন্য শক্তি দ্বারা প্রতিহত হইতেছে। ঈশ্বরের অনেক "ন্যায়" তোমার চক্ষে "অন্যায়" বোধ হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি দায়ী নহেন। অনন্ত শক্তির অনন্ত মহিমা (অনন্ত নাগ সহস্র

সহস্র শীর্ষে) ধরা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সময়ে কুজ্‌ঝটিকা আম্র মুকুল রাশির উৎপত্তির সহায়, আবার অসময়ে সেই কুজ্‌ঝটিকাই মুকুল রাশির বিনাশক। ইহার উভয়ত্রই "ন্যায়" দণ্ড কার্য্য করিতেছে। বিপরীত ক্রিয়া দেখিয়া "অন্যায়" মনে করিও না। ন্যায়বান্ অনন্তদেব উৎকোচগ্রাহী ভাবিও না। উপাসনা বা আরাধনা করা যে পাপ মনে করে, সে জ্ঞান-বিজ্ঞান-গম্য ঈশ্বরের শক্তি-তত্ত্ব কিছু মাত্র অবগত নহে।

প্রার্থনা করিলে যদি কামনা পূর্ণ না হইত, তাহা হইলে বরং "ন্যায়বান্" নামে কলঙ্ক রটিত। উপাসনা বা আরাধনা উৎকোচ নহে, উহা ঈশ্বরের বিশুদ্ধ শক্তি-জাল আমন্ত্রণের বা আকর্ষণের যন্ত্র স্বরূপ। আধ্যাত্মিক রাজ্যের ব্যবস্থা লৌকিক রাজ্যের নিয়মাধীন নহে।

উক্ত বিশাল বক্তা আবার ক্ষিত্যপ্‌তেজ আদির উপাসনাও করিতে বলেন। ধন্য তাঁহার বিশাল বুদ্ধি!

তিনি “উপাসনা” কাহাকে বলেন, তাহা তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ভিন্ন আর কেহই বুঝিতে পারিবেন না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ঈষৎ উজ্জ্বলতার সহিত মূর্খতা-মিশ্রিত হইয়া ঘোর নাস্তিকতা প্রচার করিতে লাগিল। যাঁহারা উপাসনা তত্ত্ব বা আর্য্য শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য সদ্‌গুরুর মুখে শ্রবণ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের কোন অনিষ্ট আশঙ্কা দেখিতেছি না, কিন্তু পাছে অল্পবয়স্ক বালক বা শাস্ত্র জ্ঞান-শূন্য লোক সমূহ ঈদৃশ মহাপ্রভুর মায়ায় অচৈতন্য হইয়া পড়েন, ইহাই চিন্তার বিষয়।

ভক্তি, পুপূজিষা, আদি মানবীয় মনোবৃত্তি নিচয় যদি দিন দিন যথোচিত উন্নতি প্রাপ্ত হয়, তবে কি উহা পিতা, মাতা আদি গুরু গণের চরণ সেবা করিয়াই কৃতার্থ হইতে পারে? যে ভক্তি, যে ভাব লোককে লৌকিক জগৎ হইতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, সে ভক্তি, সে ভাবের বিশ্রাম-ভূমি কোথায়? প্রাণ মন ঢালিয়া পূজা করিবার ইচ্ছা কি ক্ষিত্যপ্ তেজ আদিতে

চরিতার্থ হইবে? ঈশ্বরের আরাধনার জন্যই এ সকল বৃত্তি মনুষ্য-হৃদয়ে ন্যূনাধিক রূপে কার্য্য করিতেছে। দূর হইতে একটী পর্ব্বত দর্শন করিলে বোধ হয় যেন ধূমময় একখানি দিগন্তব্যাপী মেঘ উঠিতেছে। দর্শক যত নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই তাহার মনের ধূম্ররাশি অপসারিত হয়। সম্পূর্ণ সমীপস্থ হইলে দেখিতে পায়, প্রকাণ্ড দুর্ভেদ্য প্রস্তরস্তূপ গগণ স্পর্শ করিয়া অচল—অটল—দণ্ডায়মান। কত তরুলতা গুল্ম আদি তথায় উৎপন্ন হইতেছে, কত পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ তথায় বাস করিতেছে, কত নদীর উৎস উৎসারিত হইয়া বহিয়া যাইতেছে, কত প্রবাল রত্ন ঝলকে ঝলকে প্রকৃতিকে হাঁসাইতেছে, কন্দরে যোগ নিদ্রাবলে কত যোগীর হৃদয় আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। মূঢ় জগতের সম্মুখে ভক্তি-উপাসনার রাজ্য তাদৃশ ভয়ঙ্কর অন্ধকারময়। গুরু-কৃপায় নিকটস্থ হইতে পারিলে অটল দৃশ্য উপলব্ধি হয়, রু-

মণি মাণিক্যের ছটা দেখিতে পাওয়া যায়, মধুময়ী প্রেম-ধারায় হৃদয় ধুইয়া যায়। একাগ্র উপাসনা, ঐকান্তিকী ভক্তি মানব-জীবনে অনন্ত সুখ সৌভাগ্যের দ্বার খুলিয়া দেয়।

শিব-লিঙ্গ-পূজা।

ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপী। একে তো তাঁহার আকারবিশিষ্ট মূর্ত্তি পূজা করিতেই লোকে অসম্মত, তাহাতে আবার শাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন—

বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাহপি কর্ত্তনং।
অনভ্যর্চ্চ্য ন ভুঞ্জীত ভগবন্তং ত্রিলোচনং॥
প্রত্যহং পরমেশানি! যাবজ্জীবং ধরাতলে।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা লিঙ্গং ব্রহ্মময়ং প্রিয়ে॥

লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্র।

অগ্নিহোত্রস্ত্রিবেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বহুদক্ষিণাঃ।
শিব লিঙ্গার্চ্চনস্যৈতে কোট্যংশেনাপি তে সমাঃ॥

অনেক জন্মসাহস্রং ভ্রাম্যমাণশ্চ যোনিষু।
কঃ সমাপ্নোতি বৈ মুক্তিং বিনা লিঙ্গার্চ্চনং নরঃ॥
যে বাঞ্ছন্তি মহা ভোগান্ রাজ্যং বা ত্রিদশালয়ং।
তেঽর্চ্চয়ন্তু সদাকালং লিঙ্গরূপং মহেশ্বরম্।

স্কন্দ পুরাণ।

প্রাণ বিনষ্টই হউক বা শিরশ্ছিন্নই হউক ভগবান্ ত্রিলোচনকে পূজা না করিয়া ভোজন করিবে না। হে প্রিয়ে! হে পরমেশ্বরি! সমস্ত জীবই পরম ভক্তি সহ ব্রহ্মময় শিব লিঙ্গের পূজা করিবে। (শিবোক্তি) অগ্নি-হোত্রই কর বা ঋক্, সাম, যজুর্ব্বেদই অধ্যয়ন কর, অথবা বহু দক্ষিণ যাগযজ্ঞেরই অনুষ্ঠান কর, এতাবতের দ্বারা শিব লিঙ্গার্চ্চনার কোটী অংশের একাংশ ফলও লব্ধ হয় না।

সহস্র ২ বার ভিন্ন ২ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া শিব লিঙ্গ পূজন ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি মুক্তি লাভে সমর্থ হয়?

যাহারা মহা সুখভোগ, রাজ্য বা স্বর্গ কামনা করিয়া থাকে, তাহারা সর্ব্বদা লিঙ্গরূপ মহেশ্বরের পূজা করুক।

বর্ত্তমান শতাব্দীর সভ্যতা-জ্যোতিঃ-সমাকীর্ণ ভারত-হৃদয়ে হয়তো প্রোক্ত শাস্ত্র বচন-বক্তৃবর্গ "অশ্লীলতা নিবারিণী সভার" দণ্ডাধীন বলিয়া প্রতীত হইতে পারেন। মহাদেবও তাঁহাদের মতে অতি অসভ্য পাহাড়ী দেবতা। কেননা, মস্তক, চরণ থাকিতে তিনি লিঙ্গ পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা অনেক সময়ে অনেক লোকের মুখেই সিদ্ধেশ্বর শিবের এই "গর্হিত" অনুষ্ঠানের কথার আন্দোলন করিতে শুনিয়াছি এবং অনেকে এই সংশয় নিরসনার্থ আমা-দিগকে বারম্বার অনুরোধও করিয়াছেন। আবশ্যক বোধে সংক্ষেপে এই কথাটীর রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

অনন্ত শক্তি ও অনন্ত মহিমার আধার পরমেশ্বরের ত্ত্বা-গরিমা বা পরিচয় জানিতে হইলে আমরা এই

প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড পিণ্ডের বিচিত্র ব্যাপারের প্রতি মুহুর্মুহুঃ প্রণিধান করিতে বাধ্য হই। বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র শিল্প-চাতুরী না দেখিতে পাইলে আমাদের চিত্ত তাঁহাকে জানিবার জন্য ধাবিত হইত কি না সন্দেহ-স্থল। এই মাত্র আকাশে বায়ু স্থির প্রবহমান ছিল, দেখিতে ২ কাহার ইঙ্গিতে প্রচণ্ড পবন বহিতে লাগিল, সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গ-মালায় আকুলিত হইয়া উঠিল, মহোচ্চ পর্ব্বত-চূড়া ভগ্ন হইয়া পড়িল, গৃহ অট্টালিকার উচ্চশির খসিয়া ভূমিতে লুটাইল, সারি ২ বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়া ভূতলে শয়ন করিল, সমস্ত জগৎ ভীত, চকিত ও জাগ্রত হইল! ইহা দেখিবা মাত্র মন লৌকিক জগৎ অতিক্রম করিয়া জগন্নিয়ন্তার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবে। এক একটী ব্যাপার দেখিয়া আর কত আশ্চর্য্য হইব। সম্পূর্ণ জগতের বিচিত্র রচনাই তাঁহার গুণ-গরিমা ঘোষণা করিতেছে। ব্রহ্মাণ্ড-পিণ্ডের প্রতি মনোযোগ করিলে তাঁহার অপার মহিমা, তাঁহার স্বরূপ

ও প্রকৃতি বোধের সুগমতা হইতে পারে। এই ব্রহ্মাণ্ডই প্রকৃততঃ নিরাকার পরমেশ্বরের জ্ঞাপক, বোধক ও স্বরূপ বা লিঙ্গ বলিয়া কথিত হয়। ঈশ্বরের মায়া বা প্রকৃতি মধ্যে যদিচ এরূপ ব্রহ্মাণ্ড সমুদ্রের জল-বুদ্বুদের ন্যায় কোটী ২ উৎপন্ন ও বিলীন হইতেছে, ও একমাত্র ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার অনন্ত শক্তির ইয়ত্তা করা যায় না, তথাচ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহার মহিমার ক্ষুদ্র ইঙ্গিতেই তাঁহার অচিন্তনীয় শক্তির পরিচয় পাইয়া থাকেন।

লিঙ্গ শব্দে শিবের উপস্থ বা মেঢ্র উপলক্ষিত হয় নাই। লিঙ্গ তাঁহার বিভূতি, চিহ্ন বা মূর্ত্তি বিশেষ মাত্র। যথা—

"লিঙ্গং শিবস্য মূর্ত্তি বিশেষঃ। ইতি মেদিনী।
শিব লিঙ্গং শিব এব নতু শিবস্য শিশ্নঃ॥

"শিবলিঙ্গ" শিবের শিশ্ন নহে—শিবের জ্ঞাপক মূর্ত্তি বিশেষ। এই অখণ্ডরূপী শিব স্বরূপকে (সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম) ভক্তি ভাব সহ পূজা করিলে জীবের

ব্রহ্ম জ্ঞানের উদ্রেক হয়। প্রাচীন আর্য্য গণ এই ভাবকে হৃদয়ের সামগ্রী করিয়া অন্তরে বাহিরে তাঁহার পূজা করিতেন। কেহ শিলা, কেহ মৃত্তিকায় কেহ স্ফটিক আদি মহামূল্য রত্নে শিবলিঙ্গ রচনা করিয়া অর্চ্চনা করিতেন। লিঙ্গ ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ এবং গৌরী পট্ট বা বেদিকা ভগবন্মায়া বা প্রকৃতি। এই মায়া হইতে উদ্গত ও মায়ার আশ্রিত অখণ্ড চিহ্নই সাক্ষাৎ দেবাদিদেবকে জানিবার একমাত্র উপায়।

" অলিঙ্গঃ শিব ইত্যুক্তো লিঙ্গং শৈবমিতি স্মৃতং "
লিঙ্গ পুরাণ।

বিশুদ্ধ পরমাত্মা " লিঙ্গ " নামক কোন শারীর চিহ্ন নহেন কিন্তু ঈশ্বরের অনুমাপক বা বিজ্ঞাপক চিহ্ন অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডই লিঙ্গ বলিয়া কথিত হয়।

ভগবান্ সাংখ্যসূত্রকারও মহত্তত্ত্ব আদি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে " লিঙ্গসংজ্ঞা " দিয়াছেন, যথা—

" হেতুমদনিত্যমব্যাপিসক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্
অ, ১, সূ, ১২।

যাহার কোন কারণ আছে, যাহা অনিত্য, অব্যাপক, ক্রিয়াবান্, অনেক ও অন্যের আশ্রিত, তাহার নাম "লিঙ্গ"।

যেমন মান-চিত্রে মুদ্রিত চিহ্ন বিশেষ দ্বারা পর্ব্বত, নদী, নগর, মরু আদির জ্ঞান হয়, কেননা সেই গুলি পর্ব্বত নদ্যাদির জ্ঞাপক। স্বরূপতঃ চিহ্ন হইয়াও অনায়াসে দর্শকের অন্তঃকরণে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ বিশিষ্ট গিরি, প্রবল তরঙ্গায়িত নদী, বহু জনাকীর্ণ জনপদ, সুবিস্তীর্ণ বালুকা পূর্ণ মরু ভূমির জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়, শিব-লিঙ্গও ব্রহ্ম-জ্ঞানের তাদৃশ পরিচয়-ভিত্তি-ভূমি। ভূগোল ভিন্ন যেমন মান-চিত্রের চিহ্ন গুলি বুঝিতে পারা যায় না, তদ্রূপ শাস্ত্রজ্ঞান ভিন্ন শিবলিঙ্গ আদির প্রকৃত তত্ত্বও অবগত হওয়া কঠিন।

উপসংহার কালে আমরা লিঙ্গ পুরাণের উক্তির সঙ্গে ২ বলিতেছি যে—

বহুনাত্র কিমুক্তেন চরাচরমিদং জগৎ।

শিবলিঙ্গং সমভ্যর্চ্চ্য স্থিতমত্র ন সংশয়ঃ ॥

অধিক কি বলিব, সমস্ত জগৎ শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করিয়াই স্থির ভাবে স্থিতি করিতেছে, ইহাতে সংশয় নাই।

নির্জ্জন স্থান।

একদিন সাধু রামানন্দের নিকট দুই জন ধর্ম্মানুরাগী ভগবত্তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পুরুষ গিয়া উপস্থিত হইলেন। রামানন্দের তপোবন নিতান্ত নির্জ্জন ও রমণীয়। স্থানের দৃশ্য-প্রভাবে মনে সহজেই শান্তি ও ভগবৎ-অনুরাগের উদয় হইয়া থাকে। পুরুষদ্বয় তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, বনের স্বাভাবিকী শান্তিময়ী শোভায় বিমোহিত হইয়া বলিল, স্বামিন্! আমাদিগের কল্যাণার্থ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তত্ত্বোপদেশ দান করুন। সাধু তাঁহাদিগের কথায় কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন তোমরা দুইটী বন-কপোত ও দুই খানি ছুরিকা আনয়ন

কর। পুরুষদ্বয় আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে পর সাধু বলিলেন, তোমরা দুই জনে দুই নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া কপোতের কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া আন, যেন কেহ তাহা দেখিতে না পায়। দুই জনে দুই দিকে গমন করিলেন। একজন অতি সত্বরেই কপোতের কণ্ঠ কর্ত্তন করিয়া সাধুসমীপে প্রত্যাগত হইলেন। অপর ব্যক্তির প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া সাধু বসিয়া থাকিলেন। সমস্ত দিন অতিবাহিত হয় তথাচ তাঁহার দেখা নাই; অবশেষে সন্ধ্যাসমাগমে সেই ব্যক্তি ছুরিকা ও জীবিতাবস্থায় কপোতকে লইয়া ম্লান মুখে সাধু সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, স্বামিন্! আপনার আজ্ঞাপালনে আমি নিতান্ত অসমর্থ। সাধু ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে এবং অপর ব্যক্তি তাহার বহু পূর্ব্বে যে কার্য্য শেষ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা দেখাইয়া দিলে তিনি বলিলেন যে বহু ভ্রমণ ও সমস্ত দিন অনুসন্ধান করিয়াও এমন নির্জ্জন স্থান পাইলাম না, যেখানে কেহই

দেখিতে পায়না। আমি যেখানেই যাই এবং কপোতের কণ্ঠচ্ছেদে উদ্যত হই, সেই খানেই দেখি আমি ও সর্ব্ব সাক্ষী ঈশ্বর এই দুইজন দ্রষ্টা বিদ্যমান। সুতরাং নির্জ্জন স্থান আমি পাইলাম না এবং আপনার আদেশও প্রতিপালন করিতে পারিলাম না। এতৎশ্রবণে সাধু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, বৎস! তুমিই তত্ত্ব-কথা শুনিবার উপযুক্ত, কেননা, যে সকল ব্যক্তি বক্তার কথিত বিষয়ের প্রকৃত মর্ম্মার্থগ্রাহী না হইয়া কেবল ভাষার শব্দার্থ গ্রহণ করে, তাহাদিগকে সাধু গণ উপদেশ দান করেন না। তাহারা গূঢ় কথার বিপরীত অর্থ উপলব্ধি করিয়া কদাচারে প্রবৃত্ত হয়। ঈশ্বর যে সর্ব্বসাক্ষী কোনমতেই যে কোন বিষয় তাঁহাকে গোপন করা যায় না, তিনি সর্ব্বদা জাগ্রত ও সাক্ষী স্বরূপ, ইহাই তোমরা বুঝিয়াছ কিনা দেখিবার জন্য এই পরীক্ষা করিয়াছিলাম। এ ব্যক্তি আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া বৃথা একটী প্রাণীহানি করিল, এতাদৃশ পুরুষ

তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ শুনিবার অযোগ্য। তুমি সময়ান্তরে আমার সহিত একাকী সাক্ষাৎ করিয়া তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা করিও এই বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।

জীব! তুমি নিজ গুপ্ত দুরভিসন্ধি সাধন করিবার জন্য কত বার নির্জ্জন প্রদেশে গমন করিয়া থাক। জগতের কোন লোক সেখানে নাই সত্য, কিন্তু যিনি সমস্ত জগদ্ব্যাপী, তাঁহার বিদ্যমানতা, তাঁহার সর্ব্বত্রদর্শী চক্ষুর তীব্র দৃষ্টি কি তুমি রোধ করিতে পার? তাঁহাকে লুকাইয়া কার্য্য কবিবার কোন উপায়ই নাই, সুতরাং তোমার নির্জ্জন স্থান নাই। পাপ-প্রবৃত্তির সময় সাবধান হইবে।

ভক্ত! জগতের সমস্ত লোকেই তোমার বিরোধী। তোমাকে নির্য্যাতন করিতে সকলেই তৎপর! তুমি মনে করিওনা যে তুমি একাকী, তোমার সঙ্গে কেহ নাই ও তুমি সহায়-শূন্য। যাঁহাকে কেহই দেখিতে পায়না সেই ভবভয়হারী তোমার সহচর। যখন

সংসারের প্রপীড়নে দুঃসহ বেদনায় কাতর হইয়া তুমি নির্জ্জনে বসিয়া অশ্রুপাত করিবে, তখন দেখিবে তোমার হৃদয়-সখা তোমার অন্তর্বাহ্য বেষ্টন পূর্ব্বক তোমাকে রক্ষা করিতেছেন। তুমি অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হও, সমাজ হইতে নিষ্কাশিত হও, বিজন মরুতে নির্ব্বাসিত হও, তথাচ তুমি একাকী নহ।

সাধক! তুমি সংসারের কোলাহলে বিরক্ত হইয়া জন-সমাজ পরিত্যাগ করিলে, ভাবিলে নিভৃত নির্ঝর-তটে বসিয়া একাকী সুখে সাধনা করিবে। তুমি গৃহ-ত্যাগী হইতে পার, তুমি সমাজ-ত্যাগী হইতে পার, তুমি স্বজন পরিজন পরিত্যাগী হইতে পার, তুমি ধন-সম্পদ্ ত্যাগী হইতে পার, কিন্তু নির্জ্জন স্থান পাইবার উপায় কি? তুমি যেখানেই থাক, যত দিন তোমার ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সকল কর্ম্মোদ্যত থাকিবে, তত দিন তোমার অন্তর্গৃহ কোলাহল-পরিশূন্য হইবেনা। যত দিন তোমার মনে বিষয়ের চিন্তা উদয় হইতে থাকিবে...

তত দিন তোমার একান্ত-নিবাসের আশা কোথায়? এই জন্য শাস্ত্রে লিখিত আছে—

বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণো
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণিচ প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহন্তপোবনম্॥

মন হইতে বিষয়ানুরাগ বিদূরিত না হইলে বনে গমন করিলেও গৃহাবস্থান জন্য দোষরাশি বিনষ্ট হয়না। আবার গৃহে থাকিয়াও যিনি পঞ্চেন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করিতে পারেন, তিনি বনবাস পূর্ব্বক তপস্যার ফলভাগী হইতে পারেন। অনিন্দিত কর্ম্মে প্রবর্ত্তমান গৃহস্থের গৃহই তপোবন। অতএব সাধক! ইন্দ্রিয় গণের প্রবৃত্তি শূন্য অবস্থায় অবস্থিতির নাম নির্জ্জন বাস।

যোগীন্দ্র! তুমি সংসারের কোলাহল ছাড়িয়া, মনের কোলাহল অতিক্রম করিয়া কোন্ নির্জ্জন নিকেতনে নিবাস করিতেছ, তাহা জগতের উপলব্ধির

অগম্য। তোমার নিবাসই প্রকৃত নির্জ্জন-বাস। তুমি পরমাত্মার গম্ভীর সত্তায় নিমগ্ন হইয়া আপনারও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেখিতে পাইতেছ না। শাস্ত্রে লিখিত আছেঃ—

শাস্ত্রেষ্বিয়ানেব সুনিশ্চিতো নৃণাম্
ক্ষেমস্য সম্যগ্বিমৃষেষু হেতুঃ।
অসঙ্গ আত্ম ব্যতিরিক্ত আত্মনি
দৃঢ়া রতির্ব্রহ্মণি নির্গুণে চ যা॥

দেহ মনাদিতে নিরভিমান ও নির্গুণ পরব্রহ্মে ঐকান্তিকী রতিই জীবের পরম কল্যাণ সাধনানুকুল বৈরাগ্যব্রতের একমাত্র হেতু।

অতএব হে মহাভাগ! তুমি দেহাত্ম-বুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক বিজনবাসে সুখে বিহার করিতেছ, তোমার নিকট রূপ রস গন্ধ শব্দাদির কোলাহল নাই, তোমার নিকট উত্তম, অধম, নিকট, দূর, ক্ষুদ্র, বৃহৎ আদি বিরুদ্ধ ভাবের উপদ্রব নাই, তোমার নিকট আত্মীয়, পর, অত্র, তত্র, তৎ, এতৎ শুভ, অশুভ অহং, ত্বং,

জ্যোতিস্তমঃ আদির পৃথক্ বুদ্ধি নাই। তুমিই একাকী এবং তুমিই নিতান্ত নির্জ্জননি বাসী।

বুঝিলাম নির্ম্মল হৃদয়ই নির্জ্জন স্থান।

আমার অভিমান।

অভিমান সমস্ত দুঃখের মূল। যখনই কোন কার্য্যের জন্য আমার অভিমানের উদ্রেক হইয়াছে, আমি তাহাতেই দুঃখ পাইয়াছি, ইহা আমার জীবনের পরীক্ষিত ফল। আমাকে কেহ তিরস্কার করিলে আমার নিজ গৌরবের অভিমান আমাকে উদ্বেজিত ও ক্রমে তৎসহ বিবাদে প্রবৃত্ত করে। কেহ আমার নিন্দা করিলে আমার মহত্ত্বের অভিমান আমাকে উত্তপ্ত করে ও অন্যের দোষানুসন্ধানে পরামর্শ দেয়। আমার কার্য্যের অপটুতা দেখিয়া কেহ উপহাস করিলে অভিমান আমাকে নিতান্ত নির্ব্বেদ-গ্রস্ত করে ও আমার হৃদয় নীরবে রোদন করিতে থাকে। আমি বিদ্যাবান্, বিনা

আমন্ত্রণে আমি কোন ভদ্র-সমাজে যাইব কেন, এই অভিমান আমার অনেক সময় অনেক সৎ-সমাগম ও জ্ঞানোন্নতি সাধনে বিঘ্নোৎপাদন করিয়াছে। আমি ধনবান্, অমুক স্থানে গেলে পাছে আমি উচ্চ আসন না পাই, এই অভিমান কত দিন আমাকে কত আশ্চর্য্য প্রদর্শনীর আমোদ-লাভে বঞ্চিত করিয়াছে। কত দিন আমি সরলহৃদয় কৃষক ও ভৃত্যের সহিত অসঙ্কোচে হৃদয় খুলিয়া সদালাপ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু প্রভুত্বের অভিমান কেশাকর্ষণ করিয়া আমাকে বারণ করিয়াছে। শুনিলাম, অমুকের ভৃত্য আমার ভৃত্যকে কটূক্তি করিয়াছে, অমনি অভিমান ভৃত্যের সূত্র অবলম্বন করিয়া প্রতিবাদীর প্রভুর সহিত কলহ-কোলাহলে প্রবৃত্তি দিল। অজস্র অর্থব্যয় করিয়া ক্রমে আমি নিঃস্ব হইয়া পড়িলাম। আমি দর্শন-শাস্ত্রে সুনিপুণ পণ্ডিত, যখনই সভামণ্ডপে অন্য একজন পণ্ডিতকে "ঈশ্বরোঽস্তি", ইত্যাকার প্রতিপাদন করিতে শুনিলাম, অমনি আমার

অভিমান আমাকে তৎপ্রতিদ্বন্দী করিয়া "ঈশ্বরোনাস্তি" এই পাপপূর্ণ সিদ্ধান্ত করিতে প্রবৃত্তি দিল। আমি অভিমানের দাস হইয়া কত সত্যকে অসত্য বলিয়াছি, কত সদ্ব্যবস্থাকে অব্যবস্থা করিয়া প্রমাণ করিয়াছি, কত পাপ করিয়া লোকের সমক্ষে সাধুতার পরিচয় দিয়াছি। অভিমানই আমাকে কপট করিয়াছে, অভিমানই আমাকে বিবাদী করিয়াছে, অভিমানই আমাকে ঘোর নরকের কুটিল পথ দেখাইয়া দিয়াছে। হা! অভিমানই আমার পরম শত্রু হইয়া ভক্তের—মহাত্মার চরণ চুম্বন করিতে বাধা দিয়াছে, অভিমানই আমাকে অন্যের সৎকথা শুনিতে নিবৃত্ত করিয়াছে, অধিক কি অভিমানই আমাকে সমস্ত সুখের মূল ধর্ম্মসাধনে বারম্বার বারণ করিয়াছে। হা! আজ অভিমান বশতঃই আমি ভাগবতী কথা শুনিতে ২ অশ্রুমোচনে লজ্জা বোধ করিতেছি, অভিমানই আমার সর্ব্বনাশ করিল। অভিমান! তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর, আমার সন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল

হউক। একবার সর্ব্বত্র সম দর্শনে আমি পরমানন্দরস পান করিয়া চির দুঃখের প্রবলানল নির্ব্বাণ করি, প্রাণ পরিতৃপ্ত হউক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

রূপমাধুরী।

মনুষ্যের চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তির মধ্যে চাক্ষুষী বৃত্তি অতি প্রবল। মনুষ্য এই পাঁচ ইন্দ্রিয় সহযোগে যত কার্য্য করিয়া থাকে, তন্মধ্যে শ্রুত, আঘ্রাত, আস্বাদিত ও স্পৃষ্ট বিষয় গুলি অপেক্ষা দৃষ্ট বিষয়টী বহুদিন স্মরণ থাকে। চক্ষুর সমাচার মন স্বভাবতঃ যত গ্রহণ ও রক্ষা করে, সেরূপ অপর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় গুলি করে না। চক্ষু রূপপ্রিয়; এই জন্য মন রূপমাধুরীতে সহজেই বিমোহিত হইয়া থাকে। সুন্দর বস্তু যেমন মনোহর, এমন আর কিছুই নহে। আমরা যখন সংসার-সুখে উন্মত্ত থাকি, তখন

একটী মণিমুক্তাজড়িত স্বুবর্ণপাত্র আমাদের মনোহরণ করিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল আমাদিগের মনকে আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারে না। যখন অনুতাপ ও দুঃখের অশ্রুতে নয়ন ভাসিতে থাকে, তখন ঐ সৌন্দর্য্য আমাদের চিত্তক্ষেত্রকে পরিহার করে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা সৌন্দর্য্য-প্রত্যাশায় পরাঙ্‌মুখ থাকিব না। মনোমোহিনী রূপমাধুরীর অনুগমন করিব এবং শনৈঃ শনৈঃ উহা অবশ্যই তাহা প্রাপ্ত হইয়া মনোরথ পূর্ণ করিতে পারিব।

রূপমাধুরী সর্ব্বত্রই লীলা করিতেছে, ইহাকে অন্বেষণ করিলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সময়ে সময়ে ইহা মনোবুদ্ধি কল্পনার অতীত রাজ্যেও পলায়ন করিয়া থাকে। অনুসন্ধিৎসু সুচতুর হইলে উহার তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারেন। রূপমাধুরী কুহকিনীর ন্যায় এক স্থানে লীলা করিতে করিতে আবার ক্ষণমধ্যেই অতিদূরে প্রতীয়মান হয়। রূপমাধুরী কখন কুসুমদলে বসিয়া ক্রীড়া

করিতেছে, কখন,নবীন পল্লবের হরিতবর্ণে মিশিয়া সকলকে মোহিত করিতেছে, কখন প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের শীতলচ্ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছে, কখন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ময়ূখমালায় নৃত্য করিতেছে, কখন শ্মসানভূমিতে বিচরণ করিয়া সাধকের মন ভুলাইতেছে, কখন যুবতীর হাস্য-বিকসিত বদনে প্রকাশিত হইয়া জীবগণকে মুগ্ধ করিতেছে, কখন শুভ্র মেঘের বসন পরিধান করিয়া জনশূন্য শস্যক্ষেত্রে বিহার করিতেছে, কখন সুগভীর নীল ফেণিল সমুদ্রসলিলে তরঙ্গের সঙ্গে রঙ্গ করিতেছে, কখন পর্ব্বতের সমুচ্চ শিখরে উঠিয়া জগতের ক্ষুরাশিকে আহ্বান করিতেছে, আবার কখন নব দূর্ব্বাদলশ্যাম অঙ্গে আলিঙ্গন করিয়া নিঃশব্দে আমোদ প্রমোদ করিতেছে। রূপমাধুরীর মায়ায় বিমোহিত হইয়া জগৎ অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছে। রূপমাধুরী ধনী ও দরিদ্রকে, মূর্খ ও পণ্ডিতকে, অজ্ঞ ও বিজ্ঞকে, ক্ষীণ ও বলীকে, জড়বুদ্ধি ও চতুরকে, বালক, যুবা ও বৃদ্ধকে, স্ত্রী পুরুষ

ও ক্লীবকে সমভাবে বিমোহিত করিতে পারে। রূপ-মাধুরী জড়কে কণ্ঠ, ধীরকে বিচলিত ও কঠিনকে কোমল করিতে পারে। ধ্রুবের রূপমাধুরী উত্তানপাদ রাজাকে অপমানিত করিল, সীতার রূপমাধুরী দশাননকে স্বগণসহ যমালয়ে প্রেরণ করিল। বারাঙ্গনাগণের রূপমাধুরী শৃঙ্গী ঋষিকে সংসারাসক্ত করিল, মৎস্যগন্ধার রূপমাধুরী পরাশরের গৌরব হানি করিল, অনলের রূপমাধুরী পতঙ্গকে দগ্ধ করিল, সত্যের রূপমাধুরী যুধিষ্ঠিরকে বনবাসী করিল; শুকদেবের প্রকৃতিসিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যার রূপমাধুরীর নিকট রম্ভার অলৌকিকী রূপ-মাধুরী পরাভব মানিল। রূপমাধুরী ত্রিজগৎ শাসন করিয়া, দিঙ্মণ্ডল মোহিত করিয়া ও চতুর্দ্দশ ভুবনকে উন্মত্ত করিয়া লীলা করিয়া বেড়াইতেছে, তথাচ কেহ তাহাকে বশীভূত করিতে পারিতেছে না। রূপমাধুরীর মায়ামন্ত্রে মোহিত হইয়া মানব-মণ্ডলী আপনার মন অন্যাকে দান করিতেছে, বীরবর্গ বলবীর্য্যবিহীন

হইতেছে, পরাক্রমশালী মহাত্মাগণ মনুষ্যত্ব হারাইতেছে।

মনুষ্য বাহ্য ব্রহ্মাণ্ডের রূপমাধুরীতে আশক্ত হইয়াই রূপমাধুরীর প্রস্রবণ স্বরূপ মহাতীর্থ-সন্দর্শনে যাইতে পারে না। সে তীর্থে অপরূপ রূপমাধুরী। সেই পরমাশ্চর্য্য রূপমাধুরীর একটু আভাসেই এত রূপের সৃষ্টি হইয়াছে। আহা! সেই অপরূপ রূপ অবলোকন করিলে কি আর এই সকল রূপ দেখিতে ইচ্ছা হয়! সেই পরম পবিত্র রূপ-সাগরে একবার অবগাহন করিলে এই "নাম-রূপ" বিশিষ্ট জগৎ অসৎ বোধ হয়; সে রূপের তুলনা নাই। যোগীগণ সেই রূপসাগরের সুশীতল জলে স্নান করিতেছেন বলিয়া আর এই সামান্য রূপ দেখিবার জন্য নয়ন উন্মীলন করেন না। এক জন সাধক একটী পরম রূপলাবণ্যবতী যুবতীর বিকশিত বদনকমল দর্শন পূর্ব্বক মোহিত হইয়া নয়নজলে ভাসিতে লাগিলেন, যুবতী তাঁহাকে তাঁহার রোদনের কারণ

জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, যে আমি জন্মাবধি তোমার আশ্চর্য্য রূপের ন্যায় কোন রূপ দেখি নাই, কিন্তু তোমার অতুল রূপমাধুরী দেখিয়াই ভাবিলাম যে যিনি এই রূপের রচনা করিয়াছেন, না জানি তাঁহার কি আশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় রূপই হইবে, সেই রূপ-মাধুরী দেখিতে পাইলাম না বলিয়া আমি রোদন করিতেছি।

মানব ! তুমি কি সামান্য রূপে বিমুগ্ধ রহিয়াছ, একবার রূপ-মাধুরীর আধারকে স্মরণ কর। অবোধ বালকের ন্যায় সুচিত্র কন্দুক লইয়া আর কত দিন ভুলিয়া থাকিবে? এই যৎসামান্য রূপ-মাধুরীর লোভ ত্যাগ কর, তোমার জন্য আশ্চর্য্য রূপের ভাণ্ডারদ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। একবার সজলনেত্রে বালকবৎ সরল চিত্তে জগন্মাতার প্রেমাঞ্চল ধরিয়া প্রার্থনা কর, তুমি যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে। তুমি তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তান, তোমার প্রার্থনা অপূর্ণ থাকিবে না। একবার

চক্ষুরুন্মীলন কর, অজ্ঞানান্ধাকার ভেদ করিয়া সেই অপূর্ব্ব রূপমাধুরীর আশ্চর্য্য জ্যোতিঃ দেখিতে পাইবে।

শরদুৎসব।

কালের বিশালবক্ষে নৃত্য করিতে করিতে, ভারতের মহা মহোৎসবের দিন অগ্রসর হইতেছে। বর্ষা নিদাঘ-কালীন প্রভাকরের প্রখর কিরণের দর্প চূর্ণ করিয়া, তটিনী তড়াগ আদি ভাসাইয়া, ভগ্ন গৃহগুলিকে ভূমিসাৎ করিয়া, ঘোর রোলে দিগ্দিগন্তবাসীকে ত্রস্ত করিয়া, মণ্ডূকাদির হর্ষোৎপাদন করিয়া, ধীরে ধীরে ভারত-রঙ্গভূমি হইতে অবসর লইল। সম্মুখে শরৎকাল ; প্রকৃতির মূর্ত্তি অতি মনোহর হইয়া উঠিতেছে, বর্ষা আসিয়া তরুলতাগুলির গাত্রের ধূসর ধূলিরাশি ধৌত করিয়া, মলিন মুখ মার্জ্জনা করিয়া, পত্র পল্লব পুঞ্জকে সতেজ করিয়া তাহাদিগকে শরতে ভারতের উৎসব-

ক্ষেত্রে অভিনয় করিবার উপযোগী, করিয়া, কালের গভীর গর্ভে লুক্কায়িত হইল। নিশির শিশির রাশি ললিত তৃণ গুলির উপর পড়িয়া অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, যেন শারদীয়োৎসবের জন্য প্রকৃতি মণিমুক্তাখচিত আস্তরণ বিস্তার করিয়া রাখিতেছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুলতার পাতায় ২ শিশির পড়িয়া মুক্তার ন্যায় ঝুলিতেছে, যেন শারদীয়োৎসব দেখিবার জন্য অগণ্য পুরবালিকা আসিয়াছে। তাহাদের নাসিকায় একটী একটী মুক্তার শোভা হইয়াছে। সূর্য্য প্রখর কিরণ বর্ষণ করিতেছেন; মধ্যে মধ্যে মেঘমালা আসিয়া তাঁহাকে লজ্জা দিতেছে। দিবাতে বৃক্ষের ছায়ার দিকে দৃষ্টি করিলে, নয়ন সুশীতল হয়। রাত্রির তুলনা নাই। সুনীল আকাশে স্তবকে স্তবকে নক্ষত্রমণ্ডল বিকশিত হইয়া যেন একখানি নীল চন্দ্রাতপ উজ্জ্বল মণিমালায় খচিত করিয়া তুলিতেছে। শরদাগমে, সুধাকরের আহ্লাদের সীমা নাই, হাঁসিতে হাঁসিতে তারাগণের সঙ্গে অনন্ত

আকাশে লীলায় প্রবৃত্ত ; নীরব রজনীতে শরদিন্দুর এই প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষ ও তাঁহার সুচারু হাস্যবিকশিত বদন বিলোকন করিয়া কুমুদিনী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারে না ! অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া, যেন মৃদু মধুর হাস্যে তাঁহার সম্ভাষণ করিতেছে এবং হর্ষোৎফুল্ল হইয়া সরসীর বায়ু-বিতাড়িত চঞ্চল বারির সঙ্গে মিলিয়া নৃত্য করিতেছে। প্রকৃতির মুখে আর হাঁসি ধরে না। বিশাল নীল গগণে নক্ষত্রমালা হাস্য করিতেছে। ভূমিতে যূথী, জাতি, মালতী, মল্লিকা, সেফালিকা, রজনীগন্ধ আদি তরুলতা প্রফুল্ল কুসুমদামে বিভূষিত হইয়া হাস্য করিতেছে, কুমদিনী হাঁসিতে হাঁসিতে সরসীর জলে ঢলিয়া পড়িতেছে ; সমস্ত জগতই আজ হাঁসিমাখা। নক্ষত্র গুলি হাঁসিতে হাঁসিতে এক একবার বারিদবসনে মুখ ঢাকিয়া লজ্জা সম্বরণ করিতেছে। আবার এদিকে পবনদেবও আহ্লাদে নৃত্য করিতেছেন। তিনি আহ্লাদে মত্ত হইয়া একবার এদিক একবার ওদিক

করিয়া বেড়াইতেছেন। পিতার ন্যায় স্নেহভরে একবার এফুলটীর মুখ একবার ও ফুলটির মুখ চুম্বন করিয়া যেন তনয়াগণকে আদর করিতেছেন। এক একবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরু লতাগুলিকে আদর সহ ক্রোড়ে ধারণ করিতেছেন; ফুলগুলির পরিমল লইয়া ভারত আমোদিত করিতেছেন। প্রকৃতির আনন্দ দেখিয়া কেহই স্থির নহে, সকলের মনেই আনন্দের নদী উথলিয়া উঠিল। তরঙ্গিনীগণ তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া, নৃত্য করিতে ২ চলিতেছে, নির্ম্মল চন্দ্রিকাজাল লহরীমালায় সুস্নিগ্ধ ভাবে ক্রীড়া করিতেছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যও যেমন সুন্দর, শরতের উৎসবও তেমনই মনোহর।

লোকে বলিতে পারে, এই দুঃখের দিনে আবার উৎসব কেন! দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, বহুবৃষ্টি, সংক্রামক পীড়া, রাজবিগ্রহ, সমাজবিপ্লব আদি ভারতকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে; ভারতর নিশ্চিন্ত হইয়া একটী নিশ্বাসও ফেলিবার অবকাশ নাই ; ইহাতেও

উৎসব ! আমরা বলি, ভারত এই উৎসব ভুলিতে পারিবে না। ভারতের শরীরে যত দিন শোণিত প্রবাহিত থাকিবে ও যত দিন ভারতের স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত না হইবে, তত দিন এ উৎসব ভারত ভুলিতে পারিবে না ; বাস্তবিকও এ উৎসব চিরানুষ্ঠানের যোগ্য। এই উৎসব শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের সান্ত্বনা, দুর্ব্বলের বলবিধান, নিরাশ্রয়ের সহায়তা, নির্ব্বীর্য্যের তেজ উদ্দীপনা, মূঢ়ের জ্ঞান সঞ্চার, দুঃখীর দুঃখাপনোদন করিবার আশাস্থল। এই উৎসব নিঃস্বকে ধনী করিবার, অহঙ্কারীর দর্পচূর্ণ করিবার, ভক্তকে সুখী করিবার, গুণবান্‌কে পুরস্কার দান করিবার, দোষীকে দণ্ড দিবার, পতিতকে উদ্ধার করিবার ও দুঃসাধ্য সাধন করিবার মহামন্ত্র শিক্ষা দিয়া থাকে। এ উৎসব—তামাসা নহে ইহা আমাদিগের জীবনের উৎসব। এই উৎসবই ভাবী ভারতের ভরসাস্থল। এ উৎসব বাহিরের—রঙ্গ ভূমির উৎসব নহে, ইহা পুণ্যক্ষেত্র আর্য্যভূমির উৎসব, আমাদিগের সমস্ত ভারতের—হৃদয়ের মহা মহোৎসব !!

রামলীলা।

অচেতন ভারতে চেতনাসঞ্চার করিবার ইহাপেক্ষা আর উৎসাহকর লীলা আমাদিগের ভারতে নাই। ভারত যেরূপ নিস্তব্ধ, নির্ব্বীর্য্য ও নিদ্রিতপ্রায়, রামলীলা তাহারই মহৌষধ। ইহাতে উত্তেজনা, বিক্রম ও উৎসাহের উদ্দীপনা করিয়া দেয়। রামচন্দ্র যখন বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মাস্ত্রে তাড়কা বধ করিলেন, তখন আমরা বুঝিলাম যে, ব্রহ্মানুভব ও বিজ্ঞানশাস্ত্র-শিক্ষায় আর্য্যগণ ভারত হইতে অনার্য্যগণকে দূরীভূত করিয়াছিলেন। যখন লীলা-ক্ষেত্রে জনক রাজার সভায় সীতার স্বয়ম্বর সময়ে "নির্ব্বীরমুর্ব্বীতলং" এই হৃদ্বিদারক ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, অমনি হৃদয় চমকিয়া উঠে, চক্ষে জল-ধারা বহিতে থাকে, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, আর জিতেন্দ্রিয় সুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণের সুচারু চরণ চুম্বন করিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে তখন কোন্ ভগ্ন হৃদয়ে উত্তেজনার সহিত শিরায় শিরায়

সমুস্থ শোণিত বহিতে না থাকে! অহো! উক্ত তিরস্কার বর্ত্তমান ভারতের সম্পূর্ণ উপযোগী। যখন গম্ভীরমূর্ত্তি শ্রীরামচন্দ্রকে বীরদর্পে হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাকে গ্রহণ করিতে দেখি, তখন আমাদিগের আশার সঞ্চার হয় এবং বিক্রমবলেই আর্য্যগণ যে ভারতলক্ষ্মী লাভ করিয়াছিলেন, ইহা প্রতীত হইতে থাকে। যখন দেখি অযোধ্যার রাজসিংহাসনে অকলঙ্ক শ্রীরামচন্দ্র অধিরোহণ করিতে গিয়া বনবাসী হইলেন, হা! তখন কোন্ পাষাণহৃদয় গলিয়া না যায়! কোন্ মনুষ্যের চক্ষু অশ্রু বর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারে! কোন্ কঠোরচিত্ত রত্নমূর্ত্তিকে বনে পাঠাইতে পরামর্শ দেয়! হা! উপযুক্ত পাত্রে রাজ্যভার সমর্পণ করিতে—যাঁহার রাজ্যশাসন-কালে প্রজাগণ নিরুপদ্রব থাকিবে—তাঁহাকে রাজা করিতে কে না ইচ্ছা করে। যিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালনে সমর্থ, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়! হা! কোথায় আর্য্যগণ মহাসুখে

ভারত-লক্ষ্মী ভোগ করিবেন, না, কালচক্র সমস্ত সুখ হইতে বঞ্চনা করিবার সোপান প্রস্তুত করিয়া দিল। যখন লীলা-ক্ষেত্রে মায়ামারীচের অভিনয় দর্শন করি, তখন বিজাতীয়দিগের চাতুরীপূর্ণ বাণীতে বিশ্বাস করত পরিণাম-বিচারে অসমর্থ হইয়া আর্য্যজাতি কিরূপে পতনোন্মুখ হইলেন, তাহা বুঝিতে পারি। রঙ্গ-ভূমিতে দুরাচার দশানন আসিয়া, রাক্ষসী মায়া বিস্তার পূর্ব্বক জানকীর কেশাকর্ষণ করিয়া লঙ্কায় লইয়া গেল, উঃ! কি দুর্দ্দিন! কি দুর্ঘটনা! ভাবিলে, স্মরণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আজ আর্য্যজাতি ভারত-লক্ষ্মী হারাইলেন! সীতার সহিত লক্ষ্মণের ভেদ, গৃহ-বিচ্ছেদই এই দুর্ঘটনার মূল! কি কুক্ষণেই যে ভারতলক্ষ্মী পূর্ণেন্দুকে কালরাহু গ্রাস করিল, আর মুক্ত হইল না। অহো! ভারতবাসী! একবার রঙ্গভূমিতে সমাগত হও, একবার দেখিয়া যাও, তোমাদের পিতৃগণের রোপিত সুখতরুর উচ্ছেদ হইতেছে। মারীচী মায়া তোমাদের চির দুর্দ্দশার

ভিত্তি স্থাপন করিল। পঞ্চবটীবন (ভারতবর্ষ) অন্ধকার করিয়া সীতা সমুদ্র-পারে নীত হইলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান-রূপিণী সীতার অভাবে ভারত আজ অরণ্যানী হইল। এক্ষণে উপায় কি! দেখ দেখ লীলাক্ষেত্রে অতঃপর সীতা উদ্ধারের কি কৌশল বিস্তার করা হইতেছে। শ্রীরাম তপস্বীবেশে বনে ২ ভ্রমণ করিয়া সুগ্রীব সহ সখ্যতা স্থাপন করিলেন। বনের পশু, পক্ষী ও তাঁহার প্রতি রাবণের অত্যাচার দেখিয়া রোদন করিল ও তাঁহার সহায়তার জন্য মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হইল না। তাঁহার বালযোগীবেশ, সৌজন্য ও উৎসাহ সকলকেই মোহিত করিয়া ফেলিল, হনুমান সাগর পার হইয়া গিয়া লঙ্কা হইতে সীতার তত্ত্ব আনিলেন, লঙ্কাতে নিজ বীরত্বের চিহ্ন চিত্র করিয়া আসিলেন। নীল, নল, গয়, গবাক্ষ, সুষেণ আদি সকলে শ্রীরামের সহযোগিতা করিতে একত্র হইলেন। সমুদ্রে সেতু নির্ম্মাণ হইল, দাশরথি সমরনীতি অনুসারে যুদ্ধ

সজ্জা করিলেন। সমুদ্রকূলে মহাবিক্রমশালী বীরবর্গের শিবির সন্নিবেশিত হইল। রাম রাবণের ঘোর সমর! ভয়ঙ্কর যুদ্ধবাদ্যে বসুন্ধরা কাঁপিয়া উঠিল। উভয় পক্ষীয় বীরগণের বিক্রম-গর্জ্জন অভ্রভেদ করিয়া দেবলোক পর্য্যন্ত চকিত করিয়া তুলিল। যুদ্ধাস্ত্র সকল সুশাণিত ও বহির্ম্মুখ হইল। ভারতবাসি! এস মনোযোগ পূর্ব্বক এই লীলা দর্শন করি। ভারত-লক্ষ্মীকে হারাইয়াছি। আচণ্ডাল সহ মিত্রতা করিতে, ভগবদুপাসনা, সৌজন্য ও উৎসাহকে আশ্রয় করিতে হইবে, পৃথিবীর দিগ্দিগন্তের মহামনাগণ আমাদের দুঃখের বার্ত্তা শুনিয়া দুঃখিত হইবেন, আমাদিগের স্বাধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য তাঁহারা যথোচিত সাহায্য করিবেন। বাণিজ্য, বিজ্ঞান বলে, সমুদ্রের দুই পার এক করিতে এবং বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মজ্ঞান, বিজ্ঞানাদিরূপ সুশাণিতাস্ত্রে পরপারবর্ত্তীগণকে পরাভব করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। পরস্পর দ্বেষ, হিংসা পরিহার করিয়া

ভারতের আভ্যন্তরিক উন্নতিসাধন জন্য, সকলে প্রেমালিঙ্গন কর। শ্রীরামচন্দ্র সীতার জন্য অতি নীচকেও আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। আজ রামচন্দ্রের গুণে বশীভূত হইয়া রাবণানুজ বিভীষণ, তৎসহ মিত্রতা করিবার জন্য অভিনয়ক্ষেত্রে সমাগত; ইনিই রাবণবিজয়ের প্রধান সহায়, ইনিই সীতা উদ্ধারের প্রকৃত উপায় শিক্ষা দেন, ইঁহাকেই ভারতের ভাবী রাজচক্রবর্ত্তী-চূড়ামণি পরম মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ভারত! ইউরোপীয়দিগের সহিত মিলনই আমাদিগের বিভীষণের সম্মিলন বলিতে হইবে। ইহাদিগের কৃপায় আমরা অনেক শিক্ষা করিয়াছি। যে দিন হইতে ভারত-লক্ষ্মী আর্য্যগণের অঙ্কপাশ শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, সেই দিন হইতেই আমরা মূর্চ্ছিত—মৃতপ্রায়; ইঁহাদের একত্রবাসে, ইঁহাদিগের শিক্ষা প্রভাবে, আমাদিগের নিজ সম্পত্তি ভোগ করিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে, এবং ইঁহারা স্বাধিকার পুনর্লাভের উপায়, ইতিহাস

ও রাজনীতি দ্বারা শিক্ষা দিতেছেন। দেখ দেখ! লীলাক্ষেত্রে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া, সুমিত্রাকুমার মহাবীর মেঘনাদকে নিপাত করিতেছেন, আহা! এটী কি আশ্চর্য্য দৃশ্য! চতুর্দ্দশ বর্ষ অনাহারে ও অনিদ্রায় বীরবরের শ্রীরাম-সেবার ফল দর্শন কর। বীর-কেশরী অক্ষুব্ধসাগর-বিক্রমে তপস্তেজকে সহায় করিয়া, বাসববিজয়ী দশানন-সুতের চিরসঞ্চিত বীরদর্প দলন করিলেন। আহো! বুঝিলাম, তপস্তেজের নিকট সূর্য্যসমীপে খদ্যোতিকার ন্যায় সমস্ত তেজই মলিন হইয়া যায়। উঃ! ও আবার কি! ত্রিভুবন ভস্মীকরণ-পারদর্শী ভস্মলোচন কৌশলজালে জড়ীভূত হইয়া, স্বয়ং ভস্ম হইয়া গেল। ভারত! যে অগ্নি সমস্ত জগৎকে ভস্ম করিতে পারে, সেও স্বয়ং ভস্ম হইয়া যায়। কালচক্র মহাবীরকে মশকবৎ সংহার করে। সম্মুখে ভস্মলোচনকে দেখিয়া ভয় করিও না। দেখ দেখ কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! দিগ্দশ অন্ধকার করিয়া, কুম্ভকর্ণ আজ

অভিনয়ক্ষেত্রকে, ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে. দেব. দানব, মানব, নাগ, সকলেই কম্পমান। ভুবনগ্রাসকের হুঙ্কারে সকলে হতচেতন। দেখিতে দেখিতে শ্রীরামের তীক্ষ্ণবাণে এই মহাকায় অকাল নিদ্রাভঙ্গ জন্য, মহানিদ্রাবেশে চিরদিনের জন্য ধরণীশয্যায় শয়ন করিল। একে একে অতিকায় প্রভৃতি বীরবর্গ সমর-শয্যায় মরণ-মূর্চ্ছাকে আলিঙ্গন করিলেন। অহো ভারতবাসি! শুন শুন, কুম্ভকর্ণ বজ্রনিনাদে কি বলিয়া গেল। "মনুষ্য! যত দিন পর্য্যন্ত তোমার উপযুক্ত বল, বীর্য্য, সহায়, সম্পত্তির আয়োজন ও পরদর্প-দলন-পারগতা প্রকৃতি-গত না হইবে, তত দিন অকালে শান্তিভঙ্গ করিও না; অকালে শান্তি (নিদ্রা) ভঙ্গ হইলে, সমরসাগরে বৈরবীর্য্য-বাড়বানলে বিদগ্ধ হইয়া যাইবে"। এক্ষণে ভয়ঙ্কর লীলার ভয়ঙ্কর পরিচ্ছেদ অভিনীত হইতে চলিল। দশানন বংশক্ষয় দেখিয়া, বিংশতিলোচন রক্তবর্ণ করিয়া, বিংশতি হস্তে প্রখর বাণ লইয়া ঘোর সমরে

প্রবৃত্ত। এই যুদ্ধে দিগ্‌দশ কাঁপিয়া উঠিল, দেবগণ রাবণবিনাশী বীজমন্ত্র জপ করিতেছেন; শ্রীরামের সমস্ত বাণ ক্ষয় হইতে লাগিল। লঙ্কাধীশের দশ মস্তক বিনষ্ট হয় না। শ্রীরামচন্দ্র সহস্র কমলে মহামায়ার আরাধনা করিলেন। রাবণের মৃত্যুবাণ হস্তগত হইল। ক্রমে ক্রমে শমনদমন দশানন শমন-সদনে গমন করিল। রাক্ষসকুল নির্মূল হইল। সীতার উদ্ধার হইল। স্বর্গ,মর্ত্ত্য, রসাতল জয়ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। রাবণ দশমুখে বলিয়া গেল "পরস্বাপহরণ করিও না, অহঙ্কার পরিত্যাগ কর; আজ গৃহভেদীই আমার মর্ম্মভেদী হইল"।

ভারতবাসি! সীতার উদ্ধার, ভরতমিলন, রামের রাজসিংহাসনাধিরোহণ এতাবৎ কি তুমি দেখিতে চাও না! এই লীলাভিনয় ভাল করিয়া দর্শন কর, তোমার দুর্দ্দশাবসান হইবে। অহো! ভরত যখন মঙ্গল বাদ্য, বসন, ভূষণ, সেনা, সামন্ত, হয়, হস্তী, বিবিধ, যান, বন্ধু, বান্ধব ও অগণ্য জনগণ সহ হনুমান-

প্রমুখ-সেনাগণ-পরিবেষ্টিত সীতা লক্ষ্মণ সহ রাবণ-বিজয়ী শ্রীরামচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন দূর হইতে শ্রীরামকে দেখিয়া, ভরত, শত্রুঘ্ন যান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সাশ্রুলোচনে শ্রীরাম জানকী চরণে প্রণাম করিলেন, রাম লক্ষ্মণ যখন সমাগত ভ্রাতৃদ্বয়কে বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন, জয় রাম, জয় রাম, জয় জয় রাম ধ্বনিতে গগণ মণ্ডল আকুলিত হইয়া উঠিল। অযোধ্যাপুরী যেন মরুভূমিতে মহাসাগর-সমাগমে আনন্দের উত্তাল তরঙ্গমালায় ভাসিয়া গেল। এই জয় জয় শব্দের মধ্য দিয়া শ্রীরামচন্দ্র ইঙ্গিতে বলিলেন, অহো মনুষ্য! যদি দানবকুল নির্ম্মূল করিতে চাও, কেবল নিজ চেষ্টা, বা অহংকারাদি দ্বারা কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে না। সদ্‌গুরু কর্ত্তৃক দীক্ষিত হও, যোগ শিক্ষা কর, সহস্রারারবিন্দে ঐশী শক্তির আরাধনা কর। নিরাপদ হইবে, ভারতে সৌভাগ্যলক্ষ্মী পুনঃ প্রাপ্ত হইবে।

এই লীলাই আমাদের অনুকরণীয়, ইহাই আমাদের আশার ভিত্তি ভূমি, ইহা প্রকৃত প্রভাবে ভারত-রঙ্গ-ভূমিতে অভিনয় করিবার সম্পূর্ণোপযোগী। ভারত বাসি! রামলীলাভিনয়ে ধন, মন, প্রাণ উৎসর্গ কর। এই লীলাই অধ্যাত্মশাস্ত্র শিক্ষা দিতেছে। জীবাত্মা (রাম) সদ্গুরুর (বিশ্বামিত্রের) নিকট ব্রহ্মজ্ঞান (ব্রহ্মাস্ত্র) লাভ করিয়া মমতা (তাড়কা) নাশ করিবেন। জনক-পুরে (হৃদয়ে) হরধনু (তমঃ) নষ্ট করিয়া সীতা (আত্মজ্ঞান-বিদ্যা) লাভ করিতে হইবে। রাজা না হইয়া বনে (বৈরাগ্য জন্য বিজন বাসে) গমন পূর্ব্বক তপস্যা করিবে; তথায় মারীচ (ভ্রম) অনুগমন করিলে, বিদ্যাকে (সীতাকে) রাবণ (অহঙ্কার) হরণ করিয়া লইয়া যায়। আবার বিবেক, বৈরাগ্য শম দমাদির (সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান, সুষেণ আদির) সাহায্যে সমুদ্র (মায়া) লঙ্ঘন পূর্ব্বক দুদ্ধর্ষ অহঙ্কার প্রমুখ কাম, ক্রোধাদি দুর্ব্বৃত্ত দানবদল দমন করিয়া, সীতা উদ্ধার করিতে হইবে।

দুর্গোৎসব।

শ্রীরামচন্দ্র রাবণ সংহার জন্য, অকালে বোধন করিয়া, এই দশভুজার পূজা করিয়াছিলেন। দশানন, রাবণ, অহঙ্কারেরই (দশ ইন্দ্রিয়যুক্ত দেহে" অহং মমেতি জ্ঞানের) প্রতিরূপ। কাম (মেঘনাদ) ক্রোধ (ভস্মলোচন) লোভ (অতিকায়) মোহ (কুম্ভকর্ণ) মদ (মহিরাবণ) মাৎসর্য্য (অহিরাবণ) মারীচ (ভ্রমদৃষ্টি) সূর্পণখা (দুঃশ্চেষ্টা) ইত্যাদি দানব দানবীগণের একমাত্র অধীশ্বর। অহং মমেতি বিনষ্ট না হইলে জীব কখনই (আত্মতত্ত্ব-বিদ্যা) সীতালাভে সমর্থ হয় না। অহঙ্কার নির্ম্মূল করিতে হইলে, জ্ঞানের আরাধনা করিতে হয়। (রামলীলার মর্ম্মানুসারেও বুঝিতে হইবে যে মনুষ্য যতক্ষণ "আমি" ও "আমার" প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, ততক্ষণ সমরাঙ্গনে অগ্রসর হইবার অনুপযুক্ত, যখনই সে আত্মস্বার্থ জীবন-সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে পারিবে, যখনই তাহার শক্তিবলে সংসার-সম্বন্ধ-চ্ছেদন-সামর্থ্য

জন্মিবে, তখনই সে সমর-বিজয়ের আশা করিতে পারে)। জীব আত্মজ্ঞানলাভ করিলে আর মরণের ভয় করে না; কেননা আত্মা অবিনাশী; দেহ-বিচ্ছেদে তাহার ভয়ই বা কি, তার ভাবনাই বা কি। দেহনাশে জীবের ক্ষোভ বা ক্লেশ অনুভব হয় না, এই জন্য দুর্জ্জয় রাবণ নিধন করিতে গেলে ভারতে আত্মজ্ঞান-সাধনের প্রচার হওয়া সম্পূর্ণ আবশ্যক। আত্মজ্ঞান ও বৈরাগ্য (স্বার্থনাশে অক্ষুব্ধতা) যুক্ত পুরুষবর্গ ভিন্ন ভারত উদ্ধারে অন্য কেহ সমর্থ হইবে না। বেদ বেদান্তাদির ধর্ম্ম যত দিন অতি বেগে ভারতে আধিপত্য করিতেছিল, তত দিন ভারত স্বাধীন ও উন্নত ছিল। সেই ধর্ম্মের বহুল প্রচারাভাবের সঙ্গে সঙ্গে পরাধীনতা ও হীন দশা ভারতের পার্শ্ববিলাসিনী হইয়াছে। যে জ্ঞান দান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ গাণ্ডীব-ত্যাগোদ্যত ভগ্নোৎসাহ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কুরুক্ষেত্রে কৌরবপক্ষকে ক্ষীণ করিয়াছিলেন, ভারতে সেই জ্ঞান প্রচারিত না হইলে আমাদের এ

দুর্দ্দশা দূরীভূত, হইবে না। পাণ্ডবগণ ঐ জ্ঞানকে সহায় করিয়াই আপনাদিগের হৃত-সর্ব্বস্ব পুনর্লাভ করিয়াছিলেন। শারদীয় উৎসব তাহারই (সেই জ্ঞানোপদেশেরই প্রতিকৃতি মাত্র) যিনি এই দশভুজার প্রকৃত রূপে পূজা করিবেন, তিনিই ভারতের বিজয়-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ।

ঐ দেখ, দশভুজা (আত্ম-তত্ত্ব বিদ্যা) জগন্মনোমোহিণীরূপে উপাসকের হৃদয়মন্দির আলোকিত করিতেছেন এবং আত্মমন্ত্র শিক্ষা দিতেছেন। বৎস! আমার এ অপূর্ব্বরূপ ভক্তি পূর্ব্বক আরাধনা করিলে জীবের বন্ধন মোচন হইয়া থাকে। যিনি মুক্ত হইতে প্রার্থনা করেন, তাঁহাকে আমার দশভুজারূপ ধ্যান করিতে হইবে, অর্থাৎ দশদিক্ রক্ষা করিবার জন্য বুদ্ধি, বল, অস্ত্র, শস্ত্র সঞ্চয় করিতে হইবে। তিন নেত্রে অর্থাৎ ত্রিকালদর্শী হইতে, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান বিবেচনা করিতে, অর্থাৎ গত সময়ের ইতিহাস পাঠ

দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সমাজের পতন ও উন্নতির আলোচনা করিতে হইবে, উপযুক্ত মন্ত্রীগণ সহ পরিণাম বিচার করিতে হইবে, এবং বর্ত্তমান দেশ, কাল, পাত্রের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। সিংহ ও সর্প অর্থাৎ ধর্ম্ম ও কালের সহায়তা লইতে হইবে। বিদ্যা (সরস্বতী) ঐশ্বর্য্য (লক্ষ্মী) এ উভয়কে যত্নসহ সংগ্রহ করিতে হইবে। কার্ত্তিকেয়ের (জিতেন্দ্রিয় সেনানীর) সাদরে সৎকার করিতে হইবে। মূষিক-বাহন গণেশের পূজা অগ্রে আবশ্যক, অর্থাৎ এরূপ বুদ্ধিমান্ পুরুষ চাই, মূষিক যেমন গ্রন্থিজাল ছেদ করিতে, বস্ত্রাদি ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারে, তদ্রূপ তিনি বিপক্ষ পক্ষের কৌশলজাল ও সন্ধিভেদ করিতে পারিবেন, তাহা হইলে বিঘ্নবিনাশন বিপুল বিঘ্ন বিপত্তি বিনষ্ট করিবেন। বৎস! এরূপ না হইলে অসুর বিনাশ করা যায় না। ভারতবাসি! ভবভাবিনী ভবাণীর ভবভারহারিণী বাণী শ্রবণ কর। প্রতি ভবনে ভক্তিসহ ভাবময়ীর ভজনা

কর। ভয়, ভাবনা বিদূরিত হইবে। নির্ব্বাপিত ভাবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে, মরুভূমিতে পূর্ণ সরোবর দৃষ্ট হইবে, অচেতন ভারতের চেতনা সঞ্চার হইবে।

এই শারদীয় উৎসব উপলক্ষে বঙ্গদেশ আনন্দে হাঁসিতেছে, গৃহ আদি পরিমার্জ্জিত হইবে. সকলে নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিবে, বিদেশ হইতে প্রবাসী গৃহে সমাগত হইবে. আত্মীয় বন্ধু, সকলে একত্রিত হইবে, স্বামী স্ত্রীমুখ অবলোকন করিয়া, পুত্র পিতা মাতাকে দর্শন করিয়া, পিতা মাতা সন্তানকে দেখিয়া আনন্দে ভাসিতে থাকিবেন। ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, দীন দরিদ্রগণ বিষয়িগণের নিকট বার্ষিক বৃত্তি পাইবেন, আহ্লাদের সীমা নাই। স্ত্রীগণ—কাহার স্বামী কি নূতন অলঙ্কার দিলেন, বালকগণ কাহার পিতা কি রূপ পরিচ্ছদ দিল, সাধারণ জনগণ—কাহার গৃহে কি রূপ প্রতিমা হইল এই আন্দোলনে ব্যস্ত। এই উৎসব জন্য বঙ্গদেশের বিষয়-কার্য্যালয় সকল বন্ধ, সকলের

মন উৎসবানন্দে মত্ত। যে সকল লোক সম্বৎসর বিদেশে ছিলেন, এ অবকাশে সকলে একত্রিত। আমাদের দেশে এ রূপ আনন্দের দিন হয় না। বঙ্গবাসি! অনেক দিন দেশ বিদেশে রহিয়াছেন. বিষয়কার্য্য উপলক্ষে বিদেশে থাকা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে. জন্মভূমির প্রতি আস্থা হ্রাস হইয়াছে। বিদেশে সভা করিয়া, বক্তৃতা করিয়া ও শুনিয়া দেশীয় ভাবে উত্তেজিত হইয়া কত দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন; সেই রূপ একবার নিজ২ গ্রামা-দিতে করুন। সমস্ত দেশীয় বন্ধু বান্ধব একত্রিত, সদ্ভাবে মিলিত হউন, কেবল আমোদ প্রমোদ গল্প করিয়া সময়াতিপাত করিবেন না। এ রূপ দিন আবার জীবনে ঘটিবে কি না, তাহা কে জানে! জন্মভূমির হিত-সাধনে প্রবৃত্ত হউন। শত শত লোক একত্রে সাক্ষাৎ হওয়া সময়ান্তরে অসম্ভব। যাহাতে স্বদেশের কল্যাণ সাধিত হয়, তাহারই পরামর্শ করুন। যাহাতে

বিদ্যালয় গুলি উত্তম রূপ চলে, তাহার সন্বিধান করুন। বালকগণ বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে নীতি শিক্ষা করিতে পারে, অসচ্চরিত্র না হয়, তাহার ব্যবস্থা করুন। যাহাতে দলাদলি ও পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ মিটিয়া যায়, তাহার চেষ্টা করুন, যাহাতে স্ত্রী পুরুষাদির প্রকৃতি ধর্ম্মানুগত হয় তাহার উপায় করুন। বঙ্গবাসি! এই মহোৎসবে চিরকাল্যাণ-পথের সূত্রপাত করুন। এই উৎসবই সকলের মন সরল ও নির্ম্মল করিয়া দেয়। বিজয়ার দিনটী মনে করুন। কি অপূর্ব্ব ভাব! লোক সকল ভক্তি-ভাজন-গণকে প্রণাম করিতেছে, তাঁহারা তাহাদের কল্যাণ কামনা করিতেছেন, পরস্পরে প্রেমালিঙ্গন করিতেছেন, সকলে সকলের গৃহে যাইতেছেন, সকলে সকলের কুশল চাহিতেছেন, শান্তিজল গ্রহণ করিতেছেন, মিষ্টান্ন ভোজন করিতেছেন। অহো! এ দিনে যেন ভারতে শোক, তাপ, দুঃখ নাই। ভারত আনন্দ-

নিকেতন! আশ্চর্য্য উৎসব! আজ চিরবৈরীর সহিতও প্রেমালিঙ্গন করিতেছে। ঐ দেখ যাহাকে সম্বৎসর ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহার পাদদেশে প্রণত, যে শত্রুতা সাধন করিতেছিল, আজ সে তাহার কল্যাণ কামনা করিতেছে।

ভগবান করুন, এই উৎসব গৃহে গৃহে অনুষ্ঠিত হইতে থাকুক, ভারত আনন্দে সদাই বিহ্বল থাকিবে, ভারতের গৃহ-বিচ্ছেদ দূর হইবে, সুখ, শান্তি, বিদ্যা সদ্ভাব, একতা, ভারতের অঙ্গাভরণ হইবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

তুমি কে।

মানব! তুমি বিচিত্র বিশ্বশোভা দেখিয়া মোহিত হইয়াছ। জগন্মোহিনীর মায়া-মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া আত্ম-বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছ। কোথায় ও কোথা হইতে

আসিয়াছ—কি জন্য দেহ পরিগ্রহ করিলে, তোমার ও এই পরিদৃশ্যমান জগতের পরিণাম কি রূপ, তাহা একবারও ভাবিলে না, ভাবিলেও সিদ্ধান্ত স্থলে পৌঁছিবে কি না তাহা কে জানে ? নিয়ত আত্ম ও পর-ভেদে বিব্রত রহিয়াছ, কিন্তু আত্ম-ভাবনায় ভাবিলে না তুমি কে। তুমি কাহারও ভ্রাতা, কাহারও পুত্র, কাহারও শিষ্য, কাহারও বন্ধু বলিয়া নিশ্চিন্ত আছ, কাহারও পিতা, কাহারও পতি, কাহারও গুরু বলিয়া অভিমান করিতেছ, কখনও ধনী, কখনও জ্ঞানী, কখনও মানী মনে করিয়া উন্মত্ত, কখনও শোকে, কখনও তাপে কখনও রোগে ক্ষুণ্ণ, কখন নিন্দায় ক্ষুব্ধ, তাড়নায় স্তব্ধ ও স্তবে উল্লাসযুক্ত হইয়া বিবিধ বিকারগ্রস্ত হইতেছ, কিন্তু একবারও ভাবিলে না, তুমি কে। তুমি কখনও আপনাকে দেহী, কখনও বালক, কখনও যুবা কখনও বৃদ্ধ বলিয়া মনে করিতেছ, কখনও আপনাকে স্ত্রী পুরুষ, বা ক্লীবের অন্যতর স্থির করিতেছ, কখনও

শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, বা ব্রাহ্মণ-বর্ণে আপনাকে বরণ করিতেছ, কখনও ভোগী, কখনও ত্যাগী, কখনও যোগী মনে করিয়া আপনাকে অবস্থা বিশেষের অধীন করিয়া রাখিতেছ, কিন্তু এক বারও ভাবিলে না স্বরূপতঃ তুমি কে। তুমি কখনও আপনাকে দরিদ্র বোধে অশ্রুবিসর্জ্জন, কখনও বিপন্নবোধে উদ্ধার প্রার্থনা, কখনও পরাধীন জ্ঞানে দুঃখ প্রকাশ, কখনও বদ্ধ জানিয়া মুক্তির ইচ্ছা করিতেছ, কখনও আপনাকে বীরাগ্রগণ্য কখনও ধীমান্, ধীর ও ধন্য, কখনও শৈব, শাক্ত বা বৈষ্ণব হইয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য মনে করিতেছ, কিন্তু একবারও ভাল করিয়া ভাবিলে না, বস্তুতঃ তুমি কে। তুমি কন্দর্পবাণে অভিভূত হইয়া রমণী সম্ভোগে উদ্যত, ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া পরপীড়নে সমুত্তেজিত, লোভগ্রস্ত হইয়া পরদ্রব্যাপহরণে অগ্রসর হইতেছ, মোহ-তিমিরে অন্ধ হইয়া কাহাকেও আপনার, কাহাকেও পর, বিষয়-মদে মত্ত হইয়া ত্রিজগৎ তৃণবৎ তুচ্ছ, এবং পরস্ত্রীদর্শনে

কাতর হইয়া উদ্বেলিতচিত্তে ক্লেশ পাইতেছ। কিন্তু দিব্য জ্ঞানে পদার্থ বিচার করিয়া দেখিলে না এতাবৎ কি, ও আপনিও ভাবিলে না তুমি কে। তুমি সামান্য বুদ্ধিতে কেন অহঙ্কার করিতেছ ? যাঁহার সমক্ষে পৃথিবী একটী ধূলিকণা, সূর্য্যমণ্ডল একটি ক্ষুদ্র বর্ত্তুল, অগাধ সলিল রাশি গোষ্পদ জল, সেখানে কি তোমার ক্ষুদ্র দেহ, ক্ষুদ্র প্রাণ গণনীয় হইতে পারে ? সেখানে কি তোমার সত্তা দৃষ্টি গোচর হয় ? তুমি তাঁহার ধূলিকণার একটী সূক্ষ্ম পরমাণুর কিয়দংশ বই নও, সেখানে আবার তোমার অহঙ্কার কিসের ? তাঁহার দিগ্দিগন্তব্যাপী অনন্ত জ্বলন্ত চক্ষের সমক্ষে তুমি কে ? অহং মমেতি বৃথাভিমান পরিত্যাগ কর, জড় ও চৈতন্যের সত্তা পৃথক্ ভাবে অনুভব করিতে শিক্ষা কর, সদ্গুরূপদেশরাশি বিনীত মস্তকে ধারণা কর, অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষাদি নিষেধ করিয়া নির্ম্মল ভাবে দর্শন কর, তুমি কে। তুমি সংসাররূপ দীর্ঘদুঃস্বপ্ন-

দর্শনে ভীত হইয়াছ, মায়ার মোহন রূপে বিমোহিত হইয়াছ, সত্ব, রজ ও তমোরূপ তিন স্থূল আবরণে নেত্র আচ্ছাদন করিয়াছ, সূক্ষ্মরূপ পরিহার পূর্ব্বক স্থূল দেহ পরিগ্রহ করিয়াছ, এক্ষণে আর আপনাকে আপনি চিনিতে পারিতেছ না। এখনও সময় অতীত হয় নাই, এই বেলা আত্ম-তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া চিনিয়া লও, তুমি কে। সাধুগণকে জিজ্ঞাসা কর, শাস্ত্রানুমোদিত সত্য অন্বেষণ কর, বাহ্য ব্যাপার বিস্মৃত হইয়া গভীর যোগ-সাগরে অবগাহন কর, রাগ দ্বেষাদিকে পরিত্যাগ করিয়া শান্তি-পুরে পলায়ন কর, তথাকার নিত্যানন্দ-নিকেতনের পুরোদ্বারে সুশোভিত অখণ্ড নির্ম্মল দর্পণে (বিশুদ্ধ সত্তা) অবলোকন কর, বুঝিতে পারিবে, তুমি কে। আপনাকে না জানিয়া তুমি কাহার সুখের জন্য ধর্ম্ম-সাধন করিবে? কাহার বন্ধন-মোচনের জন্য জ্ঞানোপার্জ্জন করিবে? প্রথমে বিচার করিয়া তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া দেখ, তোমার দুঃখ বা বন্ধন আছে কি না;

মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া এই মায়ারচিত দুঃস্বপ্ন-দর্শনে " আমি জাত " " আমি মৃত " " আমি যুবা " " আমি বৃদ্ধ " " আমি দুঃখী " " আমি বদ্ধ " ইত্যাদি বোধে বৃথা রোদন করিও না, একবার জাগ্রত হইয়া দেখ তুমি কোন্ অবস্থায় আছ, এবং স্বরূপতঃ তুমি কে। নিজ নাভি-সৌরভ-মুগ্ধ মৃগের ন্যায় স্বাত্মানন্দের উদ্দেশে দেশে২, পর্য্যটন করিও না, সর্ব্বত্রই আত্মসত্তা বর্ত্তমান, অভিনিবিষ্ট চিত্তে গুরুমন্ত্রে আত্মযোগ সাধনা কর, বন্ধন, মুক্তি তোমার উপহাসের কথা বোধ হইবে, আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে, সুখের পরিসীমা থাকিবে না। হে মানব! তাই বারম্বার বলি, জানিয়া লও তুমি কে। সুযোগ সহযোগে যখন আত্মময় জগৎ দেখিবে, তখন সকলকে আহ্বান করিয়া পরিচয় দিও তুমি কে। তখন আর কাহারও সংশয় থাকিবে না ভেদ বুদ্ধি তিরোহিত হইবে, জগৎ আনন্দালোকাকীর্ণ হইয়া

যাইবে। যে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাকে এই মাত্র বলিয়া দিবে যে দেখিয়া লও " তুমি কে।"

জীবের নিদ্রাভঙ্গ।

জন্মাবধি আমি সংসার-সুখে আসক্ত। কেননা সংসার ভিন্ন আর কোন সুখদ সামগ্রী আমি কখন দর্শন করি নাই। এই সুখের সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই নিদারুণ বার্ত্তা স্মরণ করিলেও মন চিন্তাকুল ও ভয়বিহ্বল হইয়া উঠে। সংসারের বিচিত্র মোহিনী মূর্ত্তি, ভোগ-বিলাসের রমণীয়তা শৈশব হইতেই আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে। আমি সংসারের দাস হইয়া সংসারের অনুগত থাকিয়া আপনার জীবনকে সুখী মনে করি। আমার প্রাণ হইতেও সংসারকে আমি অধিক প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকি। যখন মনে হয় যে এই বিস্তৃত গৃহ অট্টালিকা উদ্যানাদি ভূ-সম্পত্তির আমিই এক মাত্র অধিপতি, তখন আমার

হৃদয়ে আত্মগৌরব আর ধরে না ; যখন ভাবি যে এই পরম রূপবতী যুবতী আমার সহধর্ম্মচারিণী হইয়া জীবন যৌবন আমারই সুখ সম্বর্দ্ধনে ও পরিচর্য্যায় উৎসর্গ করিয়াছেন, যখন দেখি অপত্যগণ বেশভূষা ও ভোজনাদির জন্য একমাত্র আমারই মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, যখন অবলোকন করি যে ভৃত্য ও পরিচারিকাগণ বিনীত ও সতর্ক ভাবে আমার আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতেছে, যখন দেখি রথ, গজ, বাজি-রাজি আমারই জন্য দ্বারদেশে সুসজ্জিত, তখন আমার নয়ন হইতে অবিরল ধারায় আনন্দাশ্রু বহিতে থাকে। যখন আমার বিদ্যা ও যশঃ-কুসুমের সৌরভে দশদিক্ আমোদিত হইয়াছে জানিতে পারিলাম, যখন আমার সাধারণ জন-সমাজে অনুষ্ঠিত কার্য্য-কলাপ রাজ-দ্বারে সম্মানিত হইতে লাগিল, যখন শত২ লোকের মুখে আমার প্রশংসা-ধ্বনি নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, সে দিন আমি সুখের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিলাম। সংসার

আমাকে এই রূপে নানা সম্পদ্-সুবাসিত কুসুম-শয্যায় শোয়াইয়া সমাদর পূর্ব্বক সুখনিদ্রায় অভিভূত করিয়া দিল। আমি মনের অনুরাগে, কল্পনার বেগে কতই আশ্চর্য্য ২ স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, হৃদয়ে যেন সুধাবৃষ্টি হইতেছিল; কিন্তু হা! অকস্মাৎ আমাকে কে ডাকিল! আমার সুখের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। এখন বিষয়-সম্পদের কোমল শয্যা যেন কণ্টকাকীর্ণ বোধ হইতেছে; সুখময় সংসার যেন বিষম বিষধরবৎ আমাকে দংশন করিতেছে; ভোগ বিলাস বিকট বেশে আমাকে ভয় প্রদর্শন ও তাড়না করিতেছে। চিরদিনের আনন্দ-ক্ষেত্রকে যেন আজ উষর ভূমি বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। আজ সম্মানকে পূতিগন্ধের সমান, আত্ম-গৌরবকে ঘোর রৌরব মহানরক তুল্য ও প্রতিষ্ঠাকে শূকরী বিষ্ঠাসদৃশ বলিয়া ঘৃণা বোধ হইতেছে। আজ বাস-ভবন কারাগার ও স্ত্রী পুত্রাদি তাবৎ সামগ্রী একত্র সমবেত হইয়া যেন আমার বন্ধন-শৃঙ্খল রচনা করিয়াছে এই

রূপ অনুমান হইতেছে। হায়! আমার সুখ-স্বপ্ন-সমাকুল নিদ্রা কে অকস্মাৎ ভঙ্গ করিল, কাহার পাষাণ-ভেদিনী সুমধুর বাণী আমার কঠোর হৃদয়ের মর্ম্মদেশে প্রবেশ করিয়া আমাকে জাগ্রত করিল!

অপূর্ব্ব রূপ-মাধুরী দর্শনে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল। হায়! চৈতন্য দান করিয়াই আবার তিনি কোথায় লুকাইলেন আর দেখিতে পাইলাম না! মন তাঁহারই জন্য পাগল হইল। তাঁহাকে না দেখিলে আর থাকিতে পারিতেছি না। সে রূপের আদর্শ নাই, সে মধুর বাণীর উপমা নাই; তিনি বিদ্যুদ্বৎ প্রকাশিত হইয়াই আমাকে সচেতন করিয়া কোন্ লীলা-পটের অন্তরালে লুকাইলেন, আর তাঁহার তত্ত্ব পাইতেছি না। সংসার আমাকে বারম্বার বলিতেছে যে উহা তোমার অমূলক চিন্তা—তোমার কল্পনা মাত্র—উহা স্বপ্নো-চ্ছাসের একটী চঞ্চল তরঙ্গ। কিন্তু এই প্রবোধ বাক্যে আমার মন মানিতেছে না, আর মানিবেও না। আমার

মন সেই মোহন মূর্ত্তির আশ্চর্য্য মাধুরী দর্শনে বিমোহিত হইয়া গিয়াছে; আমার প্রাণ তাঁহার দর্শনার্থ আপনাকে উৎসর্গ করিয়া বসিয়াছে; আত্মা তাঁহাকে ছাড়িয়া আর এ দেহে থাকিতে চাহে না। হায়! এক্ষণে কোথায় গেলে তাঁহার দর্শন পাইব! কে আমাকে তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব বলিয়া দিয়া চিরদিনের মত কৃতার্থ করিবে!!

সংসার! তুমি আর আমাকে তোমার অপবিত্র হস্তে স্পর্শ করিও না। যিনি আমাকে ডাকিয়া জাগ্রত করিয়াছেন, আমি তাঁহার নিকট যাইব। তাঁহার অমৃত-নিঃস্যন্দিনী বাণী স্মরণে আমার এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, আর তোমার মায়া-বিস্তারিত বিষয়-শয্যা সুখকর বোধ হইতেছে না। আমি চলিলাম। সংসার! তোমার নিকট চিরদিনের মত বিদায় লইলাম। আমি সেই মন-বিমোহন মহাপুরুষের স্বর লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলাম।

যাঁহারা কেবল তাঁহারই কথা কহিবেন, আজ হইতে

তাঁহাদেরই কথা শুনিব, যে পুস্তকে কেবল তাঁহারই গুণানুবাদ ও নিগূঢ় তত্ত্ব লিখিত থাকিবে, তাহাই পাঠ করিব, যেখানে জাগ্রত পুরুষ বর্গ তাঁহার সহিত সদা- লাপ করিতেছেন, সেই স্থানেই গমন করিব, যেখানে তাঁহার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শনার্থ কোন পবিত্র অনুষ্ঠান হইতেছে, সেই খানে বিশ্রাম করিব, যাঁহারা লোক- লজ্জা তুচ্ছ করিয়া গম্ভীর সাহসে উচ্চ নিনাদে তাঁহার সমাচার প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদের শরণাগত হইয়া সেই প্রিয়তমের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিব। আমি কখনও ধ্যানে বসিয়া তাঁহাকে মনন করিব, কখন বা পর্ব্বত কন্দরবাসি ঋষিগণের নিকট গিরি গাম্ভীর্য্য সহ তাঁহার আশ্চর্য্য মহিমা অনুধ্যান পূর্ব্বক অগাধ গম্ভীর সত্বায় ডুবিয়া যাইব, কখন কখন বন কুসুম রাজিতে তাঁহার প্রসন্ন বদন বিলোকন করিব, কখন গিরি নিঃসৃত নির্ঝরিণীর নদী তীরে উপবিষ্ট হইয়া চন্দ্র কিরণমিশ্রিত লহরী-মালার মধ্যে তাঁহার মধুর হাস্য দর্শন করিব,

কখন মহাঘোর মেঘ মণ্ডলের সঙ্গে ২ বজ্র গর্জ্জনে তাঁহার প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও মহিমা দেখিব, কখ পাঁক কোকিল কুজনাদির মধ্য হইতে তাঁহার স্তু পাঠ শুনিয়া শ্রবণ শীতল করিব, কখন সমুদ্রের নী নীর নিনাদে তাঁহার ত্রিভূবন শাসন বাক্য আক করিব. কখন বা তাঁহার ভাবে উন্মত্ত হইয়া নৃ করিতে থাকিব।

সংসার! আর তোমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাইব ন যে দেশে সন্ধ্যা নাই, শর্ব্বরী নাই, যেখানে নিদ্রা ন স্বপ্ন নাই, যেখানে তাপ নাই, বিক্ষেপ নাই, য সেই দেশের লোক পাইয়াছি। আমার নিদ্রা হইয়াছে। যাঁহার মধুর স্বর ও যাঁহার অপ্রার্থিত আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিল, হা! সেই প্রিয় সখা এ কোথায়! আমি তাঁহারই শরণাপন্ন হইলাম।

প্রাণ সখে! যদি দয়া করিয়া নিদ্রা ভঙ্গ করি তবে হস্ত ধারণ করিয়া তোমার অমৃত ধামে ন

চল। তুমি দয়া করিয়া দেখা না দিলে কেহই তোঁমাকে দেখিতে পায় না। শুনিয়াছি তুমি নাকি ভক্তের প্রিত দয়া করিয়া তাহার সহচর হইয়া থাক। তুমি সাধুদিগের সর্ব্বস্ব ধন। তোমার মহিমা অপার! দীনবন্ধো! দুঃখী দেখিলে তুমি দয়া করিয়া থাক, দেশে দেশে সাধুদিগের নিকট এই সংবাদ শুনিয়া আজ তোমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। অভয় পদে স্থান দান কর। হে হরে! তোমার পাষাণ ভেদী স্বরে সংসার স্বপ্ন সংকূল মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। এক্ষণে অন্তর্যাগে জাগ্রত থাকিয়া তোমার পরম পদ পীযুষ পান করিব। হে অভীষ্ট ফল দাতা। আমার আশা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তি, হরি ওঁ।

"আমার"।

কি দৈব লগ্নে যে "আমার" এই কুহকময় শব্দটী সংসার মধ্যে স্ফুরিত হইয়াছে, তাহা দেব দানব মানব

কাহারই বুদ্ধি স্থির করিতে পারে না । যেমন পৌরাণিক "অনন্তদেব" শীতশীর্ষে পৃথিবীর ভার রক্ষা করিতেছেন, তদ্রূপ "আমার" এই শব্দটীর উপর পৃথিবীর তাবদ্ব্যাপার, তাবৎ কার্য্যের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। "আমার" এইশব্দে যে কি মোহণ গুণ আছে, কি আশ্চর্য্য কুহকময়ী মাধুরী যে ইহা হইতে বিনির্গত হইতেছে, তাহা কেহই উপলব্ধি করিতে পারে না। "তোমার" শিশু অতিরূপ বান হইলেও "আমার" চিত্ত সহসা আনন্দিত হয় না, কিন্তু "আমার" পুত্র যদি কদাকারও হয় তবে বারম্বার দেখিয়াও নয়নের পরিতৃপ্তি জন্মে না। যে কার্য্যটী "তোমার" জন্য সাধিত হইবে, তাহা সামান্য হইলেও অতিশ্রম সাধ্য ও ক্লেশকর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তদপেক্ষা শতগুণ ক্লেশ সাধ্য কার্য্য "আমার" এরূপ বোধ হইলে প্রাণপণে সংসাধন করিলেও বিশেষ ক্লেশ বোধ হয় না। কোন দ্রব্য

"তোমার" অধিকারে থাকিলে যদি তাহার অপচয় হয়, তবে কিছু মাত্র দুঃখ নাই, কিন্তু যখন সেই দ্রব্য "আমার" বলিবার অধিকার পাই, তখন যত্ন ও আদরের সীমা থাকে না। আজ যাহা "তোমার" বলিয়া তাহার নিন্দা ঘোষণা করিয়া থাকি, পরদিন তাহাই আবার "আমার" হইলে মুখে আর প্রশংসা ধরিবে না। "তোমার" গুণ, "তোমার" বিদ্যা, "তোমার" যশ অল্পক্ষণ শুনিতেও মনে বড় ক্লেশ হয় কিন্তু তাহা "আমার" হইলে চিরদিন অবিচ্ছেদে শুনিলেও অক্লান্ত চিত্ত কাতর হয় না। তোমার হস্তে একটী স্বর্ণাঙ্গুরীও আমার দুঃসহ বোধ হয়, কিন্তু "আমার" হইলে নাসা-কণ্ঠ আদি ছেদ করিয়াও গুরুভার স্বর্ণরাশি আনন্দসহ বহন করিতে পারি। মনুষ্য যদি কোন ৫ হস্ত পরিমিত ভূমিকে "আমার" বলিতে না পায়, তবে তাহার উৎকর্ষাপকর্ষ জন্য দায়ী হইতে বিরক্ত হয় কিন্তু আবার সমস্ত পৃথি-

বীকে যদি "আমার" বলিবার অধিকার পায়, তবে কায়মনোবাক্যে প্রাণপণে সুবিস্তীর্ণ ভূভাগেরও উন্নতি জন্য চেষ্টা ও যত্ন করে।

"আমার" এই অদ্ভুত শব্দ জন্ম গ্রহণ করিয়াই মাতাপিতাকে গ্রাস করে; দেখিতে দেখিতে ভাই ভগ্নি গুলিকে গ্রাস করে; অবসর পাইলেই স্ত্রীপুত্র কলত্র বর্গকে গ্রাস করে, আবার গৃহ, উদ্যান, ঘাট, পথ বাজারও গ্রাস করিতে ক্রটী করে না, ক্রমে অন্যের ধন সম্পত্তি রাজ্য আদি সমস্ত গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হয়, ত্রিভুবন গ্রাস করিলেও "আমার" উদর পূর্ত্তি হয় না। এই মায়া রাক্ষস রূপ ধারী "আমার" শব্দটী কীট হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্তকে কুহক জালে বিমোহিত করিয়াছে। ইহার বিকটমূর্ত্তি কাহারই নয়নগোচর হয় না। যদি কাহারও ভাগ্য বলে নয়ন মল পরিষ্কৃত হয়, তবে তিনিই কেবল এই "আমার" শব্দের ভয়ঙ্কর মায়া-

রূপ দর্শনে শঙ্কিত হয়েন। তিনি অমনি অভিভূত চিত্তে কাহাকেও কিছু না বলিয়া ঘোর গহন বিপিন মধ্যবাসী বা দুর্গম গিরিকন্দর স্থিত ধ্যানস্তিমিত নেত্র দনুজদর্পহারীর শরণাগত মহাত্মাগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। "আমার" এইশব্দ তাঁহাদের বিষয় বিমুক্ত হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না। তবে আমার হৃদয়ে "আমার" এইশব্দ এত প্রীতি-কর কেন! আমার হৃদয় "আমার" শব্দের কুহকে বিমুগ্ধ হইয়াছে। হা! যাহাকে আমি "আমার" বলি সে "আমার" হইল না আমি যে বস্তুকে "আমার বোধে যত্ন করি তাহাই কালের গুপ্ত গৃহের জন্য সঞ্চয় হইতে থাকে মাত্র। "আমার" বুদ্ধিই আমার সর্ব্বনাশ করিল। বাস্তবিক কি তবে "আমার" কেহই নাই? বুঝিলাম "আমার" বলিতে যিনি আছেন, আমি "তাঁহার" হইতে চাহিনা বলিয়া তিনি "আমার" নহেন। "আমার" কুহকে

পড়িয়া আমি আমার বস্তুকে চিনিতে পারিলাম না। শাস্ত্রে বলে সকলই "তাঁহার" আমি ভাবি এ সকল "আমার"। যদি এই সামান্য সুখ দুঃখ ধন পুত্র কায়াদি "আমার" বলিতে এত আনন্দোদয় হয়, তবে যদি একবার সরল চিত্তে বিশুদ্ধ অন্তকরণে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার তাঁহাকে "আমার" বলিতে পারি, নাজানি তাহা হইলে কি অপূর্ব্ব আনন্দেরই অভ্যুদয় হয়।

দুর্লভ কি।

যাহা অনায়াসে লাভ করা যায় না, তাহাই পাইবার জন্য লোকের অত্যন্ত আগ্রহ ও চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে যাহা পায় না, তাহাই পাইতে চায়, যাহা দেখে নাই তাহাই দেখিবার জন্য ব্যস্ত, যাহা কখনও শ্রবণ করে নাই, তাহাই শুনিতে একান্ত অভিলাষী। মন যাহা

পাইয়াছে তাহাতে পরিতৃপ্ত নহে, মনের গতি অব্যাহত। মন তৃষ্ণায় অধীর হইয়া কখন পাতাল পুরে প্রবেশ পূর্ব্বক তথাকার রত্ন মালা সংগ্রহ করিতে চায়, কখন নীল নভোমার্গে উড্ডীন হইয়া নক্ষত্রে ২ ভ্রমণ করিতে চায়, কখন বা চুমুক দিয়া চন্দ্রের সুধা রাশি পান করিতে চায়, কখন সূর্য্য মণ্ডলকে দীপ করিয়া অলক্ষিত জগতের তত্ত্ব নিরীক্ষণ করিতে যায়, কখন ধূমকেতু ধরিয়া পৃথিবী পরি মার্জ্জিত করিতে চায়, কখন বা রাহুকেই গ্রাস করিয়া চন্দ্র, সূর্য্যকে নিরূপদ্রব করিতে যায়, কখনও বা সূর্য্যকে কিরীটে বসাইয়া চন্দ্রের তিলক করিয়া ও নক্ষত্রের মালা পরিয়া পৃথিবীতে আসিতে চায়, কখন বা বনে কখন বা পর্ব্বতে কখন নদী তটে, এইরূপ নানা দিগ্দিগন্তে ধাবিত হইয়া কোথায় কি দুর্ল্লভ আছে, তাহাই লাভ করিতে চায়। যাহা দুর্ল্লভ তাহা পাইলে জীবের আনন্দের সীমা থাকেনা। দুর্ল্লভ হইলেই

যে দ্রব্যের অধিক মর্য্যাদা হইবে, তাহা নহে, অনাবশ্যক পদার্থ অলভ্য হইলেও তাহার মূল্য নাই। অবস্থা বিশেষে, সময় বিশেষে, স্থান বিশেষে অনেক দ্রব্যই দুর্ল্লভ হয়, কিন্তু সর্ব্বথা দুর্লভ কি, আজ তাহাই বিচার্য্য। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন।

"জন্তূনাং নরজন্ম দুর্লভমতঃ পুংস্ত্বং ততো বিপ্রতা।
তস্মাদ্বৈদিক ধর্ম্ম মার্গপরতা বিদ্বত্ত্বমস্মাৎ পরং।
আত্মানাত্ম বিবেচনং স্বনুভবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতি
মুক্তির্নোশত জন্ম কোটি সুকৃতৈঃ পুণ্যৈর্ব্বিনা লভ্যতে ॥"

জীব গণ বহু চেষ্টা, যত্ন ও ক্লেশ করিয়া যতই দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পাদন করুক না, মনুষ্য জন্ম লাভ করিতে হইলে তৎ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তর প্রযত্ন করিতে হয়। সংসারের অনেক কার্য্য সাধন করিবার সময় কেবল কায়িক পরিশ্রম, মানসিক আগ্রহ ও

আবশ্যকমত উপায় সকল অবলম্বন করিতে হয় মাত্র কিন্তু মনুষ্য দেহ লাভ করা অতিশয় যত্ন, প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও অটল সংকল্প সাপেক্ষ। একটী দৈহিক প্রকৃতি পরিত্যাগ করা ও তৎপরে প্রকৃতির মনুষ্যোচিত বৃত্তির দিকে একান্ত আগ্রহ পূর্ব্বক প্রধাবিত হওয়া স্বল্পায়াস সাধ্য নহে। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মনের ঐকান্তিকী ইচ্ছা যাদৃশ বিষয় ও ব্যাপার আশ্রয় করিয়া থাকে, মরণান্তে জীব তাদৃশ প্রকৃতিতে উপগত হয়। কীট, পতঙ্গ, পক্ষী পশ্বাদি দেহ হইতে প্রকৃতি স্ফুরণ পূর্ব্বক নরাকৃতি লাভ অত্যন্ত দুর্ল্লভ ও সুকঠিন।

নৃশরীর ধারী জীবগণ ক্লীব, স্ত্রী ও পুরুষ এই তিন ভাগে বিভক্ত। নরাকর লাভ পূর্ব্বক পুরুষ দেহ ধারণ করা কঠোর ব্রত সংযম তপস্যাদির ফল। যাঁহারা স্ত্রী পুরুষ এতদুভয় জাতিকে স্বাভাবিক সকল বিষয়ে সমান অধিকারী মনে করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ বুদ্ধি বিজৃম্ভিত নহে। স্ত্রী জাতি স্বাভাবিক বৃত্তি ভেদে

পুরুষ অপেক্ষা অনেক নীচ। নারীর কোমল প্রকৃতি জগতের কল্যাণ সাধন করিতে করিতে পুরুষ প্রকৃতির দিকে ধাবিত হয় এবং ধীরে ধীরে পূর্ব্ব প্রকৃতি জনিত স্ত্রী দেহ বিনষ্ট হইয়া পুরুষ ভাবের আবির্ভাব ও পুং দেহের সঞ্চার হইতে থাকেই। ক্লীবজাতি মানবীয় বৃত্তি নিচয়ের অস্ফুটাবস্থার জীব। সেই প্রকৃতি উন্নতাকারে পরিণত হইলে স্ত্রীত্ব ও স্ত্রীত্বের চরমোন্নতি হইলে পুরুষত্ব লাভ হইয়া থাকে; সুতরাং প্রকৃতি পুরুষ-প্রকৃতি লাভ নিতান্তই দুর্লভ বলিতে হইবে।

পুরুষ মাত্রেই যে সফল জন্মা মনুষ্য তাহা বলা যায়না, কেন না তন্মধ্যে অনেক পুরুষ পূর্ব্ব সংস্কার জনিত বৃথা কার্য্য কলাপে লিপ্ত হইয়া পুরুষোচিত কার্য্যে পরাঙ্মুখ থাকেন, এবং সামান্য নীচ কুলে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক আহার নিদ্রা ও বিবিধ ব্যসনেআসক্ত হইয়া মানবসমাজকে কলঙ্কিত করেন। মনুষ্য দেহ ধারী দিগের মধ্যে বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ হওয়া আরও সুকঠিন।

অর্থোপার্জ্জনের জন্য শিল্প চাতুর্য্যাদি শিক্ষা ও সভা-বিজয়ী হইয়া মর্য্যাদা পাইবার আশয়ে শাস্ত্রাদি অভ্যাস করিতে প্রায়ই লোকের আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আত্ম শুদ্ধির জন্য পরমার্থ বিদ্যাবাসে কয় জন মনুষ্যের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ? হইলেও অনেকে বেদ শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া থাকেন বটে কিন্তু আচার্য্যের নিকট হইতে তাহার অর্থোপলব্ধি করিয়া লয়েন না, সাধারণ ভাবে ভাষাগত অর্থ বুঝিলেও তাহার গম্ভীর তাৎপর্য্য বুঝিতে সকলে সমর্থ হয়েন না। বেদ বাক্য উচ্চারণ মাত্রেই শরীর মন আত্মা পবিত্র হইয়া থাকে, এই দৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে বেদের অর্থ বোধের আবশ্যকতাও অনুভব করেন না। বেদের প্রকৃত অর্থ বোধ আজ কাল দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে, কেন না, বর্ত্তমান সময়ে অনেকে বেদার্থ জানিবার জন্য প্রণত শিরে পাশ্চাত্য পণ্ডিত গণের শরণাগত হইতেছেন। তাঁহারা ব্যাকরণ ও শব্দ শাস্ত্রের সাহায্য

মাত্র লইয়া বেদের এক এক প্রকার স্বকপোল কল্পিত বিচিত্র ব্যাখ্যা করিয়া বেদের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া দিতেছেন। বেদের ইদৃশ কদর্য্য ব্যাখ্যা শিক্ষা না করিয়া বরং যাঁহারা বেদকে পরম পাবক বোধে তাহা আবৃত্তি মাত্র করিয়া থাকেন, তাঁহারা ধন্য। তাই বলিতেছি, আজ কাল বেদার্থ প্রকৃত রূপে বোধ হওয়া নিতান্ত দুর্ল্লভ। বেদার্থ বিদিত হইলেও তদনুসারিণী কার্য্য প্রবৃত্তি আরও দুর্ল্লভ। বিকারাচ্ছন্ন চিত্ত সহজেই ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে চাহে না, তাহাতে আবার যে বৈদিক কার্য্য কলাপে কঠোর ব্রত নিয়ম, সংযম আদির নিতান্ত প্রয়োজন তাহাতে মন কোন ক্রমেই বাধিত হইতে চাহেনা। দেশকাল পাত্রাদির অবস্থা বিচার করিলে সাধু কার্য্যে প্রবৃত্তি হওয়া নিতান্তই সুকঠিন বলিতে হইবে। যদি বা মানবীয় কর্ত্তব্য বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কেহ বৈদিক ধর্ম্মাচারে প্রবৃত্তও থাকেন, তজ্জনিত জ্ঞানের

উদয় হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠেনা। কর্ম্মানুষ্ঠান কালে শাস্ত্র বিধির যদি কিছু মাত্র ব্যত্যয় হয়, তবে বিশেষ প্রত্যবায় ঘটিবার সম্ভাবনা। ত্রুটি মনুষ্যের পদেপদেই হইয়া থাকে, এজন্য কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল লাভ বা জ্ঞানোদয় হওয়া অতীব দুর্লভ। পুণ্যানুষ্ঠানের দ্বারা মন নির্ম্মল হইলেও আত্মানাত্ম বিচারণা সহজে উদয় হয় না, এই জন্য মহাত্মা গণ ইহাকে অতিশয় দুর্লভ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যদিই বা শাস্ত্রাদি পাঠ, মহাত্মা গণের চরিত্র চিন্তন, ও সৎকার্য্য কলাপ অনুষ্ঠান করিতে করিতে সময়ে সময়ে আত্মানাত্ম বুদ্ধির বিকাশও হয়, কিন্তু আত্মাকে অনুভব করা আরও কঠিন ও সুদুর্লভ। সমস্ত বিষয় ব্যাপার হইতে চিত্ত একান্ত প্রত্যাহৃত না হইলে ও আত্ম মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া একাগ্রতা পূর্ব্বক সমাধি না করিলে আত্মা-নুভব কিছুতেই সম্ভব নহে। এইরূপে নির্ব্বিকল্প সমাধি সাধন দ্বারা চিদ্রূপ পরমাত্মাতে নিত্য সংস্থিতি

রূপ পরামুক্তি লাভ সকল অপেক্ষা দুর্লভ, কেননা উহা শত কোটী জন্ম সদাচার, সৎক্রিয়া ও তপস্যা ভিন্ন কিছুতেই লাভ হইতে পারে না।

দুর্ল্লভং ত্রয়মেবৈতদ্দেবানুগ্রহহেতুকং।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষ সংশ্রয়ঃ" ॥

সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করিবার জন্য জীবের চিত্ত অনিবার্য্য বেগে ধাবিত। আমরা সাধারণতঃ বিষয়ের আস্বাদ করিয়া যাদৃশ সুখ অনুভব করিয়া থাকি, তাহা প্রকৃত সুখ নহে। কেন না বিষয় সুখে সুখী হইয়াও আমরা দরিদ্র, পীড়িত, দণ্ডিত, বিপদ গ্রস্ত ত্রস্ত জীবের অবস্থা দর্শনে মনে মনে দুঃখানুভব করিয়া থাকি। দুঃখের অত্যন্তাভাবই পরম সুখ। যদি অন্যের দুঃখে দুঃখানুভব অথবা অবস্থা বৈগুণ্য নিজেই শোক, রোগ, তাপ, জরা, জন্ম মরণাদি জন্য দুঃখ ভোগ করিলাম, তবে আমার সুখ কোথায়! এই জন্য মহাত্মা গণ বৈষয়িক সুখকে সুখ বলিয়া

[শ]না করেন নাই। সর্ব্বথা দুঃখের অত্যন্তাভাব হইলেই পরম সুখের উদয় হইয়া থাকে। এই সুখেরই নাম শান্তি, ইহারই নাম মুক্তি। ইহাকেই জীব পরমার্থ বোধে সেবা করিয়া থাকে। এই পরমার্থ নিতান্ত প্রার্থনীয় হইলেও, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ না করিতে পারিলে তাহা সহজে কেহ প্রাপ্ত হয় না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে পশ্বাদি দেহ হইতে মনুষ্য দেহ লাভ করিতে হইলে প্রকৃতি পরিবর্ত্তন জন্য অতীব তীব্র চেষ্টা করিতে হয়, কিন্তু পশু হইতে মনুষ্য হওয়া যত কঠিন, মনুষ্য হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করা তদপেক্ষা আরও সুকঠিন। মনুষ্য হইতে দেবতা হওয়া যত কঠিন, মনুষ্য হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করা তদপেক্ষা আরও কঠিন। মনুষ্য দেহ ও তৎপ্রকৃতির একান্ত চিন্তন দ্বারা পশু প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া মনুষ্য দেহ লাভের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু মনুষ্য হইয়া মনুষ্যের প্রকৃতি লাভ করা অতীব দুঃসাধ্য।

শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্য দেবত্ব পাইতে পারে, কিন্তু অনায়াসে প্রকৃত মনুষ্য হইতে পারে না। কেননা সমস্ত ভোগাশা বর্জ্জন করিতে না পারিলে মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটিত হয় না। সকাম শুভকার্য্য সাধন দ্বারা মুক্তির পথ আরও দুর্গম হইয়া উঠে। দেব লোকে ঐশ্বর্য্য ভোগে মত্ত হইয়া ভোগাবসানে মর্ত্ত্য-লোকে আসিবার উপযুক্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং ধীমান পুরুষ কখনও দেবধাম কামনা করেন না। মনুষ্য দেহে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিলেই জীব অনায়াসে মুক্তি পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় সকলের বেগ সম্বরণ, রিপু বর্গের বশীকরণ, অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি সাধন, সর্ব্বভূতে সম দর্শন, অভিমানের পরিহার আদি মনুষ্যত্ব লাভের প্রধান উপাদান। এতাবৎ ঈশ্বরানুগ্রহের অধীন অর্থাৎ (নিজ অহং বুদ্ধিযুক্ত মানবের) আয়ত্তাতীত বলিয়া নিতান্ত দুর্লভ। এই মনুষ্যত্ব উপার্জ্জন কালে নানা বিঘ্ন বিড়ম্বনা আসিয়া উপস্থিত হয়, দৈবানুগ্রহ ভিন্ন তত্তাবৎ বিনষ্ট হয় না।

মনুষ্যত্ব লাভ করিলেও মুক্তির অভিলাষ সহজে অভ্যুদিত হয় না। বিষয় ভোগে ক্লেশানুভব ও বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তিই পরম সুখের সামগ্রী, ইহা যত দিন না উপলব্ধি হয়, তাবৎ জীব মহাজিতেন্দ্রিয় যোগীন্দ্র হইলেও মুক্তি লাভ করিতে পারে না। যোগে অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়া অহং মমেত্যাদি অভিমান বাড়িলেও বাড়িতে পারে, এজন্য অনেক যোগীও মুক্তি ভাজন হইতে পারেন না। বিষয় বিরাগ বা বাসনা ত্যাগই মুক্তির প্রধান উপায়। তিনিই মুমুক্ষু, যিনি পার্থিব বাসনা একেবারে জলাঞ্জলি দিতে সমর্থ। সাধনবলে ঈশ্বরের শুভদৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে না পারিলে সহজে মুক্তির জন্য চিত্ত ধাবিত হয় না। মুক্তীচ্ছা ভগবৎ সাধনা সাপেক্ষ, এই জন্য ইহা পরম দুর্ল্লভ।

মনুষ্য মুমুক্ষু হইলেই যে মুক্তিপদ লাভ করিতে পারিবে তাহা নহে। মহাপুরুষ দিগের সহিত সদা

সঙ্গ না হইলে মুক্তি পথ প্রদর্শন করিবে কে? ইহা স্বকপোল কল্পনায় লব্ধ হইতে পারে না। সৎ পুরুষ সহবাস জীবের সৌভাগ্য সাপেক্ষ। ইচ্ছা করিলেই সাধু দর্শন হয় না। সাধুগণ প্রায়ই নিভৃত স্থানে থাকেন; কখন দৃষ্টি গোচর হইলেও প্রচ্ছন্ন ভাব উদ্ভেদ করিয়া সহজে তাঁহাদিগকে চিনিয়া লওয়া যায় না। চিনিতে পারিলেও সহজে নিকটে রাখিতে চাহেন না, নিকটে বসিবার অধিকার পাইলেও তাঁহাদের নির্ম্মল হৃদয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না।

" মহা পুরুষ সম্পর্কাৎ সংসারার্ণব লঙ্ঘনে।
মুক্তি সংপ্রাপ্যতে রাম যথা নৌরিব নাবিকাৎ॥ "

ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন যে, হে রামচন্দ্র! যেমন নদী পারের জন্য নাবিকের নিকট নৌকা লইতে হয়, তদ্রূপ সংসারার্ণব উত্তীর্ণ হইবার জন্য মহাপুরুষ সংসর্গ করিয়া উপায় লাভ করিতে হয়। অতএব সজ্জন সঙ্গ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কেন না

ইহাতে মুমুক্ষুর সাধু কামনা পূর্ণ হয়। সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে যে ফলোদয় হয়, সজ্জনের সঙ্গ করিলে তদপেক্ষা অধিক ফল হইয়া থাকে। কেন না সৎ পুরুষের নিকট থাকিলে তাঁহার বিশুদ্ধ ও বলবতী প্রকৃতি স্ফুরিত হইয়া আমার মলিন ও দুর্ব্বল প্রকৃতিকে অভিভূত করে ও হৃদয়ে নিজ প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া দেয়। অতএব সাধু সঙ্গই সর্ব্বতোভাবে জীবের প্রার্থনীয়। যত কিছু দুর্লভ বলিয়া উক্ত হইয়াছে সৎসঙ্গ দ্বারা সমস্তই সুলভ হইয়া পড়ে।

উনি কে!

আমার চারিদিকে অন্তরে ও বাহিরে যিনি ঘন ঘোর নিত্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন, যাঁহার কটাক্ষ সঙ্কেত মাত্রে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর হইতেছে, যাঁহার সত্ত্বাপ্রভাবে আমি জীবিত রহিয়াছি, উনি কে!

যিনি চরণশূন্য অথচ সর্ব্বত্র গমন করেন, কর্ণহীন কিন্তু মনের কথা পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন, নেত্রহীন কিন্তু সমস্তই প্রত্যক্ষ করেন, যিনি আমাকে দেখিতেছেন অথচ আমি যাঁহাকে দেখিতে গিয়া দেখিতে পাই না, উনি কে! ঐ যে গুপ্তভাবে সকলের সকল সমাচার লইতেছেন, ঐ যে সকলের অগোচরে কেহ কিছু না চাহিতে কত কি দান করিতেছেন, ঐ যে ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, তৃষ্ণার্ত্তকে জল, পীড়িতকে ঔষধ, ভীতকে অভয় দিবার জন্য শান্তিময় কর প্রসারণ করিয়া রহিয়াছেন, উনি কে! ঐ যে রত্নমণ্ডিত উষ্ণীষ ধারী অহঙ্কার দম্ভ, অভিমানাদি স্বগণ সহ যাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়া দর্শন না পাওয়ায় অবমানিত হইয়া অবনত মুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে, ঐ যে কাম ক্রোধ লোভাদি প্রতারক গণ যাঁহার সমাগম ভয়ে ভীত হইয়া দেশ ত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছে ঐ যে দুরাশা, বিষয়তৃষ্ণা, ভ্রান্তি, বেদনা, দুর্ব্বুদ্ধি,

আসক্তি প্রভৃতি বারবিলাসিনী গণ যাঁহার আদেশে রাজধানী হইতে বহিস্কৃত হইতেছে, সৌম্যমূর্ত্তি উনি কে! বুদ্ধি যাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া, জ্ঞান যাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া অপারগ হইল, ভাব যাঁহাকে ধারণ করিতে গিয়া, কল্পনা যাঁহার পরিমাণ করিতে গিয়া পারিল না, মন যাঁহাকে দেখিতে গিয়া, আত্মা যাঁহার নিকটে গিয়া আর ফিরিল না, উনি কে! লোকে যাঁহাকে দেশে দেশে অন্বেষণ করিয়া, ক্রিয়াকাণ্ডে যত্ন করিয়া, প্রকাণ্ড২ সম্প্রদায় সংগঠন করিয়া প্রাপ্ত হইল না, মায়া যাঁহাকে আবরণ করিতে, গুণ যাঁহাকে আবদ্ধ করিতে, সংজ্ঞা যাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে গিয়া পরাস্থ হইল এবং বাক্য যাঁহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অবাক্ হইয়া রহিল, উনি কে! যাঁহার আরতি জন্য তারকারত্ন মণ্ডিত গগণ থালে, চন্দ্র সূর্য্য দীপ জ্বলিতেছে, পবন চামর ব্যজন করিতেছে, পুষ্প তরুগণ সুগন্ধী কুসুমরাশি দান করিতেছে, বিহঙ্গ

সকল মঙ্গল গাথা কীর্ত্তন করিতেছে, বজ্র ঘোর শ
নিনাদ করিতেছে, সুর-নর দনুজদল বন্দনা করিতেছে
প্রসন্নবদন উনি কে ! ঐ যে রত্নবেদিতে বসিয়া জীবের
কর্ম্মানুসারে ফল বিধান করিতেছেন, ভক্তি, শ্রদ্ধা
শান্তি, করুণা, মুক্তি আদি যাঁহার পদসেবা করিতেছে—
বৈরাগ্য, নির্ম্মমত্ব নিরহঙ্কার, জ্ঞান, বিচার, যোগ
ধর্ম্মাচার প্রভৃতি সুরবীর দর্প দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সহ যাঁহা
বহির্দ্বারে প্রহরীত্ব করিতেছে, ঐ আনন্দ স্বরূপ, উ
কে! ঐ যে মেঘমালা দ্রুতবেগে যাইতে২ যাঁহা
প্রেমানন দেখিবামাত্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল,
যে চপলা যাঁহাকে দেখিবে বলিয়া চঞ্চলা হইয়া ধাবি
হইতেছে, ঐ যে পাষাণহৃদয় পর্ব্বত যাঁহার প্রে
মুখ নিরীক্ষণ করিয়া প্রেমাশ্রু জলে (নদী প্রবাহে
দেশ বিদেশ ভাসাইয়া দিল, ঐ যে অগ্নিকুণ্ড যাঁহা
ভাবে বিমোহিত হইয়া বাষ্পাকুল নেত্র হইল, উ
কে। ঐ যে কণ্ঠমাবলি যাঁহার দিকে তাকাই

হাঁসিয়া উঠিল; ঐ যে তরুগণ নিশার নিহার পাত ছলে যাঁহার মুখ দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল, ঐ যে বিশ্বশোভা যাঁহাকে দেখাইবার জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছে, উনি কে! যিনি ঐ ভোগবিলাসী ঘোর-সংসারী পুরুষকে আপনার জগন্মোহন ভাবে বিমোহিত করিয়া সর্ব্বত্যাগী করিয়াছেন, যিনি ঐ শুষ্কপর্ণভোজী শীর্ণ শরীর তরুতলবাসী তাপসহৃদয়ে উদয় হইয়া উহার নেত্রদ্বয়কে নিমীলিত করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি ঐ বাহ্যজ্ঞানশূন্য জটাধারী পুরুষের হৃদয়গুহায় প্রকাশিত হইয়া উহাকে কখন হাঁসাইতেছেন, কখন অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইতেছেন, কখন মৌনী করিয়া স্থিরাসনে বসাইতেছেন, কখন বা উচ্চ রবে গান ও নৃত্য করাইতেছেন, প্রেম নিকেতন, উনি কে! ঐ ভবসিন্ধু-কূলে দণ্ডায়মান হইয়া অভয় চরণ তরণীতে বিনামূল্যে পতিত তাপিত জীবনগণকে পার করিবার জন্য কর্ণধার হইয়া প্রেম স্বরে ডাকিতেছেন, ঐ যে দীন দুঃখীগণের

কাতর হৃদয়ের ক্রন্দন শুনিয়া স্বহস্তে তাহাদের অশ্রুমোচন করিয়া দিতেছেন, ঐ যে ব্যাকুলচিত্তগণকে অবিরল ধারায় শান্তি সুধা বিতরণ করিতেছেন, কেহ কি চিনিতে পার, উনি কে। ঐ যে সময়ে ২ ঘোর অজ্ঞান জাল ভেদ করিয়া যাঁহার তেজ মোহ-মলিন মনেও প্রকাশিত হইতেছে, যাঁহাকে জীব বিস্মৃত হইয়া গেলেও যিনি তাহাকে ত্যাগ করেন না, যিনি মায়ানিদ্রাভঙ্গ করিয়া জাগ্রত করিবার জন্য বারম্বার আহ্বান করিতেছেন, দেখ, দেখ, জাগ্রত হইয়া দেখ উনি কে! নিজে নির্গুণ হইয়া গুণত্রয়ে ত্রিজগৎ বাঁধিয়া রাখিয়াছেন—অরূপ হইয়া আশ্চর্য্য রূপে ত্রিভুবন মোহিত করিয়াছেন—চৈতন্য স্বরূপ হইয়া সংসার স্বপ্নদর্শী জীবকে মোহিনী মায়ায় অচেতন রাখিয়াছেন ভোগনিদ্রা ত্যাগ করিয়া যোগ বলে সচেতন হইয়া দেখ, উনি কে! আদি পুরুষ ব্রহ্মা ধ্যানযোগে অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়া বলিলেন উনি কে! বৃত্তাসুর বধে

পর ইন্দ্র, পবন, বরুণ, অগ্নি, যম, পরম তেজোরাশি দেখিয়া বলিলেন উনি কে ! দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষিগণ সমাধিযোগে দেখিলেন, উনি কে ! বেদ বেদাঙ্গ, দর্শন শাস্ত্রাদি বর্ণনা করিতে অসমর্থ হইয়া বলিল উনি কে ! কবিগণ ভাবরাজ্যে বিচরণ করিয়া অবশেষে বলিলেন উনি কে ! দেব দানব মানব সকলেই জিজ্ঞাসা করে উনি কে ! আমিও ভাবি উনি কে ! যদি কেহ জানিয়া থাকেন তবে আমাকে বলিয়া দিন উনি কে ! ধীরে ধীরে দিন গত হইতেছে, জরা ধবল চামর (পক্ক কেশ, শ্মশ্রু আদি) আধিব্যাধি পতাকা উড্ডীন করিয়া, মৃত্যু রাজের আগমন সংবাদ ঘোষণা করিতেছে। তাঁহার আগমন মাত্রেই সমস্ত নষ্ট হইবে। তখন কোন কার্য্যই হইবে না, তাই বলি যদি কেহ সচেতন থাক, তবে এই বেলা চিনিয়া লও, উনি কে ! প্রেম তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়া সকলকে বুঝাইয়া দাও উনি কে ! সমস্ত জগৎকে জাগ্রত করিয়া দেখাইয়া দাও, উনি কে !!!

ফুলটি ফুটিয়াও ফুটিল না।

আমি যখন দিগ্দেশ পর্য্যটন করিয়া পথিমধ্যে একটি গণ্ডগ্রামে একদিনের জন্য বিশ্রাম করিতে ছিলাম, সেই সময়ে আমার নিকট সেখানকার জনৈক ভদ্র লোক তাঁহার উদ্যানের নানাবিধ ফুলের যথোচিত প্রশংসা করিতেছিলেন ও সঙ্গে ২ বলিতে লাগিলেন যে এদেশে এরূপ ফুল আর কাহারও বাগানে ফোটে না। এ কথা কেবল তিনিই বলিলেন তাহা নহে, আমার পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য অনেক ভদ্র লোকে তাঁহার এই কথার পোষকতা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ফুল বাগানের প্রশংসা গ্রামময় শুনিলাম। গোলাব ফুলের প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে আমার বাগানে সহস্রদল কমলের ন্যায় সুবিশাল সহস্রদল গোলাব ফুটিয়া থাকে, তাহার সৌরভে দিক্ আমোদিত হয়, দেখিলে নয়ন জুড়াইয়া যায়, মন নাচিয়া উঠে, প্রাণ সুশীতল হয়। আমি একটু বিস্ময় প্রকাশ করায় তিনি সেই গোলাবের

কলমের একটি চারা আমাকে টবে করিয়া উপহার দিলেন এবং বলিলেন যেন তরুটির মূলে একটু আল্গা মাটি থাকে, স্থানটি যেন একটু শীতল হয় ও যথা নিয়মে যেন মূলে সেচন করা হয়; দেখিবেন গোলাব ফুটিলে শোভা হইবে কত, গন্ধ ছুটিলে উহা মনো-লোভা হইবে কত, ও দেখিলে হৃদয়ে আনন্দ হইবে কেমন। আমি আহ্লাদ সহ গোলাব শিশুকে গ্রহণ করিলাম ও যত্ন পূর্ব্বক ৺ কাশী ধামে লইয়া আসিলাম। তরু মূলে নিত্য জল সিঞ্চিত হইতে লাগিল, ।২।৪ দিন বোধ হয় যেন তরুটি দিব্য স্ফূর্ত্তি যুক্ত হইয়া গজাইয়া উঠিতেছে, নূতন২ পত্র পল্লব বাহির হইয়া আসিতেছে। আবার ২।৪ দিন দেখি কোন শাখা শুকাইয়া যাইতেছে, পাতা গুলি ঝরিয়া পড়িতেছে। তরু শিশুর কখন হাসি কখন কান্না দেখিয়া তাহার দীর্ঘ জীবনের প্রতি সংশয় জন্মিল, এবং তরুর এই বিচিত্র হর্ষ বিষাদের হেতু অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, এবং পরিশেষে

বুঝিলাম যে, যে ভৃত্য তরু মূলে জল সেচন করে, সে মধ্যে ২ কূপজল ও কোন ২ দিন গঙ্গা জল দিয়া থাকে। যে দুই চারি দিন পাদপ শিশু গঙ্গাজল পান করিতে পায়, সে কয়েক দিন তাহার শাখা প্রশাখা পল্লব পত্র সতেজে বাহির হইতে থাকে, তরুটি কেমন নধর দেখায়, আবার যে কয়েক দিন কূপজল, (কিঞ্চিৎ লবণাক্ত) পান করে, সেই কয়েক দিনই গাছটি মলিন হইয়া পড়ে, শুকাইতে থাকে, মৃতকল্প হইয়া যায়। তাহার পর টবে আর কূপজল কেহ না দেয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। ক্রমে গাছটি যেন বহুদিন ব্যাপী ব্যাধি বিমুক্তের ন্যায় হৃষ্ট পুষ্ট ও দীর্ঘায়তন বিশিষ্ট হইয়া উঠিল। দেখিয়া ভাবিলাম এখন আর এ গাছটিকে ক্ষুদ্র টবে (গামলায়) রাখা ভাল দেখায় না। ভূমিতে রোপণ করিয়া দিই। নরম মাটিতে পুঁতিলাম ও নিয়মিত জল সেচনের ব্যবস্থাও করিয়া দিলাম। মনে করিতে লাগিলাম যে, এই গাছে প্রথম যে দুইটি সহস্রদল

গোলাব ফুটিবে, তাহার একটি বিশ্বনাথ ও একটি মা অন্নপূর্ণার চরণ কমলে অর্পণ করিব। গাছটি যেমন বাড়িতে লাগিল, বায়ুর প্রবাহে ছুলিয়া ছুলিয়া যেমন নাচিতে শিখিল, যৌবনের প্রাক্‌কালে কিশোর সজ্জায় যখন নবলাবণ্য যুক্ত হইল, তখন ভাবিলাম, আমার মনের বাসনা পূর্ণ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। লোকের কাছে অজাত কুসুমের অনেক প্রশংসা গান করিতে লাগিলাম। এই সময় কয়েক দিনের অনবধানতা দোষে নাকি আবার কূপজল তরু মূলে সিঞ্চিত হইয়াছিল, দেখিতে ২ তরু আবার শুকাইতে লাগিল। আমি ভৃত্য বর্গকে সাবধান করিয়া দিলাম, গঙ্গাজল সিঞ্চিত হইতে লাগিল, তরু পুনঃ প্রতিভা ধারণ করিল, নব যৌবনের নবীন চিহ্ন প্রকাশ পাইল। এইবার ফুল ফুটিবে এই রূপ মনে করিয়া আমি প্রত্যহ সাধের তরুর নধর দেহের দিকে তাকাইয়া দেখিতাম। দেখিতে দেখিতে স্তবকে স্তবকে ছোট ২ কোরক দেখা

দিল, কিন্তু দুই চারি দিন পরেই সকল গুলিই শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িয়া গেল। মনে বড় দুঃখ হইল, কিন্তু তরুর সেবা কমিল না। আবার ফুল ধরিল, এবার একটি পল্লবে একটি ফুল ধরিল। এই ফুলটি ফুটিলে বিশ্বনাথকে দিব কি অন্নপূর্ণাকে দিব, ইহাই ভাবিতে লাগিলাম, সিদ্ধান্ত হইবার পূর্ব্বেই ফুলটি একটু ফুটিয়াই শুকাইয়া পড়িয়া গেল; সুতরাং ফুল কাহারই পূজায় লাগিলনা। কয়েক দিন পরে আবার একটি নূতন ফুল ধরিল, অপ্রস্ফুটিত ফুলের পরিধি কেবল ফুলিয়া বিশাল হইতে লাগিল, ভাবিলাম এই বার আমার সহস্রদল গোলাব ফুটিবে, ফুটন্ত ফুল চন্দন-চর্চ্চিত করিয়া মায়ের চরণ কমলে দিব। গোলাব ধীরে ধীরে একটি একটি দল বিস্তার করিতে লাগিল। কিন্তু যেমন উর্দ্ধতন দল গুলি ফুটিতে লাগিল অমনি নিম্নের দল গুলি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। আবার উপরের সমস্ত দল গুলিও যথাবিধ ফুটিতে পারিলনা।

কোরক না ফুটিয়াই শুকাইতে লাগিল। আমি দেখিলাম এ ফুলটি ফুটিয়াও ফুটিল না ও আর যে সম্পূর্ণ রূপ ফুটিবে সে আশাও বড় নাই। কি করি, সেই আধ মৃত আধ জীবন্ত আধ মুদিত আধ ফুটন্ত ফুলটি তুলিয়া লইলাম, মা অন্নপূর্ণার চরণে অর্পণ করিলাম। ফুলটি ক্ষণ বিলম্বে মায়ের চরণ হইতে পড়িয়া গেল। মনের সাধ পূর্ণ হইল না, প্রাণের পিপাসা সম্পূর্ণ মিটিল না, যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা ঘটিল না। মায়ের সাধের পূজার সাধের উপাদান জুটিল না, ফুলের সৌরভ ছুটিল না, আমার সাধের ফুলটি ফুটিয়াও ফুটিল না। সে গাছে আর ফুল ধরিলনা, গাছটি শুকাইয়া গেল, ফুলের আশা—মনের আশা এবার জন্মের মত ফুরাইল।

সাধের গোলাব গাছটি অকালে শুকাইয়া গেল, কিন্তু শিখাইয়া গেল কি? জীব! তুমি পথের পথিক, চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য জন্ম মরণ রূপ দীর্ঘ দুর্গম বর্ত্মে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া শ্রান্তির শান্তি করিবার জন্য—

" গতাগতেন শ্রান্তোঽস্মি দীর্ঘ সংসার বর্ত্মসু।
যেন ভূয়ো ন গচ্ছামি ত্রাহি মাং মধুসূদন।"

বলিয়া কর্ম্মক্ষেত্র পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত রূপ গণ্ড গ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছ। এখানে সৌভাগ্য ক্রমে মাতৃ ক্রোড় রূপ টবে রোপিত মানবদেহ রূপ সহস্রদল গোলাবের শিশু কলেবর উপহার প্রাপ্ত হইলে। দুর্ল্লভ মানব দেহের উপাদেয়তা ও উপকারিতা শাস্ত্র মুখে—সাধু মুখে কতবার শুনিলে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই দেহের সহস্রদলে সহস্রশীর্ষ পুরুষের সহিত সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। এই বেলা এ দেহকে যত্ন পূর্ব্বক ভোগ বিলাসের হাত এড়াইয়া পার্থিব প্রলোভন রাশির মোহন মন্ত্রে বিমোহিত না হইয়া অবিদ্যার ইন্দ্রজাল জড়িত সুখ দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণাময় সংসারের পরপারবর্ত্তী কাশী ক্ষেত্র রূপ অবিমুক্ত পুরী বা যোগীর যোগাধিকার স্থানে লইয়া যাও। যেখানে মরণে মঙ্গল, যেখানে মরিলে আর জন্মিতে হয় না, যেখানে গমন করিলে

গতায়াতের পথ বন্ধ হইয়া যায়, যেখানে সাধু সন্ন্যাসী ত্যাগী বিরাগী ও প্রেমানুরাগী যোগী গণ যোগ ধ্যানে আত্মহারা হইয়া ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য সজ্জাকে শ্মশান শয্যার ন্যায় তুচ্ছ করিয়া পরমানন্দ রসে নিমগ্ন, দেহি! সেই সৎসঙ্গ রূপ কাশী বাসে অনুরক্ত হও। কিন্তু সাবধান, যেন তরুমূলে কূপের জল সিঞ্চন করিওনা, তাহা হইলে গাছ শুকাইয়া যাইবে। কদাহার (মৎস্য মাংস, মদিরাদি), কদাচার (শাস্ত্র নিষিদ্ধ আচার ব্যবহার), যথেচ্ছাচার আদির বশবর্ত্তী হইওনা, ইহাতে অল্পায়ু হইতে হয়। ব্রহ্মার কমণ্ডলু রূপ বেদগর্ভ নিহিত কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান রূপিণী ত্রিপথগামিনী নিষ্ঠা বা শ্রদ্ধা রূপিণী গঙ্গার নির্ম্মল জল সিঞ্চনে গাছ-টির অন্তর্জীবন, বল ও তেজের সঞ্চার কর। বরাবর গাছটিকে ক্ষুদ্র টবে—মাতৃ ক্রোড়ে—অবিদ্যার আলিঙ্গনে রাখিলেও চলিবে না, ভূমা রূপ ভূমিতে তরুটিকে রোপণ করিতে হইবে। দেহের সত্তা জন্য আত্মার সত্তা

এই অবিদ্যা বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মার সত্তাতেই দেহ ও জগতের সত্তা, ইহাই অনুভব করিতে হইবে, তখনই অবিদ্যাবরণ ভেদ করিয়া জীব মুক্ত হয়, বা শিবত্ব লাভ করে, তখনই কবির প্রহেলিকা স্মরণ করিয়া দেখিতে পাইবে—

" বিধাতা নির্ম্মিত ঘর নাহিক দুয়ার।
যোগীন্দ্র পুরুষ তায় থাকে নিরাহার॥
যখন পুরুষ বর হয় বলবান্।
বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান্ খান্॥ "

আত্ম মহামন্ত্র যোগে মানব! যখন তুমি দেখিবে, যে ব্রাহ্মণোঽহং, গৌরোঽহং বৃদ্ধোঽহং, পণ্ডিতোঽহং, অমুকস্য পুত্রোঽহং, এই ক্ষুদ্র ভাব বিসর্জ্জন দিয়া তোমার সত্তা বিরাট্ সত্তায় মিশিয়া দীর্ঘায়তন হইতেছে, তখনও সাবধান, যেন কুসঙ্গে পড়িয়া দেহাভিমান রূপ কূপজল আবার তরুমূলে সিঞ্চন করিও না, তাহা হইলে আবার মলিন হইয়া যাইবে। এই অবস্থায়

পড়িয়া কত যোগী যে যোগভ্রষ্ট ও কত সাধুর সাধন পথ যে নষ্ট হয় তাহার সীমা নাই। সাধন কালে বড় সাবধান! সংশয়, তর্ক বিতর্ক, কার্য্যে ফলাভিসন্ধি আদি ছাড়িয়া দিয়া গুরু যে কার্য্য যেরূপে অনুষ্ঠান করিতে আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিবে। সাধন করিতে করিতে তোমার তর্ক বিতর্ক সংশয় সমস্ত আপনা আপনিই মিটিয়া যাইবে। নিত্য নূতন তত্ত্ব বুঝিবার সামর্থ্য হইবে। পণ্ডিত গণ বহু পরিশ্রম করিয়াও যে সকল নিভৃত তত্ত্বের গুঢ়াভিসন্ধি বুঝিতে সমর্থ হয়েন না, তুমি তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ন্যায় অনায়াসে অনুভব করিতে পারিবে, অলৌকিকী শক্তি সকল তোমাকে আশ্রয় করিতে থাকিবে। শতশত লোক শ্রদ্ধা যুক্ত হইয়া তোমার পদে প্রণত হইবে, দিব্য যশো রাশি তোমার নামকে ভূষিত করিবে। সাধক! এ গুলি তরুতে ফুল ফুটিবার পূর্ব্বের অবস্থা। এগুলি তরুতে কোরক নির্গমের প্রাক্‌কালে—সাধন সিদ্ধির পূর্ব্ব ক্ষণের নব

লাবণ্য মাত্র, ইহাতে মুগ্ধ হইও না। লোকের প্রশংসায় আত্মহারা হইও না। যদি লোক নিন্দারূপ দাত্রাঘাতে শাখা প্রশাখার অঙ্গহানিও হয়, তবু দ্বিগুণ তেজে গজাইয়া উঠিবে। সম্পদে বা বিপদে, স্তুতি বা নিন্দায়, লাভে বা ক্ষয়ে হর্ষামর্ষ বিশিষ্ট হইওনা। তরুর শুশ্রূষা দোষে দেখিও যেন গোলাবের প্রথম কোরক স্তবক (বিবেক, বৈরাগ্য শম, দম, উপরতি, ধৃতি, ক্ষমা, শান্তি, আর্জ্জব, তিতিক্ষাদি) শুকাইয়া ঝরিয়া না পড়ে। এ গুলি শুকাইয়া পড়িলে ভাল ফুল ফুটিবার আশা বড় অল্প। এ গাছে যত ফুল ফুটিবে তদ্দ্বারা অবিমুক্ত ধামে শিব শক্ত্যাত্মক পর ব্রহ্মের পূজা করিতে হইবে। ভাগ্যদোষে সকলের তাহা ঘটে না। আমার তো ঘটিলই না। কিজানি কর্ম্ম দোষে কোরক গুলি শুকাইয়া গেল। সৎ চর্চ্চা, সৎশাস্ত্রাধ্যয়ন ও সৎ প্রসঙ্গ জন্য এবং গুরু কৃপাবলে যদিই বা একটি ফুল (জ্ঞান) ফুটিব ফুটিব হইয়াছিল, কিন্তু ভাগ্য দোষে সেই দেব-

দুর্লভ ফুলটি ফুটিল না, অকালে শুকাইয়া পড়িল। কেবল বাক্যে জ্ঞানী হইলাম মাত্র, কার্য্যে কিছু করিতে পারিলাম না, ফুলটি মুকুলেই শুকাইয়া গেল। এ জ্ঞানে কিছু কায হইল না। সাধের ফুলটি ফুটিয়াও ফুটিল না, মনে বড় খেদ রহিয়া গেল। স্বীকার করি—এ ফুল সকলের ভাগ্যে ফোটে না, জানি—ইহা পরম দুরারাধ্য ধন, বুঝি—ইহা সুতীব্র সাধনা সাধ্য সামগ্রী; তথাচ মন তো বোঝেনা, তাই দুঃখে হৃদয় ব্যাকুল হয়। আবার অন্য ফুলের আকাঙ্ক্ষা করিলাম। মানব তরুতে সকল ফুলই ফোটে, কিন্তু কপাল গুণে কেবল আমারই ঘটে না। এ শেষ ফুলটিতে (ভক্তি) সকলেরই অধিকার আছে। ইহাতে জাতিবিচার নাই, আশ্রম বিচার নাই পশু মানবাদি যোনি বিচার নাই, স্ত্রী পুরুষ, বাল বৃদ্ধ বিচার নাই। ইহাতে চাই না আর কিছুই, চাই কেবল ভগবানের কৃপা। যাঁহার চরণে ফুলটি অর্পিত হইবে, চাই কেবল তাঁহারই দয়া দৃষ্টি, আর চাই সেই চরণের

সেবক ভক্তের পদরেণু প্রসাদ। সাধু গুরুর দয়া, হইল, দীন দয়ালের দয়ার কোন্ দিনই বা ক্রটী আছে, তবে কেন আমার ভাগ্যে ফুলটি ফুটিয়া ফুটিল না? ফুলটি ফুটিতে না ফুটিতে অভিমানে শুকাইল কেন! দুঃখী ঘরে দেবীর সেবা হইল না বলিয়া। বুঝি অন্ধের সম্মুখে টাকা ফেলিয়া দিলে সে দেখিতে পায় না, আবার দুর্ভাগা পথিকের সম্মুখে ভগবান্ টাকার তোড়া ফেলিয়া দিলে সে সে পথ টুকু চক্ষু বুঝিয়া চলিয়া যায়, দেখিয়াও দেখেনা, পাইয়াও পায় না।

" যে জন প্রেমের ঘাট চেনে না; প্রেমে ডুব্‌তে গিয়ে দুটী নয়ন্ থাক্‌তে নয়ন মুদে হয়রে কানা ॥ কাঠুরেতে মানিক পেলে, দোকানেতে দেয় গো ফেলে, কালো পাথর বলে; অভিমানে মানিক প'ড়ে রে, বলে—মহাজনে টের পেলে না ॥ "

আমি দুর্ভাগা, মানিক চিনিলাম না, ভক্তির সেবা করিতে পারিলাম না, ভগবৎ কৃপায় ভক্তি লাভ করা

আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু স্থায়ী হওয়া কঠিন। তাই কবি গাইয়াছেন—

"প্রেম করা কঠিন নয়—রাখা প্রেম সুকঠিন।"

আমার ভাগ্যে ভগবদ্ ভাণ্ডারের অমূল্য নিধি থাকিবে কেন? ফুলটি ফুটিতে গিয়া শুকাইতে লাগিল; তাই আধ মৃত আধ জীবন্ত আধ মুদিত আধ ফুটন্ত ফুলটি লইয়া মায়ের চরণে দিতে গেলাম, সে ফুল সে চরণে অধিক ক্ষণ থাকিবে কেন, তাই পড়িয়া গেল। যোগী ষট্ কমল ভ্রমণ পূর্ব্বক সুপরিস্ফুটিত সহস্রদল কমলে যে চরণের পূজা করিয়া থাকেন, সে চরণে আমার আধ ফুটন্ত ফুল স্থান পাইবে কেন! ভক্ত সর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক নিজ ফুটন্ত হৃদ্‌কমলে যে চারু চরণ কমলের পূজা করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বদেব বন্দিত পদে আমার মলিন ফুল স্থান পাইবে কেন! তরুও শুকাইয়া আসিল, আর যে ফুল ফুটিবে, তাহারও আশা নাই। কি জানি কে বাদ সাধিল, বুঝি সাধ পূরিল না। আসা

বুঝি বৃথা হইল, আশাতো মিটিল না; সংসার বন্ধন আঁটিয়া বসিল, কৈ তাহা তো কাটিল না; যাহা করিব ভাবিয়াছিলাম তাহা তো ঘটিল না; ফুল দুটিতে (জ্ঞান+ভক্তি) পূজিব মনে করিয়াছিলাম, তাহাতো জুটিল না; আমার যে সাধের ফুলটি ফুটিয়াও ফুটিল না।

মা! আমি দীনাতিদীন মা, তোমার দ্বারে আসিয়াছি, দয়া করিয়া ফুল দুটি ফুটাইয়া দাও, ফুটন্ত ফুলে প্রাণ ভরিয়া পূজা করিও জন্ম জীবন সার্থক করি। আর সময় নাই, পরমায়ু ফুরাইয়া আসিল মা, এই অফুটন্ত অবস্থাতেই ফুল গুলি তোমার চরণে অর্পণ করিলাম। অফুটন্ত ফুল তোমার চরণ স্পর্শেই ফুটিয়া উঠিবে। মা! দয়া করিয়া "শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি" গ্রহণ কর।

ওঁ যোগেশ্বরি! ত্বাং শিরসা নমামি।

(পরিশিষ্ট)

মনের প্রতি উপদেশ।

মায়ানন্দে থেকে মন মজিলে এবার।
মায়াতে ভূলিলে সব বিবেক বিচার॥
মায়াতে মগন মন মিথ্যা মদ রসে।
মায়াতে হারা'লে কাল বৃথা কাল বশে॥
মায়াতে ভুলেছ মৃত্যু শঙ্কট তোমার!
মায়াতে জগৎ জীবে ভাব আপনার॥
মায়াতে সংসারসুখে পিপাসা সদাই।
মায়াতে হয়েছ মত্ত তত্ত্ব জ্ঞান নাই॥
মায়াতে না মানো মন গুরু উপদেশ।
মায়াতে আপন তত্ত্ব ভুলেছ বিশেষ॥
মায়াতে হইয়া অন্ধ দেখিতে না পাও।
মায়াতে অমৃত ভ্রমে হলাহল খাও॥
মায়াতে নিদ্রিত হ'য়ে দেখিছ স্বপন।
মায়াতে মোহিত হয়ে ভুলিল স্ব পণ॥

মায়াতে মনের সাধ নাহি পূরাইলে ।
মায়াতে বিরোধ বশে দিন ফুরাইলে ॥
মায়াতে মায়ার গুণ বুঝিতে না পার ।
মায়াতে মায়ার ফাঁশ গলে কর হার ॥
মায়াতে মায়ের কোলে এ মায়া দেখিলে ।
মায়াতে এ মায়াময় তাও না বুঝিলে ॥
মায়াতে মায়ের মায়া ক্রমে বাড়াইলে ।
মায়াতে লইয়া জায়া কাল কাটাইলে ॥
মায়াতে পরম অর্থ তত্ত্ব নাহি কর ।
মায়াতে এ মিথ্যা মায়া নাহি পরিহর ॥
মায়াতে কেন রে মন ! মায়া আঁটিতেছ ।
মায়াতে মায়ার হাটে কেন খাটিতেছ ॥
সেজন্য এসেছ জীব কর ওরে তাই ।
মিথ্যা এ মায়ার বন্ধে থেকনা সদাই ॥
এমন সাধের জন্ম হইবে না আর ।
তাই বলি এই বেলা ত্যজরে বিকার ॥

শক্রর শাসনে সদা হও সাবধান।
মনের মানসে কর আত্মানুসন্ধান ॥
বিষয় গহন বনে মানস মাতঙ্গ।
যাইও না মত্ত হয়ে, ক'র না কু-রঙ্গ ॥
কৃতান্ত মৃগেন্দ্র তথা আছে তা জাননা।
মত্ত হয়ে হিত কথা শুনেও শুননা ॥
পরিহরি হরি-পরিরক্ষিত এ বন।
চল বিহরিব হরি-হরিষ কানন ॥
বলি " হরি, বলি হারি " বলি নিসূদন।
কেবলি তদ্‌গুণাবলি বলি অনুক্ষণ ॥
ভজিলে ত্রিলোক কান্তে কৃতান্তে কি ভয়।
শমন শাসন হরি দেব দয়াময় ॥
শুনরে বারণ মত্ত চিত্ত নিবারণ।
মরণ-বারণে ভজ তারণ কারণ ॥
কি ভয় অভয় পদ পাও যদি মন।
ভয়েতে পলাবে ভয়, সভয় শমন ॥

ত্যজ মন ধন জন যদি সুখে রবে।
মত্তি মন্দ গেলে দ্বন্দ সদানন্দ হবে ॥
মিছা কায়া মিছা মায়া সুত জায়া সব।
কেবা কার আপনার অসার বিভব ॥
ভাব সত্য রূপ নিত্য স্থির-চিত্ত হ'য়ে।
আত্মার বিচার সার কর তত্ত্ব ল'য়ে ॥
মায়ার মোহিনী ভাকে ভুল না ভুল না।
অহংমম বৃথা চিন্তা তুল না তুল না ॥
এ যন্ত্রণা জালে যদি চাহ অব্যাহতি।
জগদ্‌গুরু কল্পতরু মূলে রাখ মতি ॥
শুদ্ধ জ্ঞানে সুখে সদা থাক সচেতন।
সযতনে দ্বৈত জ্ঞান ত্যজ মূঢ় মন ॥
প্রেমাকরে প্রেম করি সদানন্দে রবে।
সদানন্দ প্রেমে মজি সদানন্দ হবে ॥
জন্মাদি যাতনা জালে নাহি জড়াইবে।
কেবল বিমলানন্দ অন্তরে জাগিবে ॥